কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

কবি – ১ 3

কবি – ২ 12

কবি – ৩ 23

কবি – ৪ 35

কবি – ৫ 45

কবি – ৬ 56

কবি – ৭ 63

কবি – ৮ 85

কবি – ৯ 103

কবি – ১০ 113

কবি – ১১ 123

কবি – ১২ 133

কবি – ১৩ 143

কবি – ১৪ 153
কবি – ১৫ 160
কবি – ১৬ 175
কবি – ১৭ 187
কবি – ১৮ 206
কবি – ১৯ 216
কবি – ২০ 228
কবি – ২১ (শেষ) 242

কবি – ১

শুধু দস্তুরমত একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমত এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

নজীর অবশ্য আছে বটে,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা ভগবৎ লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহলাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল ; রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও ভগবৎ-লীলা। কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না সে বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নজীর নাই। বলিতে গেলে গা ছমছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল। এবং বিস্মিতও হইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যই বলিল—এ একটা বিস্ময়! রীতিমত!

অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল—নেতাইচরণ তাক লাগিয়ে দিলে রে বাবা!

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহার সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাসবিখ্যাত। ইহাদের উপাধিই হইল বীরবংশী। নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে, বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিসের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোমপরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা

প্রবাহিত। পুলিস কঠিন বাধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে—লোহা দিয়া বাধিয়াছে। হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডাণ্ডাবেড়ীর লোহা প্রত্যক্ষ ; এ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়। ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মত নি:শব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। এই বৎসরখানেক পূর্বেই সে পাচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ–গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে।

নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে।

ইহাদের উধ্বতন পুরুষের ইতিহাস পুলিস-রিপোর্টে আছে, সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত।

এই নিতাইচরণ সেই বংশের ছেলে। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সি দেল চোরের পুত্র-নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিনপেশী, দীর্ঘ সবল, রঙ কালে, রাত্রির অন্ধকারের মত। শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল,—নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া জোড় হাতে সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাছার সঙ্গে ঠোঁটের রেখায় ঈষৎ একটু লজ্জিত হাসি।

ঘটনাটা এই—

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা! মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব ; এই পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলুয়ি চিরকাল জমজমাট কবিগানের পালা হয়। নোটনদাস ও মহাদেব পাল—দুইজনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাধা। এবার সেই প্রত্যাশায় অপরাহ্ণ বেলা হইতেই লোকজন জমিতে শুরু করিয়া সন্ধ্য নাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল—প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের একটি সমাবেশ।

সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিট পেট্রোম্যাক্স আলো জালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু লোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি নোটনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়—লোক না—জন না—জিনিস না, পত্তর না—সব ভোঁ-ভোঁ করছে। কেবল শতরঞ্জিটা পড়ে রয়েছে—যেটা আমরা দিয়েছিলাম।

শুনিয়া মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। লোকের হৈ হৈ করিয়া, গোলমাল করিয়া উঠিল।

* * *

কাজটা যে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু বলিতে হইবে যে নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেল-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেইজন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহদের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আসছে বার। বাবা সকল, আসছে বার। আসছে বার গাওনার আগেই তোমাদের দু বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা ৰ্ধরে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার তাহারী কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাড়াইল, তখনও তিনি টাকার পরিবর্তে তাহার হাতে দিলেন তাজ টকটকে একটি জবা ফুল, এবং আশীর্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক।

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোক-জন অনেকেই সেখানে বসিয়াছিল–অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাহদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রছিল। মজলিসে আলোচনা হইতেছিল—মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্বাদের আরব্যয় লইয়া। মোহন্ত আর এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, ম চামুণ্ডার হাওনোট না কাটিলে আর উপায় নাই। পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন–দাও না, তোমরা কেউ টাকা ধার দাও না বাবা! দেখ এমন খাতক আর মিলবে না। এ খাতকের কুবের খাজাঞ্চি। ধর্মের কাগজে কামনার কালিতে হাণ্ডনোট লিখে নিয়ে অর্থ দিলে-ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। – বলিয়া হা-হা করিয়া হামিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তবে সে বুদ্ধিমান। সুতরাং তারপরেই মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নুতন একটা বায়ন আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহার কবিগানের আসরে নোটনদাসকে পাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। অন্তত এখানকার মেলায় গাওনা শেষ করিয়াও যাইতে হইবে। আর যদি এখানে কোনরকমে শেষের

দিনের গাওনাট না গাহিয়া আগেই যাইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। সে ক্ষেত্রে দক্ষিণার কাঞ্চনমূল্যও ওজনে ভারী হইবে।

নোটন হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—জয় মা চামুণ্ডা। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল—বোতলটা দে তো! বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকট পানীয় পান করিয়া নোটন গা-ঝাড়ী-দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল—ত হ'লে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা বলে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনের তো আঁর দেরি নাই।

নোটন হাসিয়া বলিল-আমি যদি কাল থেকেই গাওনা করি?

লোকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়। বলিল—আজ্ঞে, তা হ'লে এখানকার কি হবে?

নোটন বলিল,—নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভাল, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে। আমি তা হলে টাকা কিন্তু বেশী নোব।

লোকটা সোৎসাহে বলিল—আচ্ছ বেশ। তা কবে যাবেন আপনি?

—আজই। এখুনি। তোর সঙ্গে। এই ট্রেনে।

লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

—আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না।

—কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল—এই বয়ন। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকী টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে মিটিয়ে দোব।

নোটখনি ট্যাঁকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল । ঢুলী ও দোহারদের বলিল—ওঠ। লোকটাকে বলিল—টীকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধগর অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছে। এবং সে ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে। ঘটনার এই শেষ।

* * *

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আপসোস করিতেছিল। আজও পর্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনও সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্বন্ত:করণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বালয় গালও দিল। তাহাকে বলিলে কি সেও যাইত না!

আসরের জনতা ক্রমশঃ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে পরিষ্কার হয় নাই। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে একপাশে মেলার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। মোহন্ত চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—তারা, তারা!

নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না,—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল বাঁধভাঙা জলাশয়ের জলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্ত পুষ্করিণীর ভিজা পাকের মত জনশূন্ত মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধূলা।

ওদিকে আর একদল গ্রাম্য জমিদার একেবারে খড়ের আগুনের মত জলিয়া উঠিয়াছে। এখনি পাইক লাঠিয়াল ভেজিয়া গলায় গামছা বাধিয়া লোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া

হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত—নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহির মতই তাহারা লেলিহান হইয়া জলিতেছে।, এই জমিদারদের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ—নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী বিরূপক্ষের মতই সে দুর্মদ ও দুর্দান্ত—সে হঠাৎ মালকোঁচ সাঁটিয়া লাফাইরা উঠিল। বলিল-দুটো লোক। বলিয়া দুইটা আঙুল তুলিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিল—দোঠো আদমী হামার সাথ দেও, হাম আভি যায়গা। দশ কোশ রাস্ত। আরে দশ কোশ তো ফুলকীমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন ফুলকী চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া উঠিল—উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

—কেন রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

—জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? উঠে আয়—বাড়ী যাই—ভাত খাই গিয়ে ওরে নোটন দাশ ভাগলবা, পালিয়েছে। কবি হবে না।

—ন। মিছে কথা।

—মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—বল হরি—! সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়। ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বে—ল! অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্র ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণ-দাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

—কে? কৈ? কে রে বেটা?

—ধর তো বেটাকে, ধর তো। হারামজাদা বজ্জাত, ধর তো বেটকে!

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিকে সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ রও শালা।

অন্ত কয়েকজনে তাহকে ক্ষন্ত করিল—হাঁ-হাঁ-হাঁ! কর কি ভূতনাথ, ছাড়, ছাড়। ও রাখহরি নয়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীরবিক্রমে শাসন করিয়া দিল–খবর—দা—র! একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল—মেলা-খেলায় ও-রকম করে মানুষ। রঙ তামাসা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা, কবিয়াল-জাড়া গারে কবি গাইতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল—"কি ক'রে তুই বললি জগ, জাড়া গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা—চারিদিকেতে বাঁশের বন! কোথায় বা তোর শ্যামকুণ্ডু কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ডু–সামনে আছে মুলোকুণ্ডু করগে মুলো দরশন।" তাতে তো বাবুর রাগ করে নাই, খুশীই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল—যা-যা-যাঃ। কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে।

—আরে তুষ হ'লেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু'তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে—'কবিয়াল ভাগলব'; তা ঠাট্টা ক'রে একটু হরিধ্বনি দেবে না? রেগে না।

মোহন্ত এখন মোহান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার-সেরেস্তার কুটবুদ্ধি নায়েব ছিলেন। গাজা তিনি চিরকালই থান। তিনি এতক্ষণ ধরিয়া নীরবে কবিগানের কথাই চিন্ত করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছ, আচ্ছ, কবিগানই হবে। চিন্তা কি তার জন্তে? চিন্তামণি যে পাগলী বেটার দরবারে বাধা, উীর চিনির ভাবনা। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

হইয়াছে, চিনির সন্ধান মিলিয়াছে। কবিগান চিনি কি না—সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার কথাও নয় সময়ও নয়। সুতরাং সে প্রশ্ন না করিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে মোহন্তের মুখের দিকে চাহিল। .

মোহন্ত বলিলেন—ডাক মহাদেবকে আর তার প্রধান দোয়ারকে। অতঃপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—তাই হোক—গুরু-শিষেই যুদ্ধ হোক। রামরাবণেব যুদ্ধের চেয়ে দ্রোণ-অর্জুনের যুদ্ধ কিছু কম নয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত হ'ল অষ্টাদশ পর্ব।

শোর-গোল উঠিল—মহাদেব! মহাদেব! ওহে কবিয়াল। ওস্তাদজী হে, শোন শোন।

কবি – ২

দায়ে পড়িয়া মহাদেব প্রস্তাবটায় সম্মতি না দিয়া পারিল না।

মোহন্ত সুদুর্লভ আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে কল্পতরুর তলায় বসাইয়া দিলেন এবং চারিদিকে প্রমত্ত জনতা। অত:পর সম্মত না হইয়া উপায় কি! কিন্তু আর একজন চুলি ও দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়েই নিতাইচরণের আবির্ভাব। সে জোড়হাতে পরম বিনয়সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল-প্রভু, অধীনের নিবেদন আছে—আপনাদের সি-চরণে।

অন্ত কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই মহাদেব কবিয়ালই বলিয়া উঠিল—এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে; তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে। কি রে, পারবি না?

নিতাইয়ের গুণাগুণ কবিয়ালরা জানিত, কবিগান যেখানেই হউক, সে গিয়া ওই দোয়ারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত, কখনও কাঁসি বাজাইত—আর দোয়ারের কাজে তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বেগার দিয়া যাইত।

বাবুদলের মধ্যে একজন কলিকাতার চাকরি করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপন্তুরস্ত পাটকর বস্ত্রের মতই শোভমান ছিলেন। চালটিও তাহার বেশ ভারিক্কী, তিনি খুব উচুদরের ধারাভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বল কি, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই! তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা। আর দেরি নয়—আরম্ভ ক'রে দাও তা হ'লে। তিনি হাতঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা করির বলিলেন—এখনই তো তোমার— ক'টা রাজল?

কে একজন ফস করিয়া দেশলাইয়ের একটা কাঠি জালিরা আগাইয়া ধরিল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—আঃ! দরকার নেই আলোর। রেডিয়ম দেওয়া আছে, অন্ধকারে দেখা যাবে।

ভূতনাথ এত সব রেডিয়ম-ফেডিয়মের ধার ধারে না, সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে বেটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক। কাক—কাকই সই! তোর গানই শুনি!

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না। ওদিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কুড় তাক কুড় তাক কুড়ুম-কুড়ম।

নিতাই দোয়ারকি করিতে লাগিয়া গেল। আপন দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার কবিগানের পাল্লা। সুতরাং পাল্লা বা প্রতিযোগিতাট হইতেছিল আপোসমূলক—অত্যন্ত ঠাণ্ড রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরণের। যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহার বলিল—দূর দূর। ভিজে ভাতের মত গান। এই শোনে! সাঁট ক'রে পাল্লা হচ্ছে! চল বাড়ী যাই। দুই চার জন আবার উঠিয়াও গেল। –

অপর দল বলিল—মহাদেবের দোয়ারও বেশ ভাল কবিয়াল মাইরি! বেশ কবিয়াল, ভাল কবিয়াল! টকাটক জবাব দিচ্ছে।

নিতাইচরণের প্রশংসাও হইতেছিল। প্রশংসা পাইবার মত নিতাইচরণের মূলধন আছে। তাহার গলাখানি বড় ভাল। তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার। মহাদেবের দোয়ারকে পিছনে ফেলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে দুই-চার কলি গাহিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

বাবুর ইহাতে তাহাকে উৎসাহ দিলেন—বলিহারি বেটা, বলিহারি! বলিহারি!

নিতাইয়ের স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল—আচ্ছ, আচ্ছা!

এক কোণে মেয়েদের জটলা। এ মেয়েরা সবাই ব্রাত্য সমাজের। তাহদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টসম্যান রাজালাল বায়েনের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে—ও মা গো! নেতাইয়ের প্যাটে প্যাটে এত! ও মা গো!

তাহার পাশেই বসিয়া রাজার বউয়ের বোন, ষোল-সতের বছরের মেয়েটি, পাশের গ্রামের বউ—সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে—না ভাই, খালি হাসছিস তু! শোন কেনে!

রাজ বন্ধু-গৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত তুলিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল- দেখতা হ্যায় ঠাকুরঝি? ওস্তাদ কেয়সা গান টাটা হ্যায়, দেখতা?

রাজা এই শ্যালিকাটিকে বলে—ঠাকুরঝি! নিতাইও তাহাকে বলে—ঠাকুরঝি। শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও তাহার কাছে এক পোয় করিয়া দুধের 'রোজ' লইয়া থাকে! এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশী। যে লোককে মানুষ চেনে, তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময়ে মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায়।

নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, উৎসাহের প্রাবল্যে সে গল্পের উটের মত নাসিকা-প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল এবং নিজেই সে স্বাধীনভাবে গান আরম্ভ করিল। আ-করিয়া রাগিণী টানিয়া মহাদেবের দোয়ারের রচিত ধুটাকে পর্যন্ত পাটাইয়া দিয়া সেই সুরে ছলে নিজেই নূতন ধুয়া ধরিয়া দিল। এবং নিজের সুন্দর কণ্ঠের প্রসাদে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও ফেলিল।

মহাদেবের দোয়ার, সে-ই প্রকৃত একপক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ। সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাই! ও কি? ও কি গাইছ তুমি? অ্যাই—নেতাই! অ্যাই!

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। বা হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানি খুখু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়াই চলিল। সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে তখন গাহিতেছিল—

হুজুর-ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি জানি—

বাবুরা খুব বাহবা দিলেন—বহুৎ আচ্ছা! বাহব! বাহবা! নেতাই বলছে ভাল!
সাধারণ শ্রোতারাও বলিল—ভাল। ভাল। ভাল হে।
নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলীটাকে ধমক দিয়া বলিল—অ্যা-ই কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল—ধিকড় তা-তা-ধেনতা—তা-তা-ধেনতা—গুড়-গুড় তা-তা-থিয়া—ধিকড়;-হাঁ-! বলিয়া সে তাহার নূতন স্বরচিত ধুয়াটায় ফিরিয়া আসিল—

ক-য়ে কালী কপালিনী—খ-য়ে খপ্পরধারিণী,
গ-য়ে গোমাতা সুরভি—গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একপাশে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত ছোকরা বসিয়া ছিল—তাহারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।
একজন বলিল—গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। বহুৎ আচ্ছা!

হাস্যধ্বনির রোল উঠিয়া গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড় দাঁড়াইল, তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইতেই বলিল—বলি দোয়ারগণ!

মহাদেবের দোয়ার রাগ করিয়া বসিয়া ছিল, অপর কোনো দোয়ারও ছিল না। কেহই সাড়া দিল না। নিতাইও উত্তরের প্রত্যাশ না করিয়াই বলিল–দোয়ারগণ! গোমাত শুনে সবাই হাসছে! বলছে, গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া!

ঢুলীট এবার বলিল—হ্যাঁ!

—আচ্ছ —বলিয়া সে ছড়ার স্বরে আরম্ভ করিল—

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।

দীন নিতাইচরণ বলছে জোড়করে—

বলিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল। বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছ ওস্তাদ।

কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখিতেছিল না, রাজাকেও সে লক্ষ্য করিল না,

সে আপন মনে ছড়াতেই বলিয়া গেল—

শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কথন।।
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
মুরভির শাপে মজে কত রাজন॥

রব উঠিল—ভাল! ভাল! ঢুলীটা ঢোলে কাঠি দিল—ভূড়ুম!
নিতাই বলিল—

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই।।
তেঁই গোলকপতি—বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী॥

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল। ছন্দে বাঁধিয়া এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্যন্ত হতবাক; রাজার বউয়ের হাসি থামিয়া গিয়াছে; ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।
নিতাইয়ের তখনো শেষ হয় নাই, সে বলিল—

তা ছাড়া মশাই—আছে আরও মানে—
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিত জনে ॥

এবার বাবুরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। আসরের লোকের হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।
নিতাই বিজয়গর্বে ঢুলীটাকে বলিল–বাজাও।
এতক্ষণে সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ, দেখ! স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বটে বাপু।

তরুণী ঠাকুরঝিটির কিন্তু তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিল-চৈতন্তের মত নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। রাজা তাহার অসম্বৃতবাস বিম্মিত ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, রূঢ়স্বরে বলিল—অ্যাই! ও ঠাকুরঝি! মাথায় কাপড় দে।

রাজার স্ত্রী একটারর ঠেলা দিয়া বলিল—মরণ, সাড় নাই মেয়ের!

ঠাকুরঝি এবার জিভ কাটিয়া কাপড় টানিয়া মাথায় দিয়া বলিল—আচ্ছা গাইছে বাপু ওস্তাদ।

ওদিকে বাবুদের মহলেও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই কলিকাতা-প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত স্বীকার করিলেন—yes । এ রীতিমত একটা বিস্ময়। Son of Dom—অ্যাঁ–He is a poet !'

দুর্দান্ত ভূতনাথ ক্রুদ্ধ হইলে রুদ্র, তুষ্ট হইলে আশুতোষ—মানসিক অবস্থার এই দুই দূরতম প্রান্তে অতি সহজেই সে গঞ্জিকাপ্রসাদে বোমমার্গে নিমেষমধ্যেই যাওয়া-আসা করিয়া থাকে, সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ধুকুড়ির ভেতর খাস চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন-মানিকের বেটা মানিক! বলিহারি রে!

মোহন্ত হাসিয়া বলিলেন—আমার পাগলী বেটর খেয়াল বাবা; নিতাইকে বড় করতে মা আমার নোটনকে তাড়িয়েছেন।

ইহার পরই আরম্ভ হইল মহাদেবের পালা। মহাদেব পাকা প্রাচীন কবিয়াল। ব্যাপারটা দেখিয়া শুনিয়া ক্রুদ্ধ ভ্রকুটি করিয়া গান ধরিল—ব্যঙ্গে, রঙ্গে, গালি-গালাজে নিতাইকে শূলবিদ্ধ করিয়া তিলে তিলে বধ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সরস, অশ্লীলতা-ঘেষা গালি-গালাজে সমস্ত আসরট হাস্যরোলে মুখর হইয়া উঠিল। নিতাই আসরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এবং মনে মনে গালি-গালাজের জবাব খুঁজিতেছিল।

কিন্তু ক্ষুণ্ণ হ’ল রাজা। সে মিলিটারী মেজাজের লোক, বন্ধুকে গালি-গালাজগুলা তাহার, অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আসর হইতে উঠিয়া খানিকটা মেলার মধ্যে ঘুরিবার জন্য চলিয়া গেল। রাজার স্ত্রী প্রচুর হাসিতেছিল। ঠাকুরঝি মেয়েটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে, সেও এবার বিরক্ত ভরে বলিল—হাসিস না দিদি! এমনি ক’রে গাল দেয় মানুষকে!

মহাদেব ছড়া বলিতেছিল—

সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল।।
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার-দ্বীপান্তরে মরে ॥
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই।

একজন ফোড়ন দিল—

অল্পজলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাস না।
দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নূতন ধুয়াটা গাহিল—
আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা—গো!
ফরাৎ ক’রে উড়ল পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
হয়রে কলি—কিই বা বলি –
গরুড় হবেন মশা গো—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।

অকস্মাৎ মহাদেব বলিয়া উঠিল—আঃ, জালাতন রে বাপু! বলিয়াই সে আপনার পায়ে একটা চড় মারিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাহিল—

পায়েতে কামড়ায় মশা—মারিলাম চাপড়।
গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন–চড়িবেন কার উপর!

মহাদেবের দোয়ার—যাহাকে নাকচ করিয়া নিতাই কবিয়াল হইয়াছে—সে-ই এবার ফোড়ন দিয়া উঠিল—চটাৎ চড়ের সয় না ভর, স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।
ইহার পর রাত্রি যত অগ্রসর হইল, মহাদেবের তাণ্ডব উতই বাড়িয়া গেল। শ্লীল-অশ্লীল গালি-গালাজে নিতাইকে সে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। মহাদেবের এই শূল প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই যে জর্জর ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সে ধরাশায়ী হইল না। খাড়া থাকিয়া হাসিমুখেই সব সহ্য করিল। সে গালি-গালাজের উত্তরে কেবল ছড়া কাটিয়া বলিল—

ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য।।
তোমার হয়েছে ভীমরতি—আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব—কোনই ভয় করি না মনে।।

লোকের কিন্তু তখন এ বিনীত মিষ্ট রস উপভোগ করিবার মত অবস্থা নয়। মহাদেব গালি-গালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়া গিয়াছে, এবং মহাদেবের তুলনায়

নিতাই সত্যই নিস্প্রভ। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহাতে অবশ্য নিতাইয়ের কোন গ্লানি ছিল না। বরং সে অকস্মাৎ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল।

পাল্লার শেষে সে বাবুদের প্রণাম করিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বলিল—স্থজীরগণ, অধীন মুখ্য ছোট নোক—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরা বলিলেন—না না। খুব ভাল, ভাল গেয়েছিল তুই। বহুত আচ্ছ, বহুত আচ্ছা!

প্রচণ্ড উৎসাহে তাহার পিঠে কয়েকটা সাংঘাতিক চপেটাঘাত করিয়া ভূতনাথ বলিল–জিতা রহো, টাটা রহো রে বেটা। জিতা রহো!

চাকুরে বাবুট করুণামিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ইউ আর এ পোয়েট, অ্যাঁ! এ পোয়েট! ইউ আর এ পোয়েট!

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই বিনীত সপ্রশ্নভঙ্গিতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে?

বাবু বলিলেন—তুই তো একজন কবি রে।

নিতাই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে মহাদেবকে বলিল—মার্জনা করবেন ওস্তাদ। আমি অধম। বলতে গেলে আমি মশকই বটে।

মহাদেব অবশ্য প্রতিপক্ষের এ বিনয়ে লজ্জিত হইল না, সে বরং নিতাইয়ের বিনয়ে খুশী হইয়াই বলিল–আমার দলে তুই দোয়ারকি কর রে। এর পর নিজেই দল বাঁধতে পারবি। তা ছাড়া তোর গলাখানি খুব মিষ্টি।

নিতাই মনে মনে একটু রূঢ় অথচ রসিকতাসম্মত জবাব খুঁজিতেছিল; মহাদেবের গালিগালাজের মধ্যে জাতি তুলিয়া এবং বাপ-পিতামহ তুলিয়া গালি-গালাজগুলি তাহার

বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিবার পূর্বেই পিছন হইতে দশ-বিশজন একসঙ্গে ডাকিল—নেতাইচরণ, নেতাইচরণ! ওহে!

ডাক শুনিয়া নিতাইচরণ পুলকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। আজই সে 'নিতে' 'নেতা' 'নিতো' 'নেতাই' হইতে নিতাইচরণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ডাকিতেছিল, তাহার অদূরবর্তী বাবুদের দেখাইয়া বলিল—বাবুর ডাকছেন। মোহন্ত ডাকছেন।

মোহন্তজী চণ্ডীর প্রসাদী একগাছি সিন্দূরলিপ্ত বেলপাতার মালা তাহার মাথায় আলগোছা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বা বা, খুব ভাল। মা তোমার উন্নতি করবেন। মায়ের মেলায় একরাত্রি গাওনা তোমার বাঁধা বরাদ্দ রইল। সুন্দর গলা তোমার!

চাকুরে বাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে! তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন—You are a poet! অ্যা! এ একটা বিস্ময়!

নিতাই দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। বাবু বলিলেন–কিন্তু খবরদার, আপন গুষ্টির মত চুরি-ডাকাতি করবি না। তুই বেটা কবি— a poet!

হাতজোড় করিয়া এবার নিতাই বলিল—আজ্ঞে প্রভু! চুরি জীবনে আমি করি নাই। মিছে কথাও আমি বলি না হুজুর, নেশা পর্যন্ত আমি করি না। জাত-জ্ঞাত-মা-ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে বনে না আমার। ঘর তো ঘর, আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যাজ্য করেছি একরকম। আমি থাকি ইস্টশনে রাজন পয়েণ্টসম্যানের কাছে। কুলিগিরি ক'রে খাই।

এ গ্রামের চোর, সাধু, ভাল মন, সমস্ত কিছুই ভূতনাথের নখদর্পণে, সে সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকে সমর্থন করিয়া বলিল—হাজারোবার। সাচ্চ সাধু আচ্ছা আদমী নিতাই।

নিতাই আবার বলিল—এই মা-চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে আমার মাথায়।

কবি – ৩

নিতাই মিথ্য শপথ করে নাই। সত্যই নিতাই জীবনে কখনও চুরি করে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজন গভীর রাত্রে নি:শবপদসঞ্চারে নির্ভয় বিচরণের মধ্যে যে উদ্বেগময় উল্লাস অনুভব করে, সে উল্লাসের আস্বাদ সত্যই নিতাইয়ের, রক্তকণিকাগুলির কাছে অজ্ঞাত। গ্রীক বীর আলেকজাগুরের সম্মুখীন থেসিয়ান দমুর মত ন্তায়ের তর্ক এখানকার বীরবংশীরা জানে না বটে, তবে নীতি ও ধর্মের কথা শুনিয়া তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া হাসে। এবং নিতাইয়ের এই চৌর্যবৃত্তি-বিমুখতার জন্য তাহার। তাহার মধ্যে আবিষ্কার করে একটি ভীরুতাকে, এবং তাহার জন্ম তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে।

কেমন করিয়া সে এমনটা হইল তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। তাচ্ছিল্যভরে কেই লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই সম্ভবত অলক্ষ্যে হরাইয়া গিয়াছে। তবে একটি ঘটনা লোকের চোথে বার বার পড়িয়াছিল। এবং ঘটনাটি লোকের চোখে এখনও ভাসে। রোজ সন্ধ্যায় নিতাইচরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালি-পড়া লণ্ঠন হাতে নাইট ইস্কুলে চলিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ে নিতাই পড়াশুনা করিয়াছিল। সেকালে ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত। ছাত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়া কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল। বৎসরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেণীর গল্প পড়িবার পূর্বেই ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল, কেবল নিতাই-ই থাকিয়া গেল। নিতাই পরীক্ষায় ফাস্ট হইয়াছিল বলিয়া কাপড়ের সঙ্গে একটা জামা ও একখানা গামছা এবং তাহার সঙ্গে একটা লণ্ঠন পাইল। এই প্রাপ্তিযোগের জন্যই সকলে পাঠশালা ছাড়িলেও নিতাই ছাড়ে

নাই। সে সময় ছেলে কাপড়, গামছা, জামা ও লণ্ঠন চার দক পুরস্কার পাওয়াতে নিতায়ের মাও বেশ খানিকট গৌরবই অনুভব করিয়াছিল। বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল। ইহার পর আরও বৎসর দুয়েক নিতাই পাঠশালায় পড়িয়াছিল। এই দুই বৎসরে পুরস্কার হিসাবে কাপড়, জাম, গামছা; লণ্ঠন ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খানকয়েক বই—শিশুবোধ রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প। সেগুলি নিতাইয়ের কণ্ঠস্থ। নিতাই সুযোগ পাইলে আরও পড়িত, কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালাটিই উঠিয়া গেল। অগত্য নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল। ততদিনে তাহার বিদ্যাকুরাগ আর এক পথে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এ দেশে কবি গানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অনীল কুসিকতার প্রতি আসক্তি। নিতাইয়ের আসক্তি অন্তরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতার ছন্মিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক-দেওয়া কৌতুকও আহার ভাল লাগে।

মামাতে মাসতুতে ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করিয়া এতদিন বলিত-পণ্ডিত মশায়! এইবার তাহারা তাহাকে দলে লইয়া দীক্ষা দিতে ব্যগ্র লইয়া উঠিল। অর্থাৎ রাত্রির অভিযানের দলে তাহারা তাহাকে লইতে চাহিল।

মামা গৌরচরণ সস্ত পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। সে বোনকে ডাকিয় গম্ভীর ভাবে বলিল–নিতাইকে এবার বেরুতে বল। নেকাপড় তো হ’ল।

গৌরচরণের গম্ভীর ভাবের কথার অর্থ—তাহার আদেশ। নিতাইয়ের মা আসিয়া ছেলেকে বলিল—তোর মামা বলছে, এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে।

নিতাই মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ছি! ছি! ছি! গভধারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে!

নিতাইয়ের মা হতভম্ব হইয়া গেল।

নিতাইয়ের মামা চোখ লাল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়। বলিল—কি বলছিস মাকে? হচ্ছে কি?

নিতাই তখন পুরানো খাতাটায় রামায়ণ দেখিয়া হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল। সে নির্ভয়ে বলিল—লিখছি।

–নিকছিল? গৌর আসিয়া খাতাটা ও বইখান টান মারিয়া ছড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মামাকে অতিক্রম করিয়া সে খাতা ও বই কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম খুঁজিয়া সেই দিনই সে ঘনশ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীতে মাহিদারী চাকুরিতে বাহাল হইল।

গোঁসাইজী বৈষ্ণব মানুষ, ঘরে সন্তানহীন স্থূলকায়। গৃহিণী, উভয়েরই দুগ্ধপ্রতি মার্জরের মত। ঘরে দুইটি গাই আছে, গাই দুইটি এতদিন রাত্রে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া প্রভাতে ঘরে আসিয়া দুধ দিত। কিন্তু ইদানীং কলিকাল অকস্মাৎ যেন পরিপূর্ণ কলিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে র্তাহার গাভী দুইটিকে গত দুই মাসে পনেরো বার লোকে খোয়াড়ে দিয়াছে। বাধ্য হইয়া গোর্সাইজী গাভী-পরিচর্যার জন্য লোক খুঁজিতেছিলেন। নিতাইকে পাইয়া বাহাল করিলেন। নিতাইয়ের সহিত শর্ত হইল, সে গাভীর পরিচর্য করিবে, বাসন মাজিবে, প্রয়োজনমত এখানে ওখানে যাইবে, রাত্রে বাড়িতে প্রহর দিবে। গোঁসাইজীর মুদী কারবারে মূল এক শত মণ ধান এখন সাত শত মণে পরিণত হইয়াছে। ঘরের উঠানেও একটি ধানের স্তুপ বারোমাস জড়ো হইয়াই থাকে। খাতকের রোজই কিছু কিছু ধান শোধ দিয়া যায়। গোঁসাইজী স্ফীতোদর মরাই ও নিজের বিশীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া

নিয়তই চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক নিতাইকে পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নিতাই গোঁসাইজীর বাড়ীতেই বসবাস আরম্ভ করিল।

দিন কয়েক পরেই, সেদিন ছিল ঘন অন্ধকার রাত্রি। গভীর রাত্রে গোঁসাই ডাকিলেন – নিতাই!

বাহিরে খুটখাট শব্দে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে জাগিয়াই ছিল, সে ফিসফিস করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি শুনেছি।

—গোলমাল করিস না, উঠে আয়। গোঁসাইজী অগ্রসর হইলেন। নিতাই শীর্ণকায় গোঁসাইজীর অকুতোভয়ত দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। গোঁসাই আসিয়ু নি:শব্দে বাহিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। • বাহিরে চারজন লোক, তাহদের মাথায় বোঝাইকরা চারটি বস্তা। ভারে উত্তেজনায় লোকগুলি ইপাইতেছে এবং থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দরজা খুলিতেই নিঃশব্দে লোক চারিজন চুকিয়া উঠানের ধানের গাদায় বস্তা চারিটা ঢালিয়া দিল। রক্রির অন্ধকারের মধ্যেও নিতাই ধানের সেনার মত রং প্রত্যক্ষ করিল। লোকগুলিকেও সে চিনিল, তাহার আত্মীয় কেহ না হইলেও প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ধানচোর।

সকালবেলাতেই জোড়হাত করিয়া গোঁসাইজীকে নিতাই বলিল-প্রভু, আমি মাশার কাজ করতে পারব না!

—পারবি না!

—আজ্ঞে না।

—এক পয়সা মাইনে আমি দেব না কিন্তু। আর এ কথা প্রকাশ পেলে তোমার জান থাকবে না।

নিতাই.কথার উত্তর করিল না। তাহার কাপড় ও দপ্তর লইয়া সে বাহির হইয়া পডিল। আসিয়া উঠিল গ্রামের স্টেশনে।

স্টেশনের পয়েণ্টসম্যান রাজা বায়েন তাহার বন্ধু। রাজালাল একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স, সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়। ফিরিয়া আসিয়া কাজ করিতেছে এই লাইট রেলওয়েতে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, অনর্গল ভুল হিন্দী বলে, ঘড়ির কাটার মত ডিউটি করে, বার ছয়-সাত চা খায়, প্রচুর মদ খায়, ভীষণ চীৎকার করে, স্ত্রীপুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়। রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের আলাপ অনেক দিনের, অর্থাৎ রাজার এখানে আসিবার পর হইতেই আলাপ, সে প্রায় তিন বৎসর আগের ঘটনা।

নিতাই সেদিনও, অর্থাৎ প্রথম আলাপের দিনও স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিল, রাজার ছেলেট ট্রেন আসিবার ঘণ্টা বাজিতেই হাঁকিতে শুরু করিয়াছিল—হট যাও! হট যাও! লাইনের ধারসে হট যাও!

নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিয়াছিল, সে প্রশ্ন করিয়াছিল—বাহা রে! কাদের ছেলে হে তুমি?

—আমি রাজার ছেলে।

—রাজার ছেলে? কেয়াবাৎ! তবে তো তুমি ‘যোবরাজ’!

রাজা ছিল কাছেই, সে নিতাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়াই সারা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছিল। ট্রেন চলিয়া যাইতেই রাজা নিতাইকে ধরিয়া লইয়া একেবারে তাহার কোয়ার্টারে আনিয়া হাজির করিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিল—আমার বন্ধুনোক! উমদা’আদমী! ফটকেটাকে বলে—রাজার বেটা যোবরাজ। বলিয়া সে কি তাহার হা-হা করিয়া হাসি!

নিতাই উৎসাহভরে কবিয়ালদের নকল করিয়া গালে হাত দিয়া, মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈষৎ ঝুকিয় রামায়ণ স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

রাজার বেটা যোবরাজা, ভেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো-মণ্ডলে!

রাজা লাফ দিয়া ঘরের ভিতর হইত্তে তাহার পৈতৃক ঢোল ও তাহার নিজের কাঁসি বাহির করিয়া আনিয়। নিজে লইয়াছিল ঢোলটা—ছেলেটার হাতে দিয়াছিল কাঁসিটা। ওই কাঁসিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনিয়া দিয়াছিল মহেশপুরের মেলায়। সেদিন .দ্বিপ্রহরেই কবিগান জমির উঠিয়াছিল রাজার ঘরে। নিতাই রাজার ছেলেকে যোবরাজ বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রাজার পরিবারের দিকে ফিরিয়া গাহিয়াছিল—

রাজার ঘরের ঘরণী যিনি—তিনি মহামান্যা রাণী—
তিনি থান বড় বড় ফেনী—
সর্বলোকে বলে।

ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর একজন। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গীতে ভূঁইচাপার সবুজ সরল ডাটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটা সূতার থাটো কাপড়। মোট সূতার খাটো কাপড়খানির আঁটোসাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল

দেহখানির স্বাভাবিক খাজগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি পোড়ামাটির পুতুলের মত দেখায়। মেয়েটি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে। রাজার স্টেশনে গাড়ী আসে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া, আর এই মেয়েটি আসে—পশ্চিমসমীপবর্তী দ্বিপ্রহরের সুর্যের অগ্রগামিনী ছায়ার মত। মেয়েটির সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত সহজাত। সেদিন সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ এই সরল মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—অসঙ্কোচ খিলখিল হাসি।

রাজার স্ত্রী কিন্তু কঠিন মেয়ে, সে বোনকে ধমক দিয়াছিল—হাসিস না ফ্যাক ফ্যাক ক’রে। বেহায়া কোথাকার!

মুহূর্তে মেয়েটির হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে রাগ করে নাই বা দুঃখিত হয় নাই, স্বচ্ছন্দে শাসন মানিয়া লওয়ার মত বেতসলতাসুলভ একটি নমনীয়তা তাহার স্বভাবজাত গুণ। দেহখানিই শুধু লতার মত নয়, মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ।

নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল। ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল। এবং মেয়েটিকে বলিল—দেখত কেয়। ঠাকুরঝি? হামারা মিতা। ওস্তাদ আদমী। হামারা নাম হায় রাজা, তো ফটকেকো নাম দিয়া যোবরাজ, তোমারা দিদিকে নাম দিয়া রাণী —বলিয়াই অট্টহাসি।

এবার অট্টহাসির ছোঁয়াচে রাণীও হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝিরঞ্চ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল আবার সেই হাসি। হাসিতে হাসিতে মাথার অবশ্যণ্ঠন খসিয়া গেল, চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, তবু তাহার সে হাসি থামিল না।

হাসি থামাইয়া রাজা বলিয়াছিল—ওস্তাদ! ই কালকুটি হামার ঠাকুরঝি হায়। ইস্‌কো কেয়া নাম দেগা ভাই।

নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত যে একটি কোমল বনাম ঐ আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্ত করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় মাই। সে বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি ভাই ঠাকুরঝি, ওর আর দোসর নাম হয় না। আমার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি, রাজার ঠাকুরৰিও ঠাকুরকি। ঠাকুরঝি আমাদের সবারই ঠাকুবঝি। কেমন ভাই ঠাকুরঝি!

রাজা নিতাইয়ের তর্ক-যুক্তিতে অবাক হইয়া গিয়াছিল। গভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে স্বীকার করিয়াছিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক। ই বাত তো ঠিক হ্যাঁয়! ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি!

তাহার পর খাজা পাড়িয়াছিল মদের বোতল-আও ভাই ওস্তাদ!

নিতাই জোড়হাত করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর ভাই রাজন। ও দব্য আমি ছুঁই না।

-তব্? তব্, তুমি কি খায়েগা ভাই?

ঠাকুরকি বলিয়াছিল—দুধ খাবা, দুধ? বলিয়া আবার সেই খিল থিল হাসি।

নিতাই হাসিয়াছিল—তা খেতে পারি। এমন দব্য কি আছে ভো-মগুলে? দেবদুল্লভ।

ঠাকুরঝি সত্যই বড় ঘটি হইতে মাপের গেলাসে পরিপূর্ণ একগ্লাস দুধ ঢালিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয় তাহার অভ্যস্ত দ্রুতগমনে প্রায় পলাইয়া গিয়াছিল।

এ সব পুরোনো কথা।

রাজা এখন তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গুণমুগ্ধ ভক্ত।

সেই সুত্রেই গোঁসাইজীর চাকরিতে জবাব দিয়া নিতাই আসিয়া উঠিল স্টেশনে। সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিল—ঠিক কিয়া ওস্তাদ। বহুৎ ঠিক কিয়া ভাই।

—আমাকে কিন্তু তোমার এইখানে একটু জায়গা দিতে হবে।

—আলবৎ দেগা। জরুর দেগা।

—এইখানে থাকব, অীর ইন্টিশানে মোট বইব। তাতেই আমার একটা পেট চ'লে যাবে।

রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের সময় এই স্টেশনটি এ লাইনের একটি প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। সে সময় প্রয়োজনে অনেক ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি এখন পড়িয়াই আছে। তাহারই একটাতে রাজা ওস্তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিল। নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে, ভদ্রলোকজনের মোট তুলিয়া দেয়, নামাইয় লয়, গ্রামান্যরেও মোট বহিয়া লইয়া যায়, উপার্জন তাহার ভালই হয়। স্টেশনে মাল নামাইতে-চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা, এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পয়সা, গ্রামান্যরে হইলে রেট দূরত্ব অনুযায়ী। অন্ত কুলিদের অপেক্ষ নিতাইয়ের উপার্জন বেশী। কারণ তাহার সহায় স্বয়ং রাজ।

স্টেশন-স্টলটি তাহদের একটি আডডা; স্টলের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' রহস্ত করিয়া নিতাইকে বলে—রাজ-বয়স্য।

মামার দোকানে সজীব-বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট, অতি-প্রগলভ বিপ্রপদ বলে—বয়স্ত কি রে বেট, বয়স্য কি? সভাকবি, রাজার সভাকবি।

নিতাই বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করিয়া মুখে দেয়, সভাকবি কথাটিতে ভারি খুশী হইয়া উঠে। বিপ্রপদকে বড় ভাল লাগে তাহার। এত যন্ত্রণাদায়ক অমুখের মধ্যেও এমন আনন্দময় লোক দেখা যায় না। বাতব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়াই কোনমতে খোড়াইতে খোড়াইতে স্টেশনে আসিয়া মামার দোকানে আডডা লয়, বেঞ্চিতে বসিয়া অনর্গল বকে, লোকজনকে চা খাইতে উৎসাহিত করিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁকিয়া উঠে—চ গ্রো-ম! চা গ্রী-ম! দেহ তাহার যত আড়ষ্ট, জিহ্বা তত সক্রিয়। উৎকট রসিক ব্যক্তি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মেজাজের মানুষ। মামার দোকানে সকালবেলায় আসিয়া বিপ্রপদ চ বিড়ি

খাইয়া খাইয়া বেলা বারোটায় বাড়ী ফিরে খাইবার জন্য। খাইর, খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বেলা তিনটার আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া বসে। যায় রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়া তবে। বিপ্রপদর সঙ্গে নিতাইয়ের জমে ভাল। নিতাই পদধূলি লইলে, বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বাদ করে–

ভব কপি, মহাকপি দগ্ধানন সলাঙ্গুল—

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলে—প্রভু, কপি মানে আমি জানি।

বিপ্রপদ হাসিয়া ভুল স্বীকার করিয়া বলে—ও। কপি নয়, কপি, নয়, কবি, কবি। আমারই ভুল। আচ্ছা, কবি তো তুই বটিস, কই বল দেখি—‘শকুনি খেললে পাশা, রাজ্য পেলে দুর্যোধন, বাজী রাখলে যুধিষ্ঠির কিন্তু ভীমের বেটা ঘটোৎকচ মরল কোন পাপে?’

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিগান আরম্ভ করিয়া দেয়। বা হাত গালে চাপিয়া মুখের সম্মুখে ডান হাত আড়াল দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া সুর ধরিয়া আরম্ভ করে—আ হা রে—ঘটোৎকচ মরল কোন্ পাপে?

রাজা ভাবে, ঢোলকট পাড়িয়া আনিবে নাকি? কিন্তু সে আর হইয় উঠে না। ইতিমধ্যে বারোটার ট্রেনের ঘণ্টা পড়ে।

দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায় নিতাই। স্টেশনের জমাদার রাজার মুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকেই লইয়া থাকে। নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা পছন্দ করে।

মজুরির দরদস্তর করিতে নিতাই সবিনয়ে বলে—প্রভু, গগনপানে দিষ্টি করেন একবার। গ্রীষ্মকাল হইলে বলে—দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন। বর্ষায় বলে—কিষ্ণবন্ন মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কর্তা। শীতে বলে—শৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাৰু।

মামার দোকানে বসিয়া বিপ্রপদ নিতাইকে সমর্থন করে,—বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের তো সব শাল-দোশাল আছে। ওর যে কোন শালাই নাই। ওর কষ্টের কথা বিবেচনা করুন একবার।

দ্বিপ্রহরে বাহিরে যাইতে হইলে নিতাই রাজাকে বলিয়া যায়—রাজন, ঠাকুরঝি এলে দুধটা নিয়ে রেখো।

এখানে থাকিলে বারোটার ট্রেনটি চলিয়া গেলেই নিতাই একটু আগাইয়া গিয়া পয়েন্টের কাছে লাইনের ধারে যে কৃষ্ণচুড়ার গাছটি আছে তাহাঁর ছায়ায় গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিপ্রহরে তখন রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের ঘষা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ঝকমক করে। নিতাই নিবিষ্ট মনে, যেখানে লাইনটা বাক ঘুরিয়াছে সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সহসা সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। স্বর্ণবর্ণ-বিন্দুশীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে। ক্ষারে কাচ তাঁতের মোটা সূতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা সে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে; এবং তাহার মাথায় একটি তক-তকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটী। ঘটীটি সে ধরে না—একহাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে, কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি।

নিতাই নেশা করে না; কিন্তু দুধ তার প্রিয়বস্তু। চায়েও আসক্তি তাহার ক্রমশ বাড়িতেছে। ঠাকুরঝির কাছে সে নিত্য একপোয়া করিয়া দুধ যোগান লইয়া থাকে। দুধ আসিলেই চায়ের জল চড়াইয়া দেয়। মামার দোকানে চা খাইলে দাম দিতে হয় দু পয়সা কাপ। বিপ্রপদর মত বিনা পয়সার চা খাইবার অধিকার তাহার নাই। তা ছাড়া জমে না। কেমন ছোট ছোট মনে হয়।

স্টেশনে নিত্য নানা স্থানের লোকজনের আনাগোনা। আশপাশের খবর স্টেশনে বলিয়াই পাওয়া যায়। খবরের মধ্যে কবিগানের খবর থাকিলে নিতাই উল্লসিত হইয়া উঠে। সেদিন সন্ধ্যাতেই লালপেড়ে পরিষ্কার ধুতি ও হাতকাটা জামাটি পরিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া সাজে এবং গুন-গুন করিয়া কবিগান গাহিতে গাহিতে রাজাকে আসিয়া তাগাদ দেয়। মিলিটারী রাজা সাড়ে আটটার ট্রেন পার করিয়াই বলে—ফাইভ মিনিট ওস্তাদ!

পাঁচ মিনিটও তাহার লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যেই রেলওয়ে কোম্পানির দেওয়া নীল কোর্তাটা চড়াইয়া স্টেশনের একমুখে বাতি ও লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়ে। ভোর হইবার পূর্বেই আরার ফিরিয়া আসে। শুধু কবিগানই নয়, যাত্রাগান, মেল—এ সবই নিতাইয়ের ভাল লাগে। আহ, আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা তাহার কাটিয়া যায়, তবে বড় ভাল হয়।

মনের এই বাসনাটুকু সে দুই কলি গানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নির্জন প্রান্তর পাইলেই গাহিয়া সে নিজেকেই শুনায়; আর শুনায় কোন রসময় ভাইকে। সে রসময় ভাই তাহার রাজন।

সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায়রে!
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাইরে।
ও রসময় ভাইরে!

রাজা শুনিয়া বাহ বাহা করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে-ওস্তাদ তুম ভাই গুন তৈয়ার করো। আচ্ছা গান আত তুমার!

গান তাহার অনেক আছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। হঠাৎ চণ্ডীমায়ের মেলাতে এই নিতাই সত্য সত্যই কবিয়াল হইয়া উঠিল।

কবি – ৪

কবিগানের পাল্লার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দূরমাখানো শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই মেলা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল রাজদত্ত মাল্যকণ্ঠে সেকালের দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। যেন একটা ভাবের নেশার ঘোরের মধ্যে পথ চলিতেছিল। মনে মনে সে বেশ অনুভব করিতেছিল যে সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে একজন কবি।

সমস্ত পথটা তাহার আত্মীয়স্বজন, যাহারা এতদিন তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখিত না, আজ তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতে করিতে সঙ্গে আসিতেছিল। তাহদের কলকোলাহলের কিছুঁই কিন্তু তাহার কানে আসিতেছিল না।

রাজা আসিতেছিল তাহার গা ঘেঁষিয়া। ওস্তাদের গৌরবে বুক তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, সে পথ চলিতেছিল সভাকবির গৌরবতৃপ্ত রাজার মতই। অনর্গল সে লোকজনকে সাবধান করিতেছিল—হট যাও, হট যাও। এতনা নগিচয়ে কেঁও আত হ্যায়? হট যাও। উৎসাহের প্রাবল্যে আজ তাহার ভুল-হিন্দী বলার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। রাজার স্ত্রী ও ঠাকুরঝি একটু পিছনে আসিতেছিল। নিতাইয়ের আত্মীয়দের সহিত রাজার বউ গলগল করিয়া বকিতেছিল— তোমরা তো মা তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এই তো ইস্টশান, তোমাদের বাড়ীর দুয়োর থেকে দেখা যায়; কই, কোন দিন নেতাইয়ের খোজ করেছ?

ঠাকুরঝি মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া, যে যখন কথা বলিতেছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। পাশের গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ী, মেলা উপলক্ষে সে আজ

দিদির বাড়ী আসিয়াছে, রাত্রে এইখানে থাকিবে, ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল ওস্তাদকে কয়টি কথা বলিতে!-তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে? দিদির ঘরে গায়েন করতে, আমরা হাসতাম। বাবা, এত নোকের ছামুতে-ওই এত বড় কবিয়ালের সঙ্গে–বাবা! কল্পনামাত্রেই রাত্রির অন্ধকার আবরণের মধ্যে অপরের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি বিস্ময়ে বড় হইয়া উঠিতেছিল।

চণ্ডীতলা হইতে ডোমপাড়ার ভিতর দিয়াই স্টেশনের পথ। নিতাইয়ের কয়েকজন আত্মীয় আজ তাহাকে আহ্বান করিল—বাড়ী আয়।

নিতাইয়ের মা এখানে আর থাকে না, সে তাহার কন্যাকে আশ্রয় করিয়া গ্রামান্তরে জামাইয়ের বাড়ীতে থাকে। জামাই এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল। রাত্রে ডাকাতি করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রয় করে, ভাঙা ঘরে বসিয়া পাকী মদ খায়, ও সের দরুনে মাছ কেনে। নিতাইয়ের মা শুধু ভাতের জন্য নয়—ওই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে। নিতাই একবার নিজের ভাঙা ঘরটার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল,—না, আমার আস্তানাতেই যাই।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই একটা রূঢ় কণ্ঠের কয়েকটা কঠিন কঠিন বাক্য অতি অতর্কিতে কোন নিষ্ঠুর হাতের ছোড়া কয়েকটা পাথরের টুকরার মত নিতাইকে আসিয়া আঘাত করিল,—এই শূয়ার—যাবি কোথা? দাঁড়া!

এ তাহার মামার কণ্ঠস্বর। মামা এখানকার কুলাধিপতি। তাহদের স্বজাতিদের নৈশাভিযানের দলপতি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

নিতাই চমকিয়া উঠিল।

পাড়ার গলিমুখ হইতে মামা নামিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল—প্রহলাদের সম্মুখে হিরণ্যকশিপুর মত। এবং খপ করিয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া বলিল—তোর বাবাকে

দাদাকে গাল খাওয়ালি খাওয়ালি—আমার বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি ক্যানে আসরের মধ্যিখানে? শূয়ারের বাচ্চা শূয়ার!

একমুহূর্তে হতভম্ব হইয়া গেল সকলে। রাজন পর্যন্ত। নিতাইয়ের মামার হাত সাঁড়াশীর চেয়েও শক্ত। লোহার তালা ওই হাতের মোচড়ে মট করিয়া ভাঙিয়া যায়। নিতাইয়ের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে কবিগান করিলেও ওই মামারই ভাগিনেয়, ওই বংশেরই সন্তান। দেহে শক্তি তাহারও কম নয়। তার উপর প্রথম জোয়ান বয়স। সে দুই হাত দিয়া মামার হাতখান টানিয়া ধরিল। পরমুহূর্তে রাজন আগাইয়া আসিল— ছোড়ো— !

মামার হত্যা করিবার সঙ্কল্প ছিল না। ইচ্ছা ছিল শাসনের। তাই নিতাইয়ের গলা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যাঃ। আর এ-পাড়ার পথ মাড়াবি না। মহাদেব কবিয়াল ওই একটা কথা ঠিক বলেছে। আস্তাকুঁড়ের অঁটো (এঁটে) পাতার স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!—বলিয়া সে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল—তেমনিই চকিতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকগুলি স্তব্ধ হইয়াই ছিল—স্তব্ধ হইয়াই রহিল। রাজন শুধু চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল—ই ক্যা হ্যায়? ই ক্যা বাত? আঁঃ । কেয়া, মগকে মুল্লুক হ্যায়?

পাড়ার ভিতর হইতে আর একটা হুঙ্কার আসিল—যা—যা, চেঁচাস না রে বেটা কুলী! —

নিতাই রাজনের হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল–রাজন চুপ কর। চল। ই আমার পাপ ভাই। চল। বলিয়া হাসিয়া বলিল—আজ থেকে অকূলে ভাসলাম। সে অকূলে তুমিই আমার ভেলা।

রাজন তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধুরির গদগদ কণ্ঠে বলিল—তুমি সাচ্চ আদমী ওস্তাদ।

নিতাই আবার একটু হাসিল। পেছনে ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল ঠাকুরঝি। রাজার স্ত্রী বলিল—মরণ! কানছিস ক্যানে লো!

ভিড় তখন কমিয়া গিয়াছে। সঙ্গের লোকজন অপেন আপন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নিতাই ও রাজার পরিবারবর্গ কেবল স্টেশনের পথে চলিল। কোয়ার্টারে আসিয়া রাজা,বলিল —কুছ খালেও ভাই ওস্তাদ।

নিতাই বলিল—গান শুনবে ভাই রাজন! ভাল গানের কলি এসেছে মনে। শুনবে?

রাজন বলিল—ঠ্যয়রো! ঢোলটো—

নিতাই হাত চাপিয়া ধরিল—না। শুধু গান।

বলিয়াই তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপিয়া গাহিল—

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি মুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে।

রাজন বলিল—বাঃ, বাঃ, বাঃ! উসকা বাদ?

নিতাইয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে জল মুছিতে মুছিতে বলিল—আর নাই।

তারপর সে সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। মনের মধ্যে অনেক কথা। মামার হাতে লাঞ্ছনার কথাটা তাহার কাছে খুব বড় নয়। মামার কাছে অনেক লাঞ্ছনাই সে ভোগ করিয়াছে। ওটা তাহার অঙ্গের ভূষণ। ও ছাপাইয়া সে ভাবিতেছিল কবিগানের কথা।

বিশেষ করিয়া এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের কথা। তাঁরণ কবি যে-আসরে গান করিয়াছে, সে আসরে কত লোক! হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে। সে যেবার প্রথম তারণ কবির গান শোনে সেবারকার সে-ছবি এখনও তাহার মনে জলজল করিতেছে।

এই চণ্ডীমায়ের মেলাতেই, সে কি জনতা, আর সে কি গোলমাল! তখন মেলারও সে কি জাঁকজমক! চার-পাঁচটা চাপরাসীই তখন মেলার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাহাল করা

হইত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত বাবুদের দারোয়ান এবং দুই-চারিজন বাবু। তবু সে কি গোলমাল! নিতাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়িল কলরবমুখর জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল, আলোকোজ্জল আসরের মধ্যে তখন তারণ কবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই লম্বা মানুষটি, পাক চুল, পাকা গোফ, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, বুকে সারি-সারি মেডেল, লাল চোখ, তারণ কবির আবির্ভাবেই সব চুপ হইয়া গিয়াছিল। আসরের একদিকে বেঞ্চ পাতিয়া গ্রামের বাবুরা বসিয়া ছিল, তাহারা পর্যন্ত চুপ করিয়া গিয়াছিল। আর সে কি গান!

তারপর হইতে আশেপাশে যখন যেখানে তারণ কবির গান হইয়াছে; সেইখানেই সে গিয়াছে। একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সে তারণ কবির পায়ের ধূলাও লইয়াছিল। তখন হইতেই তাহার সাধ, কবিয়াল হইবে। ইচ্ছা ছিল তারণ কবির দলে দেয়ারকি করিয়া সে কবিগান শিখিবে। কিন্তু তারণ মরিয়া গেল। মদ খাইয়াই নাকি তারণ মরিয়াছে। তারণ কবির ওই একটা বড় দোষ ছিল, ভীষণ মদ খাইত। আসরেই তাহার বোতল গের্লাস থাকিত, সকলের সম্মুখেই সে মধ্যে মধ্যে জল বলিয়া-মদ খাইত। ওই তারণ কবি সেদিন গানে গাহিয়াছিল–

"তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশীষ শোন দশানন,
তোমার চরণস্থল আমার অঙ্গে অগুরু চন্দন
বিভীষণের রাক্ষস জন্মের শাপবিমোচন,
খালাস, খালাস, খালাস, আমি খালাস নিলাম হে।"

সেদিন পালাতে তারণ হইয়াছিল বিভীষণ এবং প্রতিপক্ষ বিষ্ণু সিং হইয়াছিল রাবণ। সেই কথাটাই আজ বার বার করিয়া মনে পড়িতেছিল। সে আজ খালাস। খালাস। খালাস।

এক একসময় তাহার মনে হয় তার কবি তাহারই কপালদোষে মরিয়া গেল। সে গুরু পাইল না। এমন ভাল গুরু না হইলে কি ভাল কবি হওয়া যায়! শাস্ত্রের কি অন্ত আছে? পড়িয়া শুনিয়া সে সব শিখিতে গেলে এ জীবনে আর কবিয়াল হওয়া হইয়া উঠিবে না। রামায়ণ মহাভারত— সহসা তাহার মনে হইল, মহাদেব আজ রামায়ণ হইতে যে প্রশ্নটা লইইয়া তাহকে অপদস্থ করিয়াছে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল। আলো জ্বালিল।

ছোট একটি চৌকির উপর যত্নের সহিত রঙিন কাপড়ে বাঁধিয়া সে তাহার পুঁথিগুলি রাখিয়া থাকে। দপ্তর খুলিয়া সে রামায়ণ বাহির করিল। দপ্তরের মধ্যে একগাদা বই। পাঠশালা হইতে আজ পর্যন্ত সংগৃহীত বইগুলি সবই তাহার আছে। পথেঘাটে উড়িয়া বেড়ায় যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা, তাহারও অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া নিতাই রাখিয়াছে। কাগজ দেখিলেই সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয়—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য, স্থানীয় থিয়েটার-ক্লাবের ফেলিয়া-দেওয়া কয়েকখানা ছেঁড়া নাটক; ইহা ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি—সে প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে। আর আছে থান দুইয়েক খাতা, ভাঙা মেট-পেন্সিল, একটা লেগুপেন্সিল, ছোট একটুকরা লাল-নীল পেন্সিল। আর কিছু ছেঁড়া পাত, খোলা কাগজ।

সেই রত্রেই সে নিবিষ্ট মনে রামায়ণের পাতা উল্টাতেই আরম্ভ করিল। ঠিক, মহাদেব তাহাকে ধাপ্পা মারিয়াই হার মানাইয়াছে। ভুল তাহার নয়, মহাদেবই ভুলকে সত্য করিয়াছে মুখের জোরে। হাসিয়া সে মহাদেবের প্রশ্নের উত্তরের ঠাঁইটা বন্ধ করিয়া রাবণ ও বিভীষণের বিতণ্ডার অধ্যায়টা খুলিল। পড়িয়া বই বন্ধ করিয়া সে আবার শুইরা পড়িল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। রগের শিরা দুইটা দপদপ করিয়া লাফাইতেছে, কানের পাশে এখনও যেন ঢোল কাঁসির শব্দ উঠতেছে। ধীরে ধীরে শব্দগুলা মৃদ্ধ হইতে মুদ্ভুতর হইতে হইতে একসময় নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ঘুম ভাঙিল রাজার ডাকে।

মিলিটারী রাজা, রাত্রি জাগিয়াও ঠিক সকাল ছয়টায় উঠিয়াছে। সাতটার এ লাইনের ফার্স্ট ট্রেন এ-স্টেশন অতিক্রম করিবে। যুদ্ধ-ফেরত রাজা চা খায়, চারের জল চড়াইয়া দিয়া স্টেশনে সিগন্যাল দিয়া ও ঘণ্টি মারিয়া আসিয়া ওস্তাদকে ডাকিল—ওস্তাদ। ওস্তাদ! ওস্তাদ না হইলে চা খাইয়া মুখ হয় না। বউটা এখনও ঘুমাইতেছে। ঠাকুরঝি কিন্তু ঠিক আছে, সে রাজার পূর্বেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরঝির শাশুড়ীটা বড় দজাল। এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয়। রাজা মনে মনে এখন আপসোস করে,—বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল। ঠাকুরঝিকে বিবাহ করিলেই ভাল হইত। ছিপছিপে দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভাল।

নিতাইয়ের সাড়া না পাইয়া রাজা আবার ডাকিল-হো ওস্তাদ!

এবার নিতাই জড়িত স্বরে উত্তর দিল—উঁহু।

—চা হো গেয়া ভেইরা!

–উঁহু।

—আরে ট্রেন আতা হায় ভেইয়া।

–উঁহু।

রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আর ডাকিল না। কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনি গিয়াছে, আজ বেচারার একটু ঘুম দরকার।

* * *

বেলা নয়ট নাগাদ নিতাই উঠিল। হাসিমুখেই উঠিল। বোধ হয় গত রাত্রের কথা স্বপ্ন দেখিয়াই, একটু মৃদু হাসি মুখে মাখিয়া উঠিয়া বসিল। এবং প্রথম কথাই মনে হইল যে কলিকাতার সেই চাকুরে বাবুট আজ তাহাকে দেখিলেই বলিবেন-আরে তুই একজন কবি রে, অ্যাঁ! তাহার পর ইংরেজীতে কি একটা।

ভূতনাথবাবু তারিফ করিবেন-বাহবা রে নিতাই, বাহবা!

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামের লোকেরই সপ্রশংস বিস্মিত-দৃষ্টি মুখগুলি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। বিপ্রপদ ঠাকুর তো একেবারে কোলাহল জুড়িয়া দিবে। স্টেশনে গিয়া বসিলেই হয়। এই সাড়ে নটার ট্রেনেই বিপ্রপদর মারফৎ তাহার কবিখ্যাতি একেবারে কাটোয় পর্যন্ত আজই পৌছিয়া যাইবে। বাসি দুধ চা চিনি ঘরেই আছে, তবু সে আজ ঘরে চা তৈয়ারী করিল না। চায়ের মগটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে স্টেশন-স্টলে আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখে সেই মৃদু হাসি।

বিপ্রপদ হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—এই! এই! চোপ, সব চোপ! তারপর তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল—বলিহার বেটা বলিহার! জয় রামচন্দ্র। কাল নাকি সত্যি সত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম। ভ্যালা রে বাপ কপিবর!

আশ্চর্যের কথা, বিপ্রপদর পুরানে রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল, মুহূর্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপ্রপদর সেদিকে খেয়াল নাই, সে উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—ধুয়ো কি ধরেছিলি বল দেখি? 'উঁপ! উঁপ! খ্যাকোর—খ্যাকোর উঁপ! চুপ রে বেটা মহাদেবী চুপ চুপ চুপ?' না কি? বলিয়া য়ে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

নিতাই এবার হাত জোড় করিয়া গভীরভাবে বলিল—আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ছোট জাত; বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুমান যা বলেন তা-ই সত্যি বলিয়াই সে আপনার মগটি বাড়াইয়া ভেণ্ডার বেনে মামাকে বলিল—কই গো, দোকানী মাশায়, চা দেন দেখি! সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সা দিবার জন্য খুট খুলিতে আরম্ভ করিল।

দোকানী বেনে মামা মগে চা ঢালিয়া দিয়া বলিল—মাতুল না ব'লে দোকানী বলছিল, সম্বন্ধ ছাড়ছিল নাকি নিতাই?

নিতাই কথার উত্তর দিল না। বেনে মামাই বলিল–নাঃ, কাল নেতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে, ভাল গান করেছে। সে যাই বলুন আপনি।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি একটা ঘুঁটে লইয়া একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরাইতে পরাইতে বলিল—তার জন্তে কপিবরকে একটা মেডেল দেব |

কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়াই নিতাই চায়ের মৃগটি হাতে উঠিয়া চলিয়া গেল। ওদিকে সাড়ে নয়টার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে আসিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রপদ ও বেনে মামা মনে করিল নিতাই বোধ হয় মোটের সন্ধানে গেল। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম হইতে রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ। ওস্তাদ!

সাড়া না পাইয়া রাজা নিজেই ছুটিয়া আসিল। বেনে মামা বলিল—এই তো উঠে গেল! প্ল্যাটফর্মে নাই?

এদিক ওদিক চাহিয়া রাজার নজরে পড়িল, গাছপালার আড়াল্লে আড়ালে নিতাই চলিয়াছে বাসার দিকে। সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরল।

—গাঁওকে একঠো মোট হ্যায় ভেইয়া, একঠো বেগ আওর ছোটাসে একঠো বিস্তারা।

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

—আরে, বড়বাবুকে জামাই। উমদা বকশিশ মিলে গা। দে আনা তো জরুর।

–না।

—কেয়া, তবিয়ং কুছ খারাপ হ্যায়?

–না।

—তব্? রাজা বিস্মিত হইয়া গেল। নিতাই গভীরভাবে বিষন্ন মৃদু হাসিয়া বলিল—কুলিগিরি আর করব না রাজন।

রাজা এবারে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

কবি – ৫

নিতাই বাসায় আসিয়া হঠাৎ রামায়ণখানা খুলিয়া বসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইখানি খুলিল। বিপ্রপদর কথায় সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। সে বার বার ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে—ব্রাহ্মণবংশের মূর্খ কি বুঝিবে! কিন্তু কিছুতেই তাহার মন শান্ত হয় নাই। তাই সে রামায়ণখানা টানিয়া লইয়া বসিল। বইখানা খুলিয়া সে বাহির করিল দস্যু রত্নাকরের কাহিনী। বহুবার সে এ কাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু আজ এ কাহিনী নূতন রূপ নূতন অর্থ লইয়া তাহার মনের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিল। দুই হইতে পড়িবার পূর্বেই জানা কাহিনী তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে জলও আসিয়াছে। চোখ মুছিয়া সে এবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

“রামনাম ব্রহ্মাস্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাট হাজার বৎসর।।”

বাহির হইতে রাজা তাহাকে ডাকিল—ওস্তাদ!।
“উদাসভাবেই মুখ তুলিয়া নিতাই তাহাকে আহবান করিল—এস, রাজন এস।
রাজা আসিয়া বসিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিল—কেয়া হুয়া হয়। ভাই তুমার কাম কেঁও নেহি করেগা?
নিতাই হাসিয়া বলিল—শোন, আগে এই কাহিনীটা শোন।
রাজা বলিল–দুরো, ওহি লিখাপড়ি তুমারা মাথা বিগড় দিয়া।

নিতাই তখন পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। রাজা অগত্যা একটি বিড়ি ধরাইয়া শুনিতে বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তন্ময় হইয়া গেল।

"বর দিয়া ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।।"

পড়া শেষ করিয়া নিতাই রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা তখন গলিয়া গিয়াছে। সে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—সীয়ারাম! সীয়ারাম! তারপর নিতাইয়ের তারিফ আরম্ভ হইল—আচ্ছা পঢ়তা হ্যায় তুম ওস্তাদ! বহুৎ আচ্ছা!

নিতাই এবার গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন, এইবার তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ।

রাজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

জানাল দিয়া রেললাইনের রেখা ধরিয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রত্নাকর, ধর কবি হলেন, তারপর কি তোমার তিনি ডাকাতি করতেন, না, মানুষ মারতেন?

রাজা বলিয়া উঠিল—আরে বাপ রে, বাপ রে! এইস কভি হে শকত হ্যায় ওস্তাদ!

—ত হ'লে? কাল রাত্রির কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখ। চারিদিকে তো র'টে গেল কবিয়াল বলে!

—আলবৎ | জরুর!

—তবে? আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিত হবে? বাল্মীকি মুনির কথা ছেড়ে দাও! কার সঙ্গে কার তুলনা! ভগবানের অংশ, দেবতা ওঁর। কিন্তু আমিও তো কবি। না হয় ছোট।

এতক্ষণে এইবার রাজা সমস্তটা বুঝিল এবং একান্ত শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে নিতাইয়ের মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বল রাজন, আর কি আমার কুলিগিরি করা শোভন হবে? লোকে ছি ছি করবে না? বলবে না—কবি মোট বহন করছে!

—হাঁ, ই বাত ঠিক হ্যায়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হইয়া রাজা বলিল—লেকিন একঠো বাত ওস্তাদ–

—বল? রাজার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল।

—লেকিন রোজগার তো চাহিয়ে ভাই; খানে তো হোগা ভেইয়া!

বার বার ঘাড় নাড়িয়া নিতাই বলিল—সে আমি ভাবি না রাজন। দুরেলা না হয়, একবেলা খেয়েই থাকব, তাও যেদিন না জুটবে, সেদিন না হয় উপবাসীই থাকব। অতঃপর অত্যন্ত গভীর হইয়া কণ্ঠস্বরে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করিয়া সে বলিল—তা ব'লে ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন, তখন—! নিতাই বার বার অস্বীকারের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ না— না—না! তখন সে মাথায় করিয়া মোট আর বহিবে না।

রাজাও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল, সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এবার পরিষ্কার বাংলায় বলিল—না ওস্তাদ, ছোট কাজ আর তোমার করা হবে না। উঁ-হুঁ। নাঃ।

রাজার উপর নিতাইয়ের প্রতির আর সীমা রহিল না। গভীর আবেগের সহিত সে বলিল— তুমি আমার সত্যকার মিত্র রাজন।

—ধন্য হোগের ওস্তাদ, তুমারা মিত্র হোয়কে হাম ধন্য হোগেয়া। রাজনেরও আবেগের অবধি ছিল না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই এবার বলিল,—আজ বড় দুঃথ পেয়েছি রাজন।

—দুখ? কৌন দুখ দিয়া ভাই? —ওই তোমার বিপ্রপদ ঠাকুর। আমাকে বললে কি না— কপিবর, মানে হনুমান! আমি হনুমান রাজা?

রাজা মুহূর্তে সোজা হইয়া বসিল। তাহার মিলিটারী মেজাজ মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সে কুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল নিতাইকে–জবাব কেঁও নেহি দিয়া তোম?

—জবাব জিহ্বার অগ্রভাগে এসেছিল রাজন, কিন্তু সামলে নিলাম। ব্রাহ্মণ বংশের মূর্খ বলীবর্দ অপেক্ষ কপি অনেক ভাল রাজন।

—জরুর। আলবৎ। লেকিন বলীবর্দ কিয়া হ্যায় ভাই?

নিতাই বলিল—বলদকে বলে ভাই!

তারপর নিজেই রচনা করিয়া বলিল—

"সংসারে যে সহ্য করে সেই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম কোন ধর্ম নয়॥"

কবিতা আওড়াইয়া নিতাই বলিল—বুঝলে রাজন, ক্ষমা করেছি আমি। একে ব্রাহ্মণ, তার রোগা লোক, তার উপর মূর্খ, ওকে আমি ক্ষমা করেছি।

রাজন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—সাদা বাংলায় বলিল—ভালই করেছ ওস্তাদ। তারপরই সে আবার বলিল—তাহলে কি করবে ওস্তাদ? একটা কিছু করা তো চাই ভাই। পেটের তুল্য অনবুঝ তো নাই সংসারে।

—আমি একটা দোকান করব ওস্তাদ।

—দোকান?

—হ্যাঁ, দোকান। বিড়ির দোকান, নিজেই বিড়ি বাঁধব, আর ইস্টশানের বটতলায় বসে বেচব। দু-এক বাক্স সিগারেটও রাখব।

রাজন উৎসাহিত হইয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছ, বহুৎ আচ্ছা হোগা ওস্তাদ! নিতাই কিন্তু এবার একটু মানভাবেই বলিল—বণিক মাতুল একটু রুষ্ট হবে আমার ওপর। কিন্তু—

—কেয়া কিন্তু? উ গোসা করনেসে কেয়া হোগা? জাস্তি ভাত খায়েগা আপনা ঘরমে!

—ন রাজন। কারও ক্ষতি করতে আমার ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া আমার হাতের পান, চা, জল এ তে কেউ থাবে না। বলিতে বলিতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল –আচ্ছা রাজন, বাঁশ কিনে যদি মোড় সাজি বেশ শৌখীন করে তৈরি করি, তা'হলে কেমন হয়?

—উ সব্‌সে আচ্ছা!

–কিন্তু বিপ্রপদ বলবে কি জানো? ডোমবৃত্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—বেটা ডোম!

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া রাজন বলিল—একদিন ঠেসে কান দুটো মলে দেবো বেটা বামুনের।

–না। না। না। হাজার হ'লেও ব্রাহ্মণ! রাজন, "ব্রাহ্মণ সামান্য নয়, ব্রাহ্মণে করিলে ক্রোধ হইবে প্রলয়।" শাস্ত্রের কথা ভাই। তা ছাড়া—

রাজা বাধা দিয়া বলিল—ধ্যে-ৎ! ব্রাহ্মন! সাতশো ব্রাহ্মন একঠো বক-পাখীকা ঠ্যাং ভাঙনে নেহি শকতা হ্যায়! ব্রাহ্মন?

নিতাই হাসিয়া বলিল—না-না-না। বলুক ডোম! ডোমেই বা লজ্জা কি? ডোমই বা ছোট কিসে? ডোমও মানুষ বামুনও মানুষ!

—বাস—বাস—বাস! কেয়া হরজ্। বলনে দেও ডোম। রাজনেরও আর কোন আপত্তি রহিল না।–বহুত আচ্ছা কাম, দোকান লাগাও, আওর একঠো সাদী করে ওস্তাদ! সন্‌সার পাতাও।

তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া নিতাই বলিল-দূর!

—দূর কেঁও ভাই? উ হাম নেহি শুনেগা।

—আচ্ছা তার আগে একটা কাহিনী বলি শোন।

কাহিনীতে রাজনের পরম অনুরাগ, সে বিড়ি ধরাইয়া জাঁকিয়া বসিল। নিতাই আরম্ভ করিল লেজকাটা শেয়ালের গল্প। গল্প শেষ করিয়া নিতাই বলিল—তুমি লেজ কেটেছ ব'লে আমি লেজ কাটছি না রাজন!

রাজা প্রথমে অবশ্য খানিকট হাসিল, তারপর কিন্তু বলিল—উ বাত তুমারা ঠিক নেহী হ্যায়। সন্‌সারমে আয়কে সাদী নেহি করেগা তো কেয়া করেগা?

নিতাই এবার বলিল—তুমি ক্ষেপেছ রাজন! বিয়ে করে বিপদে পড়ব শেষে! আমাদের জাতের মেয়ে কখনও বিদ্যের মর্ম বোঝে?—কেবলই খ্যাচ-খ্যাচ করবে দিনরাত। তা ছাড়া ধরগা তোমার—; কথা শেষ হইবার পূর্বেই নিতাই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূ নাচাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল—উ কেয়া বাত ওস্তাদ? ফিক করকে হাঁসতা কেঁউ?

—হাসবো না? তোমার, তেমন মনে-ধরা কনেই বা কোথায় হে? বেশ মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল—আমরা হলাম কবিয়াল লোক। আমাদের চোখ তো যাতে-তাতে ধরবে না রাজন!

রাজা এবার হাসিয়া গড়াইরা পড়িল। রাজার উচ্চহাসি উৎকট এবং বিকট। রাজার সে হাসি কিন্তু অকস্মাৎ আবার বন্ধ হইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া সে বার বার ঘাড়, নাড়িয়া এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই বলিল—ঠিক বাত ওস্তাদ, ঠিক বাত বোলা হ্যায় ভাই। লড়াইমে গিয়া, দেখা, আ-হ-হ একদম ফুলকে মাফিক জেনানা। ইরাণী দেখা হ্যায় ওস্তাদ, ইরাণী? ওইস, লেকিন উস্‌সে তাজা।

রাজার কথা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু স্মতির ছবি ফুরাইল না। সে উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া রহিল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। যেন বসরার সেই রূপসীদের শোভা— ওই ধূ-ধূ করা কৃষিক্ষেত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে। নিতাইও চাহিয়া ছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইনের সমান্যরাল শাণিত দীপ্ত দীর্ঘ রেখা দুইটি বাকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিলিয়া গিয়ছে, সেই বিন্দুটির দিকে। সহসা একসময় সেই

বিন্দুটির উপর জাগিয়া উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মত একটি রেখা, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু, যেন ঝকমক করিয়া উঠিতেছে মুহূর্তে মুহূর্তে চকিতে চকিতে একটি ছটা চুটিয়া আসিতেছে।

তাহাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রাজার স্ত্রীর তীক্ষ উচ্চ কণ্ঠ। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিতেছে। রাজা এখানে বসির আড্ডা দিতেছে, তাই সে আপনার অদৃষ্টকে উপলক্ষ্য রাখিয়া, রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শাণিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।
—ছি রে, চি রে আমার আদেষ্ট! সকালবেলা থেকে বেলা দোপর পর্যন্ত মানুষের ঘর ব'লে মনে থাকে না। অদেষ্টে আমার আগুন লাগুক, পাথর মেরে এমন নেকনকে (কপালকে) ভেঙে কুচিকুচি করি আমি।
রাজার মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া পড়িল। নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ?
—আতা হ্যায়। আভি আতা হ্যায়। সে চলিয়া গেল।
—রাজন! রাজন! নিতাই পিছন পিছন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরই রাজা ফিরিল সেই উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে। হাসিয়া সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল। নিতাই প্রশ্ন করিল—হ'ল কি?
রাজার হাসিতে মুহূর্তের জন্য ছেদও পড়ে না এবং এমন টানা হাসির মধ্যে কথাও বলা যায় না। তবুও বহুকষ্টে রাজা বলিল—ভাগ হ্যায়। মাঠে মাঠে—। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎকট উচ্চহাসি।
নিতাই বুঝিল। গালিগালাজ-মুখরা রাজার স্ত্রী রুদ্র মূর্তিতে রাজাকে আসিতে দেখিয়াই বিপরীত দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখার অভিনয় করিয়া বলিল, এইসা করকে দেখতা; হাম এক পাঁও গিয়া তো

ফিন দৌড় লাগায়। অর্থাৎ রাজাকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলেই সে দৌড় দিয়াছে, আবার কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর এক পা বাড়াইয়াছে, দৌড়িয়া যাইবার ভঙ্গি করিয়াছে, অমনি রাজার বউও ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজার কিলকে তাহার বড় ভয়। বলিতে বলিতে রাজা আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এই মুহূর্তটিতেই বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল সেই ঠাকুরঝি। পরনে সেই ক্ষারে ধোয়া ধবধবে মোটা সূতার খাটো কাপড়, মাথায় পরিচ্ছন্ন মাজ পিতলের ঘটী। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সেটি সোনার মত ঝকঝক করিতেছে।

নিতাই সাদরে আহবান করিল—এস ঠাকুরঝি, এস!

ঠাকুরঝি রাজাকে এমনভাবে হাসিতে দেখিয়া বিপুল কৌতুক অনুভব করিল। সকৌতুকে সে রাজার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া নিতাইকে প্রশ্ন করিল তাহার স্বভাবগত বাচন ভঙ্গিতে—এই, এই, জামাই এত হাসছে কেনে?

—শুধাও ভাই জামাইকে। নিতাই হাসিল।

—অ্যাই! অ্যাই! ই কি হাসি গো! এমন ক'রে হাসছ কেনে গো জামাই? সঙ্গে সঙ্গে হাসির ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিয়া গেল। সেও হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি। হি-হি-হি। অত্যন্ত দ্রুত মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের মত হাসি।

রাজার হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল। তাহার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসার জন্য সে ভীষণ চটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল মেয়েটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ভীষণ চটিয়া রাজা ধমক দিয়া উঠিল—অ্যাও! .

ধমক থাইয়া মেয়েটির হাসি বাড়িয়া গেল।

রাজা বলিল–আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাত বের করে হসছে দেখ! লজ্জা নাই তোর?

এবার মেয়েটি যেন মার খাইয় স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিরা অত্যন্ত ব্যস্তভা প্রকাশ করিয়া সে বলিল–লাও বাপু, দুধ লাও! আমার দেরি হয়ে গেল। গেরস্ততে বকবে।

রাজা বলিল—তোকেও একদিন ঠাঙানি দিতে হবে দেখছি। দিদির মত মাঠে মাঠে—? আবার সে হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুরঝি কিন্তু এবার হাসিল না। সে নীরবে নতমুখে ঘটী হইতে মাপের মাসে দুধ ঢালিয়া গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়া আবার তাগাদ দিল—কই গো, কড়াই পাত।

নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের কড়াটি পাতিয়া দিয়া বলিল—রাগ করলে ঠাকুরঝি? না না, রাগ ক'রো না।

ঠাকুরঝি উত্তর দিল না, মাপা দুধ ঢালিয়া দিয়া সে নীরবেই চলিয়া গেল। পিছন হইতে রাজা এবার রসিকতা করিয়া বলিল—ও, ঠাকুরঝি আমার ডাকগাড়ি গেল। বাবা রে, বাবা রে, ছুটেছে! পোঁ—ভস-ভস ভস-ভস। বাবা রে।

ঠাকুরঝি কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না।

নিতাই বলিল—না রাজন, এ-প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হ'ল না।

কিন্তু রাজা সে কথা স্বীকার করিল না। কিসের অনুচিত? সে ফুৎকারে আপনার অন্যায় উড়াইয়া দিল—ধে-ৎ!ত

সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ীর ঘণ্টা দিতে হইবে। এই সময়টি নির্ণয়ে ঠাকুরঝি তাহার সিগনাল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গ্রামে গেলেই সে স্টেশনের দিকে রওনা হয়, মধ্যপথেই শুনিতে পায় মাস্টার হাঁকিতেছে—রাজা!

রাজা নিত্য সাড়া দেয়, আজও দিল—হাজির হ্যায় হুজুর।

ঠাকুরঝি এবং রাজন দুজনেই চলিয়া গেল। নিতাই একটু বিষন্ন হইয়াই বসিয়া রহিল। না-না, এমন ভাবে ওই মিষ্টি মেয়েটিকে রাজনের এমন দু কথা বলা উচিত হয় নাই। সংসারে মুখ ভালবাসায়, মিষ্টি কথায়। কাল রাত্রে গাওয়া গানখানি আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল।

"আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—
মুখের সার সে চোখের জলে রে!"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গিয়াছে; চা খাইতে হইবে। সে উনান ধরাইতে বসিল। দোকানী বণিক মাতুলের মাপা চায়ে তাহার নেশা হয় না; তা ছাড়া শরীরটাও আজ ভাল নাই। গত রাত্রির পরিশ্রমে, উত্তেজনায়, অনিদ্রায় — আজ অবসাদে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোল-কাঁসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর একটু চা ন হইলে জুত হইবে না।

উনান ধরাইয়া কেতলির বিকল্প একটি মাটির হাঁড়িতে সে জল চড়াইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল; তাহার মন আবার উদাস হইয়া উঠিল। না, রাজনের এমন কটু কথা বলা ভাল হয় নাই। ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভাল। আজ সে অনেক কথা অনর্গল বলিত। বলিবার ছিল যে! গত রাত্রির কবিগান শুনিয়া ঠাকুরঝি সবিস্ময়ে কত কথা বলিত মেয়েটি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে, তাই সে কথাগুলি না বলিয়াই চলিয়া গেল। আলকাতরার মত রঙ—। ছি, ওই কথাই কি বলে। কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তা ছাড়া কালো কি মন্দ। কৃষ্ণ কালে, কোকিল কালো—চুল কালো—আহা! আহাহা! বড় মুন্দর, বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে। হায়, হায়, হায়!

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

কেন কাঁদ?

কবি – ৬

বড় ভাল কলি হইয়াছে। নিতাইয়ের নিজেরই নেশা ধরিয়া গেল –

"কালো যদি মন্দ তরে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

বাহবা, বাহবা, বাহবা! কেন কাঁদ?

ওদিকে চায়ের জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া নিতাই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা নামাইয়া চা ফেলিয়া দিয়া একটা কলাই-করা লোহার থাল চাপা দিল। ফুটন্ত জলে প্রত্যেক জনের জন্য এক চামচ চা দিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষ করুন'–বেনে মামার স্টলে নিতাই চা প্রস্তুত করিবার বিজ্ঞাপন পড়িয়ছে! কিন্তু তাহার পর কি?

চা দিয়া আবার সে আপন মনে কলিটা ভাজিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলি আর মনোমত হইতেছে না। সে জানালা দিয়া বাহিরের যাবতীয় কালো বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তবু পছন্দসই দ্বিতীয় কলি আসিল না। অন্য দিন সে গরম জলে চা দিয়া মনে মনে এক হইতে ষাট পর্যন্ত পাঁচবার গনিয়া যায়, তারপর দুধ চিনি দেয়। আজ আর সে হইয়া উঠিল না, কেবলই কলিটা গুনগুন করিয়া ভাজিয়া মনে মনে দ্বিতীয় কলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিল। অকস্মাৎস্তুহার চায়ের কথা মনে হইতে সে দুধ চিনি দিয়া চ ছাকিয়া লইল। কলাইকরা লোহার মগে চা লইয়া বাকিটা রাজার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে আসিয়া বসিল কৃষ্ণচুড়া গাছটির তলায়। এটি তাহার বড় প্রিয় স্থান। ঘন কালো সরু সরু পাতায় ছাতার মত গাছটি; নিতাই বলে –'চিরোল-চিরোল পাতা'। তাহার উপর যখন চৈত্রের শেষ হইতে থোপ-থোপা লাল ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন নিতাই প্রায় অহরহই

গাছটির তলায় বসিয়া থাকে ফুলের লোভে ছেলের দল আসে, নিতাই তাহাদিগকে ঝরা ফুল দিয়া বিদায় করে, গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে দেয় না।

স্টেশন হইতে রাজার হাঁক-ডাক আসিতেছে। এই ট্রেনটার সঙ্গে মালগাড়ী থাকে, এখানকার মাল থাকিলে গাড়ী কাটিয়া দিয়া যায়—সেই গাড়ী শান্টিং হইতেছে। নিতাইও আগে নিয়মিত অন্য কুলিদের সঙ্গে মালগাড়ী ঠেলিত। সহসা তাহার মনের গান চাপা দিয়া জাগিয়া উঠিল জীবিকার ভাবনা। কুলিগিরি সে আর করিবে না, সে কবিয়াল। কুলিগিরি না করিলে অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া?

এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ চোখে পড়িল লঘু ক্রত গমনে ঘন ঘন পা ফেলিয়া ধপধপে মোটা কাপড় পর, হাল্কা কাশফুলের মত চলিয়াছে ঠাকুরঝি মাথায় সোনার টাোপরের মত ঝকঝকে পিতলের ঘাট। ঠাকুরঞ্চির কখাও যেমন দ্রুত, চলেও সে তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে। ঢাঙা নয়, অথচ সরস কাচু বাঁশের পর্বের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখজুড়ানো লম্বা টান আছে। ওই দীঘল ভঙ্গিটি নিতাইয়ের সব চেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাহার কালে কোমল ত্র। যুক্তবারই সে ঠাকুরঝিকে দেখে ততবারই এই কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে সাড়া

তোলে।

ঠাকুরঝি আজ অত্যন্ত দ্রুত চলিয়াছে। নিতাই মনে মনে একটু হাসিল—তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরঝি এমন হনতুন করিয়া চলিয়াছে। শক্তি থাকিলে ঠাকুরঝি নিশ্চয় মাটি কাঁপাইয়া পথ চলিত। কিন্তু রাজনের এমন কড়া কথা বলা ভাল হয় নাই। আলকাতরার মত রঙ হইলেও ঠাকুরঝি তো মন্দ দেখতে নয়! মন্দ কেনা, ভালই। কালো রঙে কি আসে যায়!

‘কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?’

নিতাই ডাকিল—ঠাকুরঝি! অ ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি গ্রাহ্য করিল না, সে হনহন করিয়াই চলিয়াছে।

—আমার দিব্যি! নিতাই হঁকিয়া বলিল।

ঠাকুরঝি থমকিয় দাঁড়াইল।

মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুতভঙ্গিতে মেয়েটি বলিল—না, আমার দেরি হয়ে যাবে।

—একটা কথা। শোন শোন।

—না। ওইখান থেকে বল তুমি।

—আমার দিব্যি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঠাকুরঝি এবার আগাইয়া আসিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল— তোমার দিব্যি যদি আমি না মানি?

—না মানলে মনে বেথা পাব, আর কি ঠাকুরঝি নিতাই ছলনা করিয়া বলিল না, আন্তরিকতার সহিতই বলিল।

অপেক্ষাকৃত শান্ত সুরেই এবার মেয়েটি বলিল—লাও কি বলছ, বল!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—রাগ করেছ?

মুহূর্তে ঠাকুরঝির ভীরু চকিত দৃষ্টি ভরা চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—কালো আছি, আমি আপনার ঘরে আছি। কেউ তো আমাকে খেতে পরতে দেয় না!

নিতাই হাসিয়া বলিল—আমি কিন্তু কালো ভালবাসি ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির মুখের কালো রঙে লাল আভা দেখা যায় না, তবু তাহার লজ্জার গাঢ়তা বোঝা যায়। নিতাই কিন্তু গ্রাহ্য করিল না, সে গালে হাত দিয়া মৃদ্ধ স্বরে গান ধরিয়া দিল—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।

লজ্জিত ঠাকুরঝি এবার সবিস্ময়ে শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল, বলিল—লতুন গান? বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—কাল তুমি বাপু ভারি গান করেছ।

—ভাল লেগেছে তোমার?

—খুব ভাল।

—এস, এস, একটুকুন চা আছে—খাবে এস।

—ন না। ঠাকুরঝির চা খাইতে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু মেয়েদের ভাল লাগার কথা নাকি বলিতেই নাই। ছি!

নিতাই আবীর দিব্যি দিল—আমার দিব্যি। নিতাই বাসার দিকে ফিরিল। রাজনের জন্য যে চাটুকু ছাঁকিয়া রাখিয়াছিল, সেটা উনানের উপরে বসানোই ছিল, সেটা দুইটা পাত্রে ঢালিরা একটা ঠাকুরঝিকে আগাইরা দিল। মেয়েটি আবার সলজ্জ ভাবে বলিল—না, না, তুমি খাও।

—না, তা হবে না। তাহলে বুঝব, তুমি এখনও কোধ করে আছ।

বাটিটা টানিয়া লইয়াসকৌতুক বিস্ময়ে ঠাকুরঝি বলিল—কোধ কি গো? কোধ?

—রাগ। কোধ' মানে হ'ল গিয়ে তোমার রাগ! কয়ে রফল 'ও'কার ধ, কোধ! 'হিংসা কোধ অতি মন্দ কভু নহে ভাল'। বুঝলে ঠাকুরঝি, এই কারুর হিংসে করো না, আর কোধ করো না। কোধের নাম হ'ল চণ্ডাল।

গভীর বিস্ময়ে মেয়েটি নিতাইয়ের দিকে চাহিয়। প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে?

গম্ভীরভাবে নিতাই উপরের দিকে চাহিয়া পরম-তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল—ভগবানের ছলনা ঠাকুরঝি! নইলে কবিয়াল ক'রেও তিনি আমাকে 'ডোম'-কুলে পাঠালেন কেনে, বল?

নীরব বিস্ময়ে মূর্তিমতী শ্রদ্ধার মত মেয়েটি কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখের উপর ভাসিতেছিল—শত শত লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিতেছে!

অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সবই তার লীলা। না হলে আমাকে ঠাট্টা করে কপিবর, মানে হনুমান বলে!

চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরঝির ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল-কে? কে বটে, কে?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সে আর শুনে কি করবে বল? লাও, চা খাও। জুড়িয়ে গেল।

ঠাকুরঝি এবার পিছন ফিরিয়া বসিল, জামাই বা নিতাইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া সে কখনও কিছু খায় না। পিছন ফিরিয়া বসিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সে বলিল—না, বলতে হবে তোমাকে। কে বটে, কে সে? জামাই বুঝি? জামাই অর্থে রাজন।

—না না, ঠাকুরঝি, রাজন আমার পরম বন্ধু, বড় ভাল নোক।

—হ্যাঁ, ভাল নোক না ছাই। যে কট কটে কথা!

—না, না। আজ তোমাকে ওটা পরিহাস করে বলেছে। তুমি শালী, পরিহাসের সম্বন্ধ।

—পরিহাস কি গো?

—ঠাট্টা, ঠাট্টা। তোমার সঙ্গে তো ঠাট্টার সম্বন্ধ।

ঠাকুরঝি চুপ করিয়া রহিল, নিতাইয়ের কথাটা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ঠাকুরঝির কোমল কালো আকৃতির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ মিল আছে, সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বলিল—তা বটে। জামাই আমাদের রাগীদার হোক, নোক ভাল।

—ভারি ভাল নোক।

—কিন্তু তোমাকে উ কথা কে বললে, বলতে হবে। সে মুখপোড়া কে বটে, কে?

—গাল দিয়ে না ঠাকুরঝি, জাতে ব্রাহ্মণ। ওই যে বণিক মাতুলের দোকানে বক্র মুনির মত বসে থাকে আর ফরফর করে বকে? ওই বিপ্রপদ ঠাকুর।

—কেন উ কথা বলবে?

—ছেড়ে দাও কথা। জাতে ব্রাহ্মণ, আমি ছোট জাত-তা বলে বলুক।

—আঃ ভারি আমার বাভন। কই, এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেখি, একবার দেখি। উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসিয়া গেল।

নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বা-বা-বা! ভারি মানিয়েছে তো ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝির রুক্ষ কালে চুলের এলে খোপায় এক থোক টকটকে রাঙা কৃষ্ণচুড়া ফুল। লজ্জায় মেয়েটি সচকিত হরিণীর মত তাহার খসিয়া-পড়া ঘোমটাখানি ক্ষিপ্র হস্তে, দ্রুত ভঙ্গিতে মাথায় তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, সে খপ করিয়া হাতখানি ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল—দেখি! দেখি! বা-বা-বা!

মেয়েটি লজ্জায় অধোমুখ ও কাঁদো কাঁদো হইয়া গেল, বলিল—ছাড়ে। ছাড়ে।

মুহূর্তে নিতাইয়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চায়ের বাটিটা হাতে নতমুখে ছুটিয়া পলাইয়া গেল–বাটিটা ধুইবার অজুহাতে। নিতাই লজ্জিত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। ছি! ছিঃ! ছি! এ কি করিল সে?

চুপ করিয়াই সে বসিয়াছিল, হঠাৎ ইং শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল—ঠাকুরঝি বাটিটা নামাইরা দিয়া আপনার ঘটীটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সলজ্জ হাসিতে ঠাকুরঝির কাঁচা মুখখানি রৌদ্রের ছটায় কচি পাতার মত ঝলমলে হইয়া

উঠিয়াছে। চোখোচোথি হইতেই ঠাকুরঝি হাসিয়া চট করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, সেই বেগে তাহার আবার মাথার ঘোমটা খসিয়া গেল। ঠাকুরঝি এবার ছুটিয়া পলাইয়া গেল, ঘোমটা তুলিয়া না দিয়াই —তাহার রুক্ষ কালো চুলে লাল কৃষ্ণচূড়া পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মত জ্বলিতেছে!

না, ঠাকুরঝি রাগ করে নাই। ওই যে, যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া চাহিয়া হাসিতেছে। কিন্তু কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড় বড় চমৎকার মানাইয়াছে।

ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মত ছোট হইয়া পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল। নিতাই বসিয়া আপন মনেই ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলিটাও তাহার মনে আসিয়াছে।

“কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?”

কবি — ৭

কালো কেশে রাঙা কুমুমের শোভা দেখিয়া গান রচনা করিয়া কবি হওয়া চলে, কিন্তু ও শোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলা চলে না। নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল— বিষম হুঁচোট। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটার চারিপাশ কাটির রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। সে ওই গানখানা ভাঁজিতে ভাঁজিতে চণ্ডীতলায় চলিয়াছিল। নির্জন পথ—বাঁ হাতখানি গালের উপর রাখিয়া নিতাই বেশ উচ্চ কণ্ঠেই গান ধরিয়া চলিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে ডান হাতের তর্জুনী নির্দেশ করিয়া যেন কালো চুলে রাঙা কুসুমের শোভাটি কাহাকেও দেখাইয়া দিতেছিল; যেন দ্রুতপদে ঠাকুরঝি তাহার আগে আগেই চলিয়াছে এবং তাহার রুক্ষ কালে চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছটি ঝলমল করিতেছে।

হঠাৎ আঙুলে হুঁচোট খাইয়া বেচারী বসিয়া পড়িল। দুর্বল শরীরে চোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এ কয়দিন নিতাই এখন একবেলা খাইতেছে। উপার্জন নাই, পূর্বের সঞ্চয় যাহা আছে, সে অতি সামান্য; সে সঞ্চয় আবার দোকানে লাগাইতে হইবে। সেই জন্য নিতাই একবেলা খাওয়া বন্ধ করিয়াছে; একেবারে অপরাহ্ন বেলায় সে এখন কোনদিন রাঁধে পয়েস, কোনদিন খিচুড়ি। কথাটা সে রাজাকেও বলে নাই, ঠাকুরঝিকেও না। তাহারা জানিলে বিষম আপত্তি তুলিবে। রাজা হয়ত পাঁচ-সাত টাকা বানাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিবে— চালাও পানসী—বানাও খানা—ফিন্ দরকার হোনেসে দেগা।

রাজার মত বন্ধু আর হয় না। এদিকে রাজা সত্য-সত্যই রাজা। বিপ্রপদ যে-সব নাম তাহাকে দিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি এখন নিতাইকে পীড়া দেয়, কেবল একটি ছাড়া—সে নামটি হইল সভাকবি, রাজার সভাকবি। রাজার কাছে কোন লজ্জাই তাহার নাই; কিন্তু রাজার স্ত্রী রাণী নয়, সে রাক্ষুসী। বাপ রে। মেয়েটার জিভে কি বিষ। সর্বাঙ্গে যেন জাল

ধরাইয়া দেয়। মিলিটারী রাজা কঞ্চির আঘাতে মেয়েটার পিঠখান ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়—তবু তাহার জিভ বিষ ছড়াইতে ছাড়ে না; সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে।

মর্মচ্ছেদী জালা-ধরানো নিষ্ঠুর গালিগালাজ। পৃথিবীর উপরেই তাহার আক্রোশ, মধ্যে মধ্যে ট্রেনকেও সে অভিসম্পাত দেয়। ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয়, তবে সে স্টেশন-মাস্টার হইতে গার্ড, ট্রেন, সকলকে গালি-গালাজ দিতে আরম্ভ করে। সেই গালি-গালাজগুলি স্মরণ করিয়া নিতাই দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। রাজার বউয়ের গালি-গালাজের বাঁধুনী বড় চমৎকার, কবিয়ালেরাও এমন চমৎকার বাঁধুনী বাঁধিয়া গালি-গালাজ দিতে পারে না। কালই ট্রেনখানাকে অভিসম্পাত দিতেছিল— "পুল ভেঙে পড়ে যমের বাড়ী যাও; যে আগুনের আঁচে 'হাঁকিড়ে' 'হাঁকিড়ে' চলছ—সেই আগুনের তাতে অঙ্গ তোমার গ'লে গ'লে পড়ুক! যে চাকায় গড়গড়িয়ে চলে সেই চাকা মড়মড়িয়ে ভেঙে গুড়ো হয়ে যাক—যে চোঙার গলায় চিলের মত চেঁচাও সেই গলা চিরে চৌচির হোক। তুমি উল্‌টিয়ে পড়, পাল্‌টিয়ে পড়; নরকে যাও।" বলিহারি বলিহারি! মহাদেবের আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা কোথায় লাগে ইহার কাছে!

রাজা অবসর পাইলেই নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বসে, তাই তাহার আক্রোশ নিতাইয়ের উপর কিছু বেশী। রাজার অনুপস্থিতিতে নিতাইকে শুনাইয়া কোন অনামা ব্যক্তিকে গালিগালাজ করে। সে হাসে। রাজার আর্থিক সাহায্য আর কিছুতেই লওয়া চলিবে না। রাজা দিতেও ছাড়িবে না, গোপনও করিবে না এবং রাণী জানিতে পারিবেই। সে জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কালই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির চা খাওয়া রাণী দেখিয়াছে। চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরঝি খিলখিল করিয়া

হাসিতেছিল। রাজার বউ বোধ হয় কোখাও যাইতেছিল, হাসির শব্দে সে উঁকি মারিয়া দুইজনকে একসঙ্গে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মুখ সরাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরঝি বেচারী মুহূর্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে নিতাইও। পরমুহূর্তেই বাড়ীর বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল—

“হাসিস না লো কালামুখী-আর হাসিস্ না,
লাজে মরি গলায় দড়ি—লাজ বাসিস্ না?”

ঠাকুরঝির আর চা খাওয়া হয় নাই, চা জুড়াইয়া গিয়াছিল, জুড়ানো চা রাখিয়া সে এক ঘটি ঠাণ্ড জল খাইয়া তবে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

হুঁচোটের ধাক্কাটা সামলাইয় নিতাই কোনমতে চণ্ডীতলায় আসিয়া উঠিল। চণ্ডীমাকে প্রণাম করিয়া সে মোহন্তের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

মোহন্ত সস্নেহেই বলিলেন—এস, কবিয়াল নিতাইচরণ এস।

নিতাই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে মোহন্তকে প্রণাম করিল।

—জয়োস্তু! তারপর, সংবাদ কি?

—আজ্ঞে প্রভু, আমাকে মেডেল দোব বলেছিলেন!

—মেডেল!

—আঞ্জে হ্যাঁ।

—আচ্ছ, সে হবে। পাবে। মোহন্ত অকস্মাৎ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সহসা চণ্ডীদেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—কালী কৈবল্যদায়িনী মা!

নিতাই চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। এমন ভাবাবেশের মধ্যে মোহন্তকে আর বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পর ওদিকে চণ্ডীর দাওয়ার উপর একটা শব্দ উঠিল—ঠং।

মোহন্ত মুহূর্তে উঠিয়া পড়িলেন। ওদিকে চণ্ডীমায়ের মন্দিরে যাত্রী আসিয়াছে, বোধ হয় একটা প্রণামী ছুঁড়িয়াছে।

মোহন্ত ফিরিয়া আসিতেই নিতাই সুযোগ পাইয়া আবার হাত জোড় করিয়া বলিল— বাবা!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মোহন্ত বলিলেন—বলেছি তো, পরে হবে। আসছে বার মেলার সময়, সমস্ত লোকের সামনে মেডেল দেওয়া হবে।

নিতাই অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল-আজ্ঞে, বিদায় কিছু দেবেন না?

—বিদায়! টাকা?

—আজ্ঞে।

মোহন্ত সকৌতুকে কিছুক্ষণ নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টির সম্মুখে নিতাইয়ের অস্বস্তির আর সীমা রহিল না। অকস্মাৎ মোহন্ত কথা বলিলেন—ভালা রে ময়না; ভাল বুলি শিখেছিল তো! টাকা! মায়ের স্থানে টাকা! গান গাইতে পেয়েছিল সেইটে ভাগ্যি মনিস না!

মোহন্তের কথার সুরে যেন চাবুকের জাল ছিল; সে জালায় নিতাই চমকিয়া উঠিল। লজ্জার আর সীমা রহিল না তাহার। সত্যই তো—গান গাহিতে পাইয়া সে-ই- তো ধন্য হইয়া গিয়াছে। আবার টাকা চার কোন মুখে।

ইহার পর কোন কথা না বলিয়া সে একবুকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। ফিরিবার পথে কিন্তু অকস্মাৎ তাহার চোখে জল আসিল; অকস্মাৎ মহাদেব কবিয়ালের ছড়াটা মনে পড়িয়া গেল—সেদিন গানের আসরে মহাদেব বলিয়াছিল, 'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগ্‌গে

যাবার আশা গো!’ ঠিক কথা, মহাদেব কবিয়াল,—আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বর্গে যায় না, যাইতে পারে না। কবিয়াল মহাদেব হাজার হইলেও গুণী লোক, সে ঠিক কথাই বলিয়াছে। তাহার কবি হওয়ার আশা আর আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতার স্বর্গে যাইবার আশা—এ দুই-ই সমান।

আপন মনেই সে বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজেকে শুনাইয়াই বলিয়া উঠিল-দু-রো! অর্থাৎ নিজের কবিয়ালত্বকেই দূর করিয়া দিতে চাহিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করিল আবার এই বারোটার ট্রেন হইতেই সে মোটবহন’ আরম্ভ করিবে।

বিপ্রপদ ঠাট্টা করিবে, তা করুক। কবিয়াল হইয় তাহার কাজ নাই। সে মনকে বেশ খোলসা করিয়াই সকৌতুকে গান ধরিল, মহাদেবের সেই গানটি—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে খাবার আশা গো!
ফরাৎ ক’রে উড়ল পাতী—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
হয়রে কলি—কিই বা বলি–গরুড় হবেন মশা গো।

খানিকটা আসিয়াই তাহার কানে একটা শব্দ আসিয়া ঢুকিল। ট্রেন আসিতেছে না? হ্যাঁ! ট্রেনই তো! সঙ্গে সঙ্গে চলার গতি সে দ্রুততর করিল। রাজা এতক্ষণে স্টেশনে গিয়া হাজির হইয়াছে। সিগন্যাল ফেলিবে, ট্রেনের ঘণ্টা দিবে। ঠাকুরঝি বোধ হয় তালাবদ্ধ ঘরের সম্মুখে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তো আজ কিছুতেই রাজার বাড়ী যাইবে না। কাল ছড়ার মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত রাজার স্ত্রী করিয়াছে! সে ছুটিতে আরম্ভ করিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, ট্রেনখানা তখন বিসর্পিল গতিতে সবে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। নিতাই হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া গেল। রোজগার কলকাইয়া গেল, ঠাকুরঝি চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কানে আসিল কে তাহাকে ডাকিতেছে—নিতাই!

স্টেশনের স্টলে দাঁড়াইয়া বণিক মাতুল তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া ডাকিতেছে—নিতাই, নিতাই!

বাতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বহুকষ্টে দেহসমেত ঘাড়খানা ঘুরাইয়া হাসিতেছে,—সেও ডাকিল,—কপিবর, কপিবর!

নিতাই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। একটা কঠিন উত্তর দিবার জন্যই সে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিক মাতুল কিন্তু বেশ খানিকটা খুশী সুরেই বলিল—নাঃ, সত্যিকারের গুণীন বটে আমাদের নিতাই। ওরে তোর কাছে যে লোক পাঠিয়েছে মহাদেব কবিয়াল। বায়না আছে কোথায়। গাওনা করতে হবে।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিতাই হতবাক হইয়া গেল।

মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে! বায়না আছে! অকস্মাৎ তাহার সে বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিল রাজনের চীৎকারে। উচ্ছ্বসিত আননে রাজন প্রায় গগনস্পর্শী চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—ওস্তা—দ! ওস্তা—দ!

রাজনের সঙ্গে একজন লোক। মহাদেবের দোয়ারের দলের একজন দোয়ার। এই মেলার আসরেই সে গান করিয়া গিয়াছে। নিতাই তাহাকে চিনিল।

—বায়না, ওস্তাদ, বায়না আয়া হ্যায়! সুজা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লোকটি নিতাইকে নমস্কার করিয়া বলিল—ভাল আছেন? এতক্ষণে নিতাই প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের কুশল? ওস্তাদ ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই পাঠালেন আপনার কাছে। একটা বায়না ধরেছেন ওস্তাদ, আপনাকে দলে দোয়ারকি করতে হবে। মহাদেব কবিয়ালের শরীর ভাল নাই। গলা বসেছে।

আপনার ভাল গলা। ওস্তাদ আপনাকে দিয়ে গাওয়াবে। আপনি নিজেও গাইবেন—এই আর কি!

রাজা বলিল—জরুর, জরুর, আলবৎ, আলবৎ যায়েগা! চলিয়ে তো বাসামে, বাতচিৎ হোগা, চা খেয়াগা।

নিতাই রাজার কথাকেই অনুসরণ করিল, আজ তাহর সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে—বায়না আছে! সেও বলিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ-নিশ্চয় যাব, নিশ্চয়। আসুন, বাসায় চা খেতে খেতে কথা হবে।

বাসার দুয়ারে আসিয়া নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, একটি ঝোপের আড়ালে—কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছায়াতলে, ও কে বসিয়া?

ঠাকুরঝি!

উৎসুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াই ঠাকুরঝি লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া বেশ ধীর ভাবেই বলিল—কোথা গিয়েছিলে বাপু, আমি দুধ নিয়ে বসে আছি সেই থেকে!

নিতাই বলিল—কাল একটুকু সকাল ক'রে দুধ এনে বাপু! কাল বারোটায় আমি কবি গাইতে যাব। তার আগেই যেন—

রাজা কথাটা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক আয়েগি; ঘড়িকে কাঁটাকে মাফিক আতি হ্যায় হামার ঠাকুরঝি। আজ রাজাও ঠাকুরঝির উপর খুশী হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরঝির মুখখানিও সেই খুশীর প্রতিচ্ছটায় মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল! ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া উঠে; আবার মেঘ উঠিলে আঁধার হয় – কে যেন কালি গুলিয়া দেয়!

ঠাকুরঝি সেই খুশীর ছটামাখা মুখে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল—তুমি কবিগান গাইতে যাবে কবিয়াল? বায়না এসেছে?

কথাটা ঠাকুরঝিও শুনিয়াছে।

নিতাই ফিরিল পাঁচদিন পর। ট্রেন হইতে যখন সে নামিল, তখন তাহার ভোল পালটাইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের একজোড়া নূতন জুতা, ময়লা কাপড়জামার উপর ধপধপে সাদা নুতন একথান উড়ানি চাদর। মুখে মৃদুমন্দ হাসি—কিন্তু বিনয়ে অত্যন্ত মোলায়েম। ট্রেনে সারা পথটা সে কল্পনা করিতে করিতে আসিতেছে, স্টেশনমাস্টার হইতে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া উঠিবে।

–এই যে নিতাই! আরে বাপ রে, চাদর জুতো! এই যে, বাপ রে তোকে চেনাই যায় না রে!

উত্তর নিতাই ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল।

—আজ্ঞে, চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন। আর জুতো জোড়াটা কিনলাম।

শিরোপার কথাটা অবশ্য মিথ্যা; জুতা-চাদর দুইই নিতাই নগদমূল্যে খরিদ করিয়াছে! গেরুয়া না পরিলে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ স্বীকার করে না, ‘ভেক নহিলে ভিখ মিলে না’; চাদর না হইলে কবিয়ালকে মানায় না। নগ্নপদ জনের পদবী মানুষ সহজে স্বীকার করিতে চায় না। তাই নিতাই পাদুক ও চাদর কিনিয়াছে। স্টেশনে নামিয়া প্রত্যাশাভরে মুখ ভরিয়া বিনীত অথচ আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও কেহ যেন তাহাকে দেখিল না; সম্ভাষণ দূরের কথা, কেহ একটা প্রশ্নও করিল না। যে প্রশ্ন করিবার একমাত্র মানুষ, সে তখন ইঞ্জিনের কাছে কর্তব্যে ব্যস্ত ছিল। মালগাড়ী শান্টিং হইবে। গাড়ি কাটিয়া রাজা ইঞ্জিনে চড়িয়া হাঁক মারিতেছিল—এই! হট যাও, এই—এই বুড়বক! হটো-হটো!

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া গেল। মানুষ বৈরাগ্যভরে যেমন জনতাকে জনবসতিকে পাশ কাটাইয়া পথ ছাড়িয়া আপথে সকলের অলক্ষিতে অগোচরে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই সে স্টেশনের মেহেদীর বেড়ার পাশের অপরিছন্ন স্থানটা দিয়া স্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়া উঠিল আপনার বাসার দুয়ারে। মনটা তাহার মুহূর্তে উদাস হইয়া গিয়াছে; শুধু মনই নয়, সারা দেহেই সে যেন গভীর অবসয়তা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ কানে ঢুকিল–গুণ গুন স্বর।
"কালো যদি মন তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"—গুনগুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে! ওই ঝোপটার আড়ালে; কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়। মুহূর্তে ভাটার নদীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ির ঘান ডাকিয়া গেল।, ঠাকুরঝি! তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছে ঠাকুরঝি। রবার-সোল ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে নিঃশব্দে নিতাই আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল এবং অপরূপ মৃদুস্বরে গাহিল,

'কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সচকিত বন্ত কুরঙ্গীর মত–বাবা রে! কে গো?
পরমুহূর্তেই সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল—কবিয়াল!
নিতাইয়ের মুখ ভরিয়া আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরম স্নেহভরে সে ভক্ত অনুরাগিণীটিকে বলিল—এস, চা খেতে হবে একটু!
ঘরে আসিয়া নিতাই চাদরখানি গল হইতে খুলিয়া রাখিতে গেল। কিন্তু বাধা দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—খুলো না, খুলো না; দাঁড়াও দেখি ভাল ক'রে!

ভাল করিয়া দেখিয়া ঠাকুরঝি বলিল–আচ্ছা সাজ হইছে বাপু। ঠিক কবিয়াল কবিয়াল লাগছে। ভারি সোন্দর দেখাইছে।

নিতাই বলিল-বাবুরা শিরোপা দিলে চাদরখানা।

—ম্যাডেল? ম্যাডেল দেয় নাই?

—সে আসছে বার দেবে। মেডেল কি দোকানে তৈরী থাকে ঠাকুরঝি!

—ত চাদরখানাও আচ্ছা হইছে। তুমি বুঝি খুব ভাল গায়েন করেছ, লয়?

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কহিল—খুব ভাল। 'কালো যদি মন্দ তবে' গানখানাও গেয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে কালো মেয়েটির মুখখানিও কেমন হইয়া গেল; চোখের পাতা দুইটা নামিয়া আসিল। সে দুইটা যেন অসম্ভব বকমের ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নত চোখে সে বলিল—না বাপু ছি! কি ধারার নোক তুমি? —

নিতাই হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।

—কি?

—চোখ বোজ দেখি। তা নইলে হবে না।

—কেন?

—আঃ, বোজই না কোন চোখ। তারপর চোখ খুললেই দেখতে পাবে।

ঠাকুরঝি চোখ বন্ধ করিল; কিন্তু তবু সে তাহারই মধ্যে মিটমিটি চাহিয়া দেখিতেছিল। নিতাই পকেটে হাত পুরিয়াছে।

—উ কি, তুমি দেখছ! নিতাই ঠাকুরঝির চাতুরী ধরিয়া ফেলিল। বোজ, খুব শক্ত করে চোখ বোজ।

পরক্ষণেই ঠাকুরঝি অনুভব করিল তাহার গলায় কি যেন কুপ করিয়ু পড়িল। কি? চকিতে চোখ খুলিয়া ঠাকুরঝি দেখিল, সূতার মত মিহি, সোনার মত ঝকঝকে একগাছি সূতাহার তাহার গলায় তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

ঠাকুরঝি বিস্ময়ে আনন্দে যেন বিবশ ও নির্বাক হইয়া গেল।

—সোনার?

—না, সোনার নয়, কেমিকেলের। সোনার আমি কোথায় পাব বল? আমি গরীব।

ঠাকুরঝির অন্তর তারস্বরে বলিয়া উঠিল—ত হোক, তা হোক, এ সোনার চেয়েও অনেক দামী। হারখানির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা তাহার থররর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নূতন কচি পাতার মত।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

রাজা আসিতেছে; ট্রেনখানা চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি সারিয়া রাজা স্টেশনের প্লাটফর্ম হইতে হাঁকিতে হাঁকিতে আদিতেছে।

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও চকিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তে ঠাকুরকি গলার সূতী-হারখানি খুলিয়া ফেলিল। শঙ্কিত চাপা গলায় বলিল—জামাই আসছে।

নিতাইও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল—ত হ'লে?

পরমুহূর্তেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখনও তাহার গলায় চাদর, পায়ে জুতা। খানিকট আগাইয়া গিয়াই সে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—রাজন, আপনার শরীর কুশল তো?

রাজার চোখ বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—আরে, বাপ রে, বাপ রে! গলামে চাদর—

বাধা দিয়া নিতাই বলিল—শিরোপা।

–শিরোপা!

—হাঁ। বাবুরা গান শুনে খুশী হয়ে দিলেন।

–হাঁ?

–হাঁ ।

—আরে, বাপ রে, বাপ রে! রাজা নিতাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর বলিল—আও ভাই কবিয়াল, আও।

—কোথায়?

—আরে, আও না। সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে।

—মামা! বনাও চা। লে আও মিঠাই।

বেনে মামাও যুবাক হইয়া গেল নিতাইয়ের পোশাক দেখিয়া। বাতে-পঙ্গু বিপ্রপদ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আড়ষ্ট দেহখানাকে টানিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া নিতাইকে দেখিল, তাহারও চোখে রাজ্যের বিস্ময় জমিয়া উঠিয়াছে।

নিতাই সবিনয়ে বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া আজ কতদিন পরে সুপ করিয়া টানিয়া লইল। তারপরে সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন প্রভু।

বেনে মামা বলিল–আমাদিগে কিন্তু সন্দেশ খাওয়াতে হবে নিতাই।

–নিশ্চয়। খাও ন মাতুল, সন্দেশ তো তোমার দোকানেই। দাম দেব।

—নেহি, হাম দেঙ্গে দাম। বানাও ঠোঙ্গা। কাঠের একটা প্যাকিং-বাক্স টানিয়া রাজ চাপিয়া বসিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের জায়গায় বসাইয়া দিয়া বলিল—বইঠ্ যাও।

এতক্ষণে বিপ্রপদ কথা বলিল, সে আজ আর রসিকতা করিল না, ঠাট্টাও করিল না, সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল—তারপর গাওনা কি রকম হ'ল বল দেখি নিতাই?

নিতাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল; বিপ্রপদকে আজ জয় করিয়াছে। ইহার অপেক্ষ বড় কিছু সে কল্পনা বা কামনা করিতে পারে না। সে আবার একবার বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, গাওনা আপনার চরম। দু'দিকেই দুই বাঘা কবিয়াল— এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে দেখ; একদিকে ছিষ্টিধর, অন্যদিকে মহাদেব। লোকে লোকরণ্যি। তার মেলাও তেমনি।

বেনে মামা ঠোঙায় মিষ্টি ভরিয়া হাতে হাতে দিয়া বলিল—খেতে খেতে গল্প হোক। খেতে খেতে! সকলকে ঠোঙা দিয়া সে নিতাইয়ের ঠোঙাটি অগ্রসর করিয়া ধরিল। কিন্তু নিতাইয়ের অবসর নাই—কথার সঙ্গে তাহার হাত দুইটিও নানা ভঙ্গিতে নড়িতেছে।

বিপ্রপদ ও এতক্ষণে ধীরে ধীরে সহজ হইয়া উঠিয়াছে, সে চট করিয়া বেনে মামার হাত হইতে ঠোঙাটি লইয়া ধমক দিয়া উঠিল—ভাগ বেট বেরসিক কাহাঁকা! কবিরা সন্দেশ খায় কোন্ কালে? কবিরা চাদের আলো খায়, ফুলের মধু খায়, কোকিলের গান খায়। তারপর নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তারপর নিতাইচরণ? একদিকে ছিষ্টিধর, একদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি! তারপর? বলিয়া সে দুইহাতে ঠোঙা ধরিয়া মিষ্টি খাইতে আরম্ভ করিল।

নিতাইয়ের উৎসাহ কিন্তু উহাতে দমিত হইল না। সে সমান উৎসাহেই বলিয়া গেল—একদিন, বুঝলে প্রভু, মহাদেবের নেশাটা খানিকট বেশী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন—মহাদেব হয়েছে কেষ্ট, ছিষ্টিধর রাধা। ছিষ্টিধর তো ধুয়ো ধরলে—"কালো টিকেয় আগুন লেগেছে— তোরা দেখে যা গো সাধের কালাচাঁদ।" গালাগালির চরম করে গেল। ওদিকে মহাদেব তখন বমি করছে। দোয়াররা সব মাথায় জল ঢালছে। আমি সেই ফাঁকে এসে ধরে দিলাম ধুয়ে —"কালো যদি মন তবে কেশ পাকিলে কাদ কেনে?" বাস, বুঝলেন

প্রভূ, বাবুভাই থেকে আরম্ভ করেসে একেবারে ‘বলিহারি, বলিহারি’ রব উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিরোপা এই চাদরখানা গলার ওপরে বীপাং করে এসে পড়ল।

কথাটা সত্য। নিতাই ধুয়াটা ধরিয়াছিল এবং লোকে সত্যই ভাল বলিয়াছে, কিন্তু শিরোপার কথাটা ঠিক নয়।

তবে শিরোপা পাইলে অন্যায় হইত না। নিতাই মেলায় গাওনা করিয়াছে ভালো। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার-দৃষ্টি একটা নূতন স্বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যই তো— কালো যদি মন্দই হইবে—তবে কালো চুলে সাদা রঙ ধরিলে—মন তোমার উদাস হইয় ওঠে কেন? নিতাই বার বার এই প্রশ্নটির জবাব চাহিয়াছিল। ছিষ্টিধর খ্যাতিমান কবিয়াল–সে মানুষকে জানে এবং চেনে–সে এ প্রশ্নের জবাব রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। গাহিয়াছিল—

“কালো যদি মন তবে কেশ পাকিলে কাঁদি ক্যানে?
কাঁদি না রে! কলপ মাখি!
কলপ মাখি,–না হয়, বউ তুলে দেয় হ্যাঁচকা টানে।”

লোকে খুব হাসিয়াছিল বটে কিন্তু ওই অদ্ভুত প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত সকৌতুক বিষন্ন তত্ত্বটি কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। পালা শেষের পর বহুজন পরস্পরের মুখের কাছে হাত নাড়ির গাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছে –

“কালো যদি মন্দ তবে—কেশ পাকিলে কাদে ক্যানে?”

পরের দিন আসরে নিতাইকে মহাদেব ইচ্ছা করিয়াই ছিষ্টধরের মুখের কাছে আগাইয়া দিয়াছিল। সেদিন ছিষ্টিধর দ্রোণ, মহাদেব একলব্য। আগের দিন প্রচুর বমি করিয়া মহাদেবের শরীরও ভাল ছিল না, গলাটাও বসিয়া গিয়াছিল। ছিষ্টিধরের কাছে হারের ভয়ও ছিল। তাই সম্বন্ধ পাতাইবার পর মহাদেব উঠিয়া আসর বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল—

আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে ব্যস আমার অনেক হলো—
ব্যাধের বেটা একলব্য বয়স তাহার বছর ষোলো;
আমাকে কি মানায় তাই? তাই হে দ্রোণ মোর বক্তব্য
একলব্যের বাবা আমি নিতাই হল একলব্য।

বলি–মানাবে ভাল হে!
ইহার উত্তরে ছিষ্টিধর উঠিয়া প্রথমেই কপালে চাপড় মারিয়া গাহিয়াছিল—

—টাকা কড়ি চাই নে কো মা—তোর দণ্ডসাজা ফিরিয়ে নে
হায় মহিষের কৈলে বাছুর বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।
নিজে বধলি মহিষাসুরে—
ছানাটাকে দিলি ছেড়ে—
আমায় বলিস বধতে তারে এ আজ্ঞে মা ফিরিয়ে নে।

তাহার পর মহাদেব এবং নিতাইকে জড়াইয়া গালাগালির আর আদি অন্ত রাখে নাই ছিষ্টিধর! মূল স্বর তার ওই। নিতাই যদি মহাদেবের পুত্র হয় তবে তাহারা অন্ত্যজ ব্যাধও নয়, তাহারা অসুর; মহাদেব ব্যাটা মহিষাসুর আর নিতাইটা মহিষাসুরের বাচ্চা!

–হ্যায় অমুরের শ্বশুরবাড়ীর ঠিক ঠিকানা নাই—
গরুর পেটে হয় দামড়া
গায়ে তাহার বাঘের চামড়া
বিধাতা সে অধোবদন—এ ব্যাটা ঠিক তাই।

সে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কোপাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটা! মহাদেবও অধোবদন হইয়াছিল। ভাঙা গলা লইয়া জবাব দিবার তাহার উপায় ছিল না। কিন্তু নিতাই দমে নাই। সে উঠিয়া গান ধরিয়া দিয়াছিল অকুতোভয়ে। তাহার আর হার-জিতের ভয় কি? সে গান ধরিয়াছিল—

ভাণ্ড পুত্র দ্রোণ ব্রাহ্মণ তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হে!

—মহাশয়গণ আমাকে উনি জন্তুপুত্র বলে গাল দিলেন। কিন্তু ওঁর জন্ম ভাণ্ডে—মাটির কলসীতে।

নারিকেলে নিন্দে করেন—ও কষুটে গুবাক হে!

—মানে সুপুরী। মশায় সুপুরী।

কিন্তু আর যোগায় নাই। ইহার পর সে উল্ট পথ ধরিয়াছিল। নিজেই হার মানিয়া লইয়া—মার খাওয়ার লজ্জাকে লঘু করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ছড়া ধরিয়াছিল—

বাস্তন প্রধান ওহে দ্রোণাচার্য্য
গুরু হয়ে তোমার এ কি অন্যায় কার্য্য
আমি একলব্য নহি সভ্য ভবঃ
না হয় ব্যাধের ছেলে বনে আমার রাজ্য
কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যায্য।
দশের সাক্ষাতে-পা নিলাম মাথাতে—

বলিয়াই ছিষ্টিধরের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—এখন রণং দেহি হারজিৎ হোক ধায্য। এবং একেবারে শেষ পালাতে হারিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল–

পভুগণ শুনুন নিবেদন!
আমি হেরেছি হেরেছি সত্য এ বচন।
হেরেই কিন্তু হয় সার্থক জীবন।

ছিষ্টিধর বলিয়া উঠিয়াছিল–নিশ্চয় নিশ্চয়। তাহার কারণ,—

মুণ্ডু কাটা যায় ধূলাতে গড়ায়
জিব বাহির হয় উল্টায় নয়ন।

এবং নিজেই জিব বাহির করিয়া চোখ উল্টাইয়া ভঙ্গি করিয়া অবস্থাটা প্রকট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। লোকে হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিতাই এই হাসির রোলের উপরেও এক তান ছাড়িয়াছিল—

–আ—আহা–।

তাহার সুস্বরের সেই মুর-বিস্তার মুহূর্তে সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহদের কৌতুক উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। বর্ষার জলো হাওয়ার মাতামতির উপর ছড়াইয় পড়া গুরুগম্ভীর জলভরা মেঘের ডাকের মত বলিলে অন্যায় বলা হইবে না, কারণ নিতাইয়ের গলাখানি তেমনই বটে। এবং গান ধরিয়া দিয়াছিল। খাঁটি গান। আপনার মনে অনেক সময় সে অনেক গান বাধে—গায়। তাহারই একখানি গান।

আহা—ভালবেসে—এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে!
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে!
আমার ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদীম জ্বালে রে।

উহাতেই আসরময় বাহক পড়িয়া গিয়াছিল।

ছিষ্টিধর বলিয়াছিল—তোর এমন গলা নিতাই—তুই যাত্রার দলে-টলে যাস না কেন? কবিগান করে কি করবি?

নিতাই আবার তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—সে তো পরের বাঁধা গান গাইতে হবে ওস্তাদ।

সবিস্ময়ে ছিষ্টিধর প্রশ্ন করিয়াছিল—এ তোর গান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ওস্তাদ।

ছিষ্টিধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল—তাহার পর বলিয়াছিল—হবে, তোর হবে। কিন্তু–

—কিন্তু কি ওস্তাদ?

—কবিয়ালিও ঠিক তোর পথ নয়। বুঝলি! কিন্তু তু ছাড়িস না। ভগবান তোকে মূলধন দিয়েছেন। খোয়াস না। বুঝলি!

ইহার পর নিতাইয়ের সেরাত্রে সে কি উত্তেজনা। সারারাত্রি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কত স্বপ্ন!

পরের দিন মেলায় বাহির হইয়া নিজেই চাদর জুতা কিনিয়া সাজিয়া-গুঁজিয়া, আয়নায় বার বার নিজেকে দেখিয়া, মনে মনে অনেক গল্প ফাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাবুর শিরোপা দিয়েছেন। সুখ্যাতির অজস্র সম্ভার সে তো দেখাইবারই নয়—তবে শিরোপাই তাহার প্রমাণ। দেখ। তোমরা দেখ!

শিরোপার গল্প শেষ করিয়া চা খাইতে থাইতে নিতাইয়ের মনে হইল ঠাকুরঝির কথা। সে কি এখনও ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে? নিতাই তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হতেই উঠিয়া

আসিয়া প্লাটফর্মের লাইনের উপর দাঁড়াইল। সমান্তরাল শাণিত দীপ্তির লাইন দুইটি দূরে একটা বাঁকের মুখে যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

কই? সেখানে তো স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ চলন্ত কাশফুলের মত তাহাকে দেখা যায় না!

তবে? সে কি এখনও ঘরে বসিয়া আছে?

দোকানে বসিয়া রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ। ওস্তাদ!

—হাঁ, আসছি, আসছি। বাড়ী থেকে আসছি একবার।

নিতাই দ্রুতপদে আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। হাঁ, এখনও সে বসিয়া আছে। নিতাইকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া পড়িল। কোন কথা না বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নিতাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল—রাগ করেছ?

মেয়েটি মুহূর্তে কাঁদিয়া ফেলিল।

—কি করব বল? ওরা কি ধ'রে ছাড়তে চায়—

—না। আমি বসে রইলুম, আর তুমি গেলা ওদের সঙ্গে গল্প করতে!

—তোমার হাতে ধরছি—

ঠাকুরঝি এবার হাসিয়া ফেলিল।

—ব'স, একটুকুন চা খাও। তোমার লেগে নতুন কাপ এনেছি—এই দেখ। সে পকেট হইতে একটি নূতন স্টীলের মগ বাহির করিল –ভুলে গিয়েছিলাম এতক্ষণ। নিতাই হাসিল।

—না। বেলা– বলিয়াই বেলার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।–ওগো মাগো! সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত পথটাই সে ভাবিতেছিল এই বিলম্বের জন্য কি বলিবে! চলিতে চলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল হারের কথা। সে খুঁট খুলিয়া হারখানি বাহির করিল। গলায় পরিল। সঙ্গে সঙ্গে সৰু আশঙ্কার কথা ভুলিয়া গেল।

পথে একটি ছোট নদী। স্বচ্ছ অগভীর জলস্রোতে তাহার কম্পিত প্রতিবিম্বের গলায় সোনার হার ঝিক্মিক্ করিতেছে, মেয়েটি সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, ধীরে ধীরে চঞ্চল জল স্থির হইল। এইবার একবার সে হার-পরা আপনাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর হারখানি খুলিয়া খুঁটে বাঁধিয়া নদী পার হইয় গ্রামে প্রবেশ করিল।

কি বলিবে, সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই, তবে তিরস্কার সহ করিতে সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

নিতাই এখনও দাঁড়াইয়া আছে কৃষ্ণচুড়া গাছটির তলায়। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরের দিকচক্রবাল ধূলার আস্তরণে ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস উতলা হইয়াছে, সেই উতলা বাতাস ধূলা উড়াইয়া লইয়া বহিয়া যায়, যেন দূরের নদীর প্রবাহের মত। নিতাইয়ের মন এখনও চঞ্চল। সে এখনও সেষ্ট ঝাপসা আস্তরণের মধ্যে যেন একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে। সে স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে মনে একটা বিচিত্র কথার মালা গাঁথিযয়া উঠিল। নিজেরই একসময় মনে প্রশ্ন জাগিল—কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে? ওই মেয়েটি তাহার কে? মনই বলিল—কে আবার—‘মনের মানুষ’। মনের মামুষের জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে । সাধ হয় এই পথের ধারেই ঘর বাঁধিয়া বাস করে। পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, হঠাৎ এক সময়ে তাহার আসার নিশানা

ঝিকমিক করিয়া উঠে। সেই কথাগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া স্বরতরঙ্গের দোলায় আপন মনেই গুন গুন ধ্বনি তুলিয়া দুলিতে লাগিল—

"ও আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বঁধিলাম ঘর!
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা,
আমায় হেথা টানে নিরন্তর।"

তাহাই সে করবে। পথের ধারে ঘর বাঁধিয়া অহরহ দাওয়ায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকিবে। ঘর হইতে ঠাকুরঝি বাহির হইলেই তাহার মাথার ঘটিতে রোদের ছটা লাগিয়া ঝিলিক উঠিবে, সে ঘটিতে ওঠা ছটার ঝিলিক আসিয়া তাহার চোখে লাগিবে। গান বাঁধিয়া সে সুরে ভাঁজিতে লাগিল—

ও আমার মনের মানুষ গো!

কবি – ৮

পথের ধারে ঘরের বদলে কুলি-ব্যারাকেই নিতাই দিবাস্বপ্ন শুরু করিল। গান গাহিয়া সে টাকা পাইয়াছে। কবিয়াল সৃষ্টিধর বলিয়াছে তাহার হইবে। সুতরাং তাহার আর ভাবনা কি?

ট্রেনভাড়া সমেত নিতাই পাইয়াছিল ছয়টি টাকা। কিন্তু ট্রেনভাড়া তাহার লাগে নাই। এই ব্রাঞ্চ লাইনটিতে নিতাই অনেকদিন কুলিগিরি করিয়াছে – গার্ড, ড্রাইভার, চেকার সকলেই তাহাকে চেনে, রাজার জন্য তাহাকে সকলেই ভাল করিরাই জানে, সেই জন্য ট্রেনভাড়াটা তাহার লাগে নাই, ছয়টা টাকাই বাঁচিয়াছিল! জুতা চৌদ্দ আনা, চাদর বারে আনা, দেশলাই বিড়ি আনা দুইয়েক—এই এক টাকা বারে আনা বাদে চার টাকা চার আন সম্বল লইয়া নিতাই ফিরিয়াছে। প্রত্যাশা আছে, আবার শীঘ্রই দুই-একটা বায়ন আসিবে। নিতাইয়ের ধারণা যাহারা তাহার গান শুনিয়াছে তাহদের মুখে মুখে তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—

—“নতুন একটি ছোকরা, মহাদেবের দলে দোয়ারকি করেছিল, দেখেছ?

–হ্যাঁ! হ্যাঁ! ভাল ছোকরা। বেড়ে মিষ্টি গলা।

—উঁহু। শুধু গলাই মিষ্টি নয়, কবিয়ালও ভাল। এবার মহাদেবের মান রেখেছে ওই। মহাদেব তো বেহুঁশ, ও-ই গান ধরলে—‘কালো যদি মন তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে।‘ তাতেই আসর একেবারে গরম হয়ে উঠল। দাও জবাব—কালো যদি মন্দ তবে কালো চুলের এত গরব কেন? এত ভালবাস কেন? পাকলেই বা মন খারাপ কেন?

—বল কি! ওই ছোকরার বাধা গান ওটা?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আমাদের মেলাতে ওই ছোকরাকেই আন।”

নিতাই মনে মনে নিজের দরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মহাদেব আট টাকা লইয়া থাকে, ছিষ্টিধর দশ টাকা; নিতাই পাঁচ টাকা হাকিবে, চার-টাকা-রাত্রিতে রাজী হইবে। এখন একজন ঢুলি চাই। রাজনের ছেলে যুবরাজকে দিয়া কাসী বাজানোর কাজ দিব্য চলিবে। এবার সে আরও ভাল গান বাঁধিয়াছে। সুরও হইয়াছে তেমনি। ‘ও আমার মনের মানুষ গো—তোমার লাগি পথের ধারে বঁধিলাম ঘর; ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা, আমায় হেথা টানে নিরন্তর।’ ইহাতেই মাত হইয়া যাইবে। একবার সুযোগ পাইলে হয়। মুস্কিল এখানেই। কবির পালায় এমন গান গাহিবার সুযোগ সহজে মেলে না। তবুও আশা সে রাখে। এই কারণেই ঢং ঢং করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িলেই সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্টেশনে বসে। ট্রেনের প্রতি যাত্রীকে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে। মেলা-খেলা লইয়া যাহারা থাকে, তাহদের চেহারার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে, নিতাই সেই ছাপ খুঁজিয়া ফেরে। কেবল যায় না বেলা বারোটার ট্রেনের সময়, কারণ ওই সময়টিতে আসে ঠাকুরঝি।

* * *

মাসখানেক পর। গভীর রাত্রি। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে ভাৰিতেছিল।

সেদিন তাহার হাতের সম্বল আসিয়া ঠেকিয়াছে একটি সিকিতে। তাহার মনটা অকস্মাৎ আবার ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। কোনরূপে আর চারিটা দিন চলিবে। তার পর? আবার কি মোট বহন করিতে হইবে?

নহিলে? উপোস করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে?

এদিকে ঠাকুরঝির কাছে দুধের দাম বাকী পড়িয়া যাইতেছে। দশ দিন আগে অরষ্ঠ সব সে মিটাইয়া দিয়াছে, দশ দিনের দশ পোয় দুধের দাম দশ পয়সা বাকী। নিতাই স্থির করিল, আজই সে দুধের রোজে জবাব দিবে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রেল-লাইনের বাকের মুখে যেখানে লাইন দুইটা মিলিয়া এক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। আজই তার শেষ দাঁড়াইয়া থাকা। 'ও আমার মনের মানুষ'–গান আর শেষ হইল না, হইবেও না; আজ হইতে সে ভুলিয়া যাইবে, আর গাহিবে না। ওইখনেই অকস্মাৎ এক সময়ে দেখা গেল, মাথায় ঘটি— সাদা ধপধপে কাপড় পরা ঠাকুরঝিকে।

ঠাকুরঝি আগাইয়া কাছে আসিল। তাহাকে দেখিয় নিতাই হাসিল। ঠাকুরঝি বলিল—না বাপু, তুমি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। নোকে কি বলবে বল দেখি?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—নোকে কি কথা বলবে জানি না। আমি তোমাকে একটি কথা বলবার নেগে দাঁড়িয়ে আছি।

নিতাই এখন ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই'ল-কারকে ন-কার করিয়া তুলিয়াছে। লোহাকে বলে নোয়া, লুচিকে বলে নুচি, লঙ্কা—নঙ্ক, লোক—নোক হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে। রাজনা, ঠাকুরঝি তাহার ভাষার এই মার্জিত রূপের পরম ভক্ত।

নিতাইয়ের কথা শুনিয়া ঠাকুরঝি সপ্রশ্ন ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি কথা? অকারণে মেয়েটির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তে দ্রুত হইয়া উঠিল। কি কথা বলিবে কবিয়াল?

নিতাই বলিল—অনেক দিন থেকেই বলব মনে করি, কিন্তুক—

একটু নীরব থাকিয় নিতাই বলিল—আর ভাই দুধের পেয়োজন আমার হবে না। ঠাকুরঝি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল। একথা শুনিবে তাহা তো সে ভাবে নাই! তাহার মুখের শ্রী

মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছিল। বর্ষার রসপরিপুষ্ট ঘনশ্যাম পত্রীর মত তাহার সে মুখখানি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া হেমন্ত শেষের পাতার মত পাণ্ডুর হইয়া আসিল। সে- হইতেছিল সম্পূর্ণভাবে তাহার অজ্ঞাতসারে। সে নির্বাক হইয়া শুধু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। নিতাইয়ের কথার শেষে তাহার মুখ এবার যে পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাহার আর পরিবর্তন ঘটিল না। অনেকক্ষণ পরে সে যেন কথা খুঁজিয়া পাইল। কথাটা নিতাইয়েরই কথা। সেই কথাটাই সে যেন কম্পিতকণ্ঠে যাচাই করিয়া লইল-আর দুধ নেবে না?

–না! —ক্যানে? কি দোষ করলাম আমি? তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিবার শক্তি তাহার ছিল না। কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া লক্ত্রিয়া বলিল—মিথ্যে কথা একেই মহাপাপ, তার ওপর তোমার কাছে মিথ্যে বললে পাপের আমার পরিসীমা থাকবে না। আমার সামর্থে কুলুচ্ছে না ঠাকুরঝি!

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল–দরিদ্র ছোটলোকের কবি হওয়া বড় বিপদের কথা ঠাকুরঝি।

কাতর অহুয়ে ব্যগ্রতা করিয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—তোমাকে পয়সা দিতে হবে না কবিয়াল। অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইয়ের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল।

নিতাই তার মুখর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর বলিল—না জানতে পারলে তোমার স্বামী পেহার করবে, শাশুড়ী তিরস্কার করবে, ননদে গঞ্জনা দেবে—

ঠাকুরঝি প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না না না। ওগো, একটি গাই আমার নিজের আছে, আমি বাবার ঘর থেকে এনেছি, সেই গাইয়ের দুধ আমি তোমাকে দোব।

নিতাই চুপ করিয়া রইল।

—লেবে না? কবিয়াল—? মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, দৃষ্টি ফিরাইরা নিতাই দেখিল, আবার তাহার চোখ দুইটিতে জল টলমল করিতেছে।

সান্ত্বনা দিবার জন্যই নিতাই মৃদু হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝির মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিতাইয়ের মুখের হাসিকেই সন্মতি ধরিয়া লইয়া মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উচ্ছ্বাসেই সে পুলকিত দ্রুত লঘুপদে নিতাইকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া নিজেই নিতাইয়ের বাসায় দুয়ার খুলিয়া ফেলিল। ঘরকন্না তাহার পরিচিত; দুধের পাত্রটি বাহির করিয়া দুধ ঢালিয়া দিয়া দ্রুততর পদে বাহির হইয়া গ্রামের দিকে পথ ধরিল।

নিতাই পিছন হইতে ডাকিল—ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝির যেন শুনিবার অবসব নাই, তাহার যেন কত কাজ। নিজের গতিবেগ আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

তখন চলিয়া গেলেও ফিরিবার পথে সে আসিয়া আবার বারান্দায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে বলিল—দাও, চা দাও। আমার নতুন কাপে দাও।

চায়ের কাপটি নামাইয়া দিয়া নিতাই বলিল-একটি কথা শুধাব ঠাকুরঝি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—বল?

—আমাকে বিনি পয়সার কেনে দুধ দেবে ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিতাই আবার প্রশ্ন করিল—বল কিসের লেগে?

ঠাকুরঝি বলিল-আমার মন।

নিতাই অবাক হইয়া গেল—তোমার মন?

ঠাকুরঝি বলিল—হ্যাঁ। আমার মন।

তারপর হাসিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—তুমি যে কবিয়াল! কত বড় নোক! বলিয়াই সে চায়ের কাপটি ইবার অছিলা বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল দুই হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে দুইটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। ফুল দুইটি আগাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—নাও। কবিয়ালের হাতে ফুল নিতে হয়।

ঠাকুরঝি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—না।

—তবে আমিও দুধ নোব না। ঠাকুরঝি লঘু ক্ষিপ্রহাতে ফুল দুইটি টানিয়া লইয়া এক রকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল।

নিতাই নূতন গানের কলি ভাঁজিতে বসিল। আজ আবার নূতন কলি মনে হইয়াছে। ‘ও আমার মনের মানুষ গো। গানটির শুধু দু’কলি আছে আর নাই; ও গানটি ভুলিবার সংকল্পই সে করিয়াছিল, কিন্তু বিধাতা দিলেন না ভুলিতে,—ঐ গানটিকে সে পুরা করিতে বসিল। বড় ভাল গান।

‘ছটায় ছটায় ঝিকমিকি তোমার নিশানা’—গুন গুন করিতে করিতেই সে একখানা কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিল। ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি শেষ করিয়া এইবার রাজন চা-চিনি লইয়া আসিবে, আবার একবার চা খাইবে।

নূতন কলি আসিয়াছে। বড় ভাল কলি। নিতাই খুব খুশী হইয়া উঠিল –

আহা—“সেই ছটাতে ঘর পুড়িল পথ করিলাম সার!”

তাই বটে, পথই সে সার করিয়াছে। কিন্তু তার পর? হ্যাঁ–হইয়াছে। পাইয়াছে সে পাইয়াছে—সেই পথের চারিদিকেই বাঁশী বাজিতেছে—পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দুঃখ কষ্ট নাই।

“চারদিকে চার বৃন্দাবনে বংশী বাজে কার?”

কার আবার? সেই ব্রজের বাঁশী! সে বাঁশী যে চিরকাল বাজিতেছে। প্রেম হইলে তবে শোনা যায়, নহিলে যায় না! সে শুনিয়ছে!

সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল—ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসে।

ঠাকুরঝিও তাহাকে ভালবাসে।

গুন গুন করিয়া নিতাই আপন মনে আখর দিল—

"বংশী বাজে তার।
ও রাধা রাধা রাধা বলে—

তারপর? তারপর? আহা—! সেই বাঁশী। না। না –হাঁ। —

"ঘর জ্বলিল—মন হারালো ছটায় সুরে গো!
সুখের একি আকুলু আতান্তর।"

আতান্তরই বটে। এ বড় আতান্তর!

অকস্মাৎ তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। একটা কথা মনে হইতেই গান বন্ধ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি ভিন্ন জাতি, অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। এ যে মহাপাপ! ও;! এ বড় আতান্তর!

অনেকক্ষণ নিতাই চুপ করিয়া রহিল। নির্জনে বসিয়া সে বার বার তাহার মনকে শাসন করিতে চেষ্টা করিল। বার বার সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই শাসন মানিতে চায় না। অবাধ্য মন লজ্জা পায় না, দুঃখিত হয় না, সে যেন কত খুশী হইয়াছে,

কত তৃপ্তি পাইয়াছে! ঘরের প্রতিটি কোণে যেন ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া আছে—অন্ধকারের মধ্যে ক্ষারে-ধোওয়া ধপধপে কাপড় পরিয়া সে যেন দাঁড়াইয়া আছে নিতাইয়ের মনের খবর জানিবার জন্য। নিতাই অধীর হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের জানালাটা খুলিয়া দিল। উদাস দৃষ্টিতে সে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল রেলের লাইনের দিকে। রেলের সমান্তরাল লাইন দুইটা যেখানে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে নিতাইয়ের আজ মনে হইল একটি স্থির স্বর্ণবিন্দু জাগিয়া রহিয়াছে, সে অচঞ্চল—সে নড়ে না—আগায় না, চলিয়া যায় না, স্থির। ঠাকুরঝি যেন ঘর হইতে বাহির হইয়! ওইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জানাল খুলিয়া দেওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়। যাইবার পথে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কবিয়াল তাহাকে ডাকে কিনা!

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। রাঙা ফুলে ভরা গাছ। 'চিরোল চিরোল' পাতার ডগায় থোপা থোপা ফুল! গাছটার এমন অপরূপ বাহার নিতাই আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সামনেই রেল লাইনের ওপাশে ৰন-আউচের গাছ-বন-আউচের মিঠা গন্ধ আসিতেছে। কদমের গাছটায় কচি পাতা দেখা দিয়াছে। বর্ষা নামিলেই কদমের ফুল দেখা দিবে। বাবুদের সুমবাগানে দুইটা কোকিল পাল্লা দিয়া ভাকিতেছে; একটু 'চোখ গেল' পাখী ডাকিতেছে চণ্ডীতলার দিকে। 'মধুকুলকুলি' পাখীগুলি নাচিরা নাচির উড়িয়া বেড়াইতেছে। রঙীন প্রজাপতির যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে কৃষ্ণচুড়া গাছটার চারিপাশে। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে।

ঠাকুরঝি যেন দ্রুতপদে চলিয়। আসিতেছে এই দিকে। নিতাইয়ের শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করিতেছে সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ডাকিল—এস। ঠাকুরঝি, এস। তোমার মনের কথা জামি বুঝিয়াছি। তুমি এস।

আমার পাপ হয় হোক, নরকে যাইতে হয় হাসিমুখেই যাইব, তবু তোমাকে বলিতে পারিব না—তুমি এস না। সে কি পারি? সে কথা কি মুখ দিয়া বাহির হইবার? এস তুমি, এস।

তাহার মনে হইল নষ্টচাঁদের কথা। সে চাঁদ দেখিলে নাকি কলঙ্ক হয়। নিতাই কিন্তু কখনও সে কথা মানে নাই। মনের মধ্যে তাহার আবার গান গুনগুন করিয়া উঠিল। আপনি যেন কলিটা আসিয়া পড়িল—

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?"

ঠাকুরঝি তাহার সেই চাঁদ। ঠাকুরঝি যদি আর না আসে, তবে নিতাই বাঁচিবে কি করিয়া? এখানে থাকিয়া সে কি করিবে? কোথায় মুখ তবে? সে এইখানে বসিয়া ওই পথের দিকে চাহিয়। চাহিয়া চোখের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিবে।

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?"
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ, তোমার নাগি—"

ও-হো-হো! গানের কলি হু-হু করিয়া আসিতেছে!

"ওগো চাঁদ তোমার নাগি—ন হয় আমি বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ।"

হায়, হায়, হায়! একি বাহারের গান! ওগো, ঠাকুরঝি। ওগো, কি মহা ভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে, তাই তো–তাই তো আজ এমন গান আপনি-আপনি আসিয়া পড়িল!

নিতাই উঠিল। সে চলিল ওই রেল লাইনের পথ ধরিয়া যে পথে ঠাকুরঝি আসে। কিছু দূর গিয়া পথ নির্জন হইতেই সে ওই গানটা ধরিয়া দিল।

রেল লাইনের বাঁধে ছেদ পড়িয়াছে নদীর উপর। বাঁধের মাথা হইতে পুল আরম্ভ হইয়াছে। বাঁধ হইতে নিতাই নামিল নদীর ঘটে; নদীতে অল্প জল, এক হাঁটুর বেশী নয়। হাঁটিয়াই ঠাকুরঝি নিত্য নদী পার হইয় আসে-যায়। নিতাই গিয়া নদীর ঘাটে দাঁড়াইল।

নিতাই চলিয়াছিল একেবারে বিভোর হইয়া। বাঁ হাতখনি গালে রাথিয়া ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যম আঙ্গুল দুইটি জুড়িয়া সে যেন ঠাকুরঝিকেই উদ্দেশ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। হয়তো সে একেবারে ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে গিয়াই হাজির হইত। নদীর ঘাটে পা দিয়াই হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল। তাই তো, সে কোথায় যাইতেছে? এ কি করিতেছে সে? ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে সে যদি গিয়া দাঁড়ায়, এই গান গায়, বলে—ঠাকুরঝি এ চাঁদ কে জান? এ চাঁদ আমার তুমি! তবে ঠাকুরঝির দশা কি হইবে? ঠাকুরঝির স্বামী কি বলিবে? তাহার শাশুড়ী ননদ কি বলিবে? পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া জুটিয়া যাইবে। তাহারা কি বলিবে? সকলের গঞ্জনার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরঝি—, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল ঠাকুরঝির ছবি। দিশাহারার মত তাহার ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিবে।

ঠাকুরঝির নিন্দায় ঘর-পাড়া-গ্রাম-দেশ ভরিয়া যাইবে। ঠাকুরঝি পথ হাঁটিবে, মাথা হেঁট করিয়া পথ হাটিবে, লোক আঙ্গুল দেখাইয়া বলিবে—ওই দেখ কালামুখী যাইতেছে।

কুৎসিত অভদ্র লোক ঠাকুরঝিকে কুৎসিত কুকথা বলিবে।

সে যদি ঠাকুরঝিকে মাথায় করিয়া দেশান্তরী হয়, তবুও লোকে বলিবে-মেয়েটা খারাপ, নিতাইয়ের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পরিবে না।

নিতাই নদীর ঘাটে বসিল।

আপন মনেই বলিল—আকাশের চাঁদতুমি আমার ঠাকুরঝি। তুমি আকাশেই থাক। আঃ–আজ কি হইল নিতাইয়ের! আবার কলি আসিয়া গিয়াছে –

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমার চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

নিতাই গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে আবার ফিরিল।

রাজা বলিল—কাঁহা গিয়া রহা ওস্তাদ?

নিতাই হাসিয়া বলিল—গানা, রাজন, গান। বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান আজ এসে গেল ভাই। তাই গুনগুন করছিলাম আর মাঠে মাঠে ঘুরছিলাম।

—হাঁ| বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান?

–হাঁ, রাজনা, অতীব উত্তম, যাকে বলে উচ্চাঙ্গের গান।

—বইঠে। তব, ঢোলক লে আতা হাম। রাজা ঢোল আনিয়া বসিয়া গেল। নিতাই একমনে গাহিতেছিল—চাঁদ তুমি আকাশে থাক—

হঠাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া রাজা বলিল—আরে ওস্তাদ, জাঁখসে তুম্‌্রা পানি কাহে নিকালতা ভাই?

চোখ মুছিয়া নিতাই বলিল–হাঁ রাজনা, পানি নিকাল গিয়া। কিয়া করেগা! চোখের জল যে কথা শোনে না ভাই!

পরদিন নিতাই সকাল হইতেই বসিয়া ছিল ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। আজ সকাল হইতেই তাহার মনে হইতেছে—মনে তাহার কোন খেদ নাই, কোন তৃপ্তিও নাই। সে যেন বৈরাগীই হইয়া গিয়াছে।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রি মনে মনে অনেক ভাবিয়াছে সে। সন্ধ্যায় গিয়াছিল রাজনের বাড়ী। রাজার স্ত্রী বড় মুখরা; ইদানীং রাজা নিতাইকে নানাপ্রকার সাহায্য করে বলিয়া সে নিতাইয়ের উপর প্রায় চটিয়াই থাকে। তবু সে গিয়াছিল। রাজা খুশী হইয়াছিল খুব। আশ্চর্যের কথা— কাল রাজার বউও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিল। ঘোমটার মধ্য হইতেই বলিয়াছিল— তবু ভাগ্যি যে ওস্তাদের আজ মনে পড়ল।

নিতাই তাহারই কাছে কৌশলে কথাপ্রসঙ্গে জানিয়াছে—ঠাকুরঝির স্বামীর সমস্ত বৃত্তান্ত। ঠাকুরঝির স্বামীটি নাকি দিব্য দেখিতে!

—রঙ পেরায় গোরো, বুঝলে ওস্তাদ, তেমনি ললছা-ললছা গড়ন। লোকটিও বড় ভাল। দুজনাতে ভাবও খুব, বুঝলে!

অবস্থাও নাকি ভাল। দিব্য সচ্ছল সংসার। রাজার স্ত্রী বলিল–যাকে বলে ‘ছছল-বছল’। আট-দশটা গাই গরু। দুটো বলদ। ভাগে চাষ-বাস করে। ঠাকুরঝির তোমাদের পাঁচজনার আশীর্বাদে সুখের সংসার।

নিতাই বলিয়াছিল—আহ! আশীর্বাদ তো চব্বিশ ঘণ্টাই করি মহারাণী।

রাজার স্ত্রী অদ্ভুত। সে এতক্ষণ বেশ ছিল, এবার ওই মহারাণী বলাতেই সে খড়ের আগুনের মত জলিয়া উঠিল। ওই—ওই কথা আমি সইতে লারি। মহারাণী। মহারাণী তো খুব। মেথরাণী, চাকরাণী তার চেয়ে ভাল। না ঘর না দুয়োর। র‍্যালের ঘরে বাস –আজ এখানা, কাল সেখান।

রাজা মুহূর্তে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল—কেঁও হারামজাদী? কেয়া বলতা তুম?

—কেয়া বোলতা তুম কি? হক কথা বলব তার ভয় কি?

তাহার পরেই কুরুক্ষেত্র। রাজা ধরিয়াছিল তাহার চুলে। তাহদের শান্ত করিবার জন্য নিতাই বারকয়েক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছু হয় নাই। রাজার স্ত্রী প্রায় রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত কাঁদিয়া রাজাকে গাল দিয়াছে, নিতাইকে গাল দিয়াছে। তাহার জের টানিয়া আজ সকালেও একদফা হইয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের উদাসীনতা অবশ্য সেজন্য নয়।

কাল সমস্ত রাত্রি সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মনকে বুঝাইয়াছে। ভাল তুমি বাস, কিন্তু সে কথা মনেই রাখ, কাহাকেও বলিও না—ঠাকুরঝিকেও না। তাহার মুখের ঘরসংসার-সে ঘর তাহার নিত্যনূতন মুখে ভরিয়া উঠুক। তুমি তাহার মনের সরমের বাঁধ ভাঙিয়া তাহার সে মুখের ঘর ভাসাইয়া দিও না।

বেল দ্বিপ্রহরের সময় ঠাকুরঝি আসিল ঘড়ির কাঁটার মত। রেল লাইনে জাগিয়া উঠিল সোনার বরণ একটি ঝকঝকে বিন্দু, তাহার পর ক্রমশ জাগিয়া উঠিল কাশফুলের মত সাদা একটি চলন্ত রেখা। ক্রমে কাছে আসিয়া সে হইল ঠাকুরঝি। একমুখ হাসি লইয়া ঠাকুরঝি তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কবিয়াল!

নিতাই অশ্রু-উদ্বেল কণ্ঠে বলিল—ঘরে বাটি আছে, দুধটা রেখে যাও।

সে বুঝিতে পারিল না কেন তাহার চোখে অকারণে জল আসিতে চাহিতেছে।

—না। তুমি এস। আমি অত সব লারব বাপু! আর—

—কি আর?

—রোদে এলাম, বসব একটুকুন।

—না ঠাকুরঝি। এমন ভাবে আমার ঘরে বসা ঠিক নয়। দেখ পাঁচজনে দুষ্য ভাববে।

ঠাকুরঝি স্তব্ধভাবে স্থিরদৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বিশ্রাম করবে যদি তো তোমার দিদির বাড়ী রয়েছে। আমি এক বেটাছেলে বাড়ীতে থাকি। পাঁচজনের দুষ্য ভাবার তো দোষ নাই। দেখ তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ ঠাকুরঝি! তাহার মুখে নিরুপায় মানুষের সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

* * *

দিন এমনি ভাবেই চলিতে আরম্ভ করিল। নিতাই উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকে। গানও আর তেমন গায় না। ঠাকুরঝি আসে, সেও আর নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না। দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইয়া, দুধের বাটিতে দুধ ঢালিয়া দেয়, চলিয়া যায়।

ইহারই মধ্যে নিতাই একদিন বলিল—শোন।

ঠাকুরঝি শুনিতে পাইল, কিন্তু দাঁড়াইল না। একবার মুখ ফিরাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই আবার ডাকিল—যেও না, শোন। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি এবার দাঁড়াইল।

—শোনা, এদিকে ফেরো।

ঠাকুরঝি ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিতাইয়ের চোখেও মুহূর্তে জল আসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না, না। যাও তুমি। বলব, আর একদিন বলব।

ঠাকুরঝি আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দিন কয়েক আবার সেই আগের মত চলিল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। একদিন ঠাকুরঝি দুধ ঢালিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলিল—সেদিন যে কি বলব বলেছিলে—বললে না?

নিতাই বলিল—বলব।

—বল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর একদিন বলব ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি একটু হাসিল। সে হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের বুক একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের বুক-ভরা দীর্ঘনিঃশ্বাসটা এতক্ষণে ঝরিয়া পড়িল। যে কথাটা বলা হইল না সেই কথা গান হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

"বলতে তুমি ব'লো নাকে, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মন-আগুনে!"

অনেকদিন পরে নিতাইয়ের মনে গান আসিয়াছে; দুঃখের মধ্যেও নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। গুন গুন করিয়া গান ধরিয়া নিতাই চলিল বাবুদের বাগানের দিকে। বাবুদের বাগানে তাহার গানের অনেক সমঝদার আছে। বাগানের প্রতিটি গাছ তাহার সমঝদার শ্রোতা। এই বাগানেই সে প্রথম-প্রথম কবিগান অভ্যাস করিত। গাছগুলি হইত মজলিসের মানুষ। তাহাদের সে তাহার গান শুনাইত। আজও বাগানে আসিয়া সে গান ধরিল, ওই গানটাই ধরিল—

"সাক্ষী থাক তরুলতা, শোন আমার মনের কথা,
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে।
আমিই পুড়ি মন-আগুনে।"

গান শেষ করিয়া সে চুপ করিয়া বসিল। না, এমনভাবে আর দিন কাটে না। এই মনের আগুনে সে আর পুড়িতে পারিবে না। শুধু মনের আগুনই নয়, পেটের আগুনের জালা, সেও তো কম নয়! রোজগার গিয়াছে; পুঁজি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। রোজগারের একমাত্র পথ মোটবহনা, কিন্তু কবিয়াল হইয়া তো ঐ কাজ সে করিতে পারিবে না। অন্যত এখানে সে পারিবে না। এখান হইতে তাহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাই করিবে সে। কালই গিয়া মা চণ্ডীকে প্রণাম কুরিয়া মনে মনে বলিবে—মা গো, তোমার অভাগা ছেলে নিতাইচরণকে কবিয়াল করিলে, কিন্তু তাহার মনের দুঃখ পেটের দুঃখ বুঝিলে না। কোন উপায় করিলে না। সে চলিল, তাহাকে বিদায় দাও তুমি। তাহার মনে পড়িয়া গেল অনেক দিনের আগের একটা শোনা গানা, বাউলেরা গাহিত, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান—

"বিদায় দে মা ফিরে আসি ।"

ওই প্রথম কলিটা লইয়া তাহার পাদপূরণ করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

"বিদায় দে মা ফিরে আসি;
বলতে কথা বুক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি।"

স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া ছিল। তাহার সে স্তব্ধতা ভাঙিল রাজনের ক্রুদ্ধ চীৎকারে। সে সচকিত হইয়া উঠিল। রাজা কাহাকে দুর্দান্ত ক্রোধে ধমক দিতেছে—চোপ রহো! পরক্ষণেই স্ত্রী-কণ্ঠে তীক্ষ কর্কশ ধ্বনি ধ্বনিত হইয় উঠিল—চা-চিনি নিয়ে যাবে! কেনে? কিসের লেগে? লাজ নাই, হায়া নাই, বেহায়া, চোখখেগো মিনসে!

আর কথা শোনা গেল না, শোনা গেল দুপ-দাপ শব্দ, আর স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত চীৎকার। রাজা নীরবে স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে, রাজার স্ত্রী উচ্চ চীৎকারে কঁদিতেছে। নিতাই ছি-ছি করিয়া সারা হইল। নাঃ, এই চায়ের পর্বটা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ! স্ত্রীকে প্রহার করিয়া সেই মুহূর্তটিতেই রাজা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। —বানাও চা –পন্‌রা ষোলা আদমীকে মাফিক। প্রায় পোয়াখানেক চা, আধসেরটাক চিনি সে নামাইয়া দিল। রাজার স্ত্রীর দোষ কি? এত অপব্যয় কেহ চোখে দেখিতে পারে? আর এত চা-চিনি হইবেই বা কি?

নিতাই গম্ভীরভাবে বলিল-রাজন!

রাজন নিতাইয়ের কথায় কানই দিল না, সে বাসার বাহিরে চলিয়া গেল, দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া হাঁকিল—হো ভেইয়া লোক হো! হাঁ হাঁ, হিঁয়া আও। চলে আও সবলোক, চলে আও।

নিতাই বিস্মিত হইয়া উঠিয়া আসিল।

মেয়ে-পুরুষের একটি দল আসিতেছে। ঢোল, টিনের তোরঙ্গ, কাঠের বাক্স, পোঁটলা—আসবাবপত্র অনেক। মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষগুলিরও বিশিষ্ট একটা ছাপ-মার চেহারা। এ ছাপ নিতাই চেনে।

—চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি! কথাটা যে বলিল, সে ছিল দলের সকলের পিছনে, দলটি দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সকলের আগে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার,—সেই শাণিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন

রৌদ্রের মধ্যে যেন নাচিয়া ফিরিতেছে মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী দুইটা কালো ভ্রমর।

রাজনের মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটা আবার বলিল—কই হে, কোথায় তোমার ওস্তাদ না ফোস্তাদ?

রাজন নিতাইকে দেখাইয়া বলিল-ওহি হামারা ওস্তাদ।

নিতাই অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে ইহাদের সকল পরিচয় দেখিয়াই চিনিয়াছে—ঝুমুরের দল। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে? সে কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। রাজা নিজেই বলিল–

ট্রেনসে জোর করকে উতার লিয়া। হিঁয়া গাওনা হোগা আজ। তুমকে ভি গাওনা করনে হোগা ওস্তাদ।

মেয়েটা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—ও হরি, এই তুমার ওস্তাদ নাকি? অ-মা-গ-অ! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশ-তনু থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধূলার ছুঁড়িরা ছিটাইয়া ফেলিয়া দেয়।

কবি — ৯

জলের বুক ক্ষুর দিয়া চিরিয়া দিলেও দাগ-পড়ে না, চকিতের মতন শুধু একটা রেখা দেখা দিয়াই মিলাইয়া যায় আর ক্ষুরটাও জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তেমনি একটি মৃদু হাসি নিতাইয়ের মুখে দেখা দিয়া ওই তরঙ্গময়ী কৃশতনু মেয়েটার কলরোল-তোলা হাস্যস্রোতের মধ্যে হারাইয়া গেল। নিতাইয়ের হাসি যেন ক্ষুর; কিন্তু ওই মেয়েটা যেন আবেগুময়ী স্রোতোশ্বিনী, তাহাকে কাটিয়া বসা চলে না। মেয়েট বরং নিতাইয়ের হাসিটুকুর জন্য তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই নিতাই সবিনয়ে সমস্ত দলটিকে আহ্বান জানাইয়। বলিল—আসুস, আসুন, আসুন।

নিতাই বাড়ীর মধ্যে আগাইয় গেল—সকলে তাহার অনুসরণ করিল। নিতাইয়ের বাসা — রেলওয়ে কুলি-ব্যারাক। লাইন কনস্ট্রাকশনের সময় এখানেই ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বড় অফিস, তখনকার প্রয়োজনে এই সমস্ত ব্যারাক তৈয়ারী হইয়াছিল, এখন সব পড়িয়াই আছে। দিব্য তকতকে সিমেন্ট বাধানো খানিকট বারান্দা, এক টুকরা বাঁধানে আঙিনা; সেই দাওয়া ও আঙিনার উপরেই দলটি বসিয়া পড়িল।

দলটি একটি ঝুমুরের দল। বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্ত্না পাতে, কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাতিয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়ের নাচে, গায়—অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়।

আসরে কিছু কিছু পেলাও পড়ে। রাত্রির আড়াল দিয়া মেয়েদের দেহের ব্যবসাও চলে। তবে ইহাই সর্বস্ব নয়, পুরাণের পালাগানও জানে, তেমন আসর পাইলে সে গানও গায়।

যন্ত্রীদের মধ্যে নিতাইয়ের ধরণের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মত কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়।

দলটি ঘরে ঢুকিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—বাঃ! গাছতলায় পথের ধারে আস্তানা পাতিয়া যাহারা অনায়াসে দিন রাত্রি কাটাইয়া দেয়, এমন বাঁধানে আঙিনা ও দাওয়া পাইয়া তাহাদের কৃতার্থ হইবার কথা–কৃতার্থই হইয়া গেল তাহারা। খুশী হইয়া তালপাতার চ্যাটাই বিছাইতে শুরু করিল। দীর্ঘ কৃশতনু মুখরা মেয়েটি কেবল সিমেন্ট বাঁধানো দাওয়ার উপর উঠিয়া সটান উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, ঠাণ্ডা মেঝের উপর মুখখানি রাখিয়া শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিল—আঃ! তাহার সে কণ্ঠস্বরে অসীম ক্লান্তি ও গভীর হতাশার কারুণ্য। সে যেন আর পারে না

—বসন! মেয়েদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় আছে, দলের কর্ত্রী, সে-ই বলিয়া উঠিল—বসন, জ্বর গায়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুলি কেন? ওঠ, ওঠ।

মেয়েটির নাম বসন্ত। বসন্ত সে কথার উত্তর দিল না, কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ করিয়া বলিল— কই হে, ওস্তাদ না ফোস্তাদ! চা দাও ভাই।

নিতাই চায়ের জল তখন চড়াইয়া দিয়াছে, সে বলিল—এই আর পাঁচ মিনিট। কিন্তু তোমার জ্বর হয়েছে—তুমি ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুলে কেন? একটা কিছু পেতে দো?–মাদুর?

বসন্ত চোখ মেলিল না, চোখ বুজিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ওলো, নাগর আমার পীরিতে পড়েছে। নগর শুধু নাগর নয়, পথের নাগর, দেখবামাত্র প্রেম! দরদ গলার গলায়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরুণী সঙ্গিনীর দলও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝির সেই নতুন মগটিতে চা ঢালিয়া নিতাই সেই মগটি বসন্তের মুখের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বুঝে খেয়ো, চায়ের সঙ্গে যোগবশের রস দিয়েছি। কবিয়াল নিতাই রসের কারবারী, রসিকতার এমন ধারালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র পাইয়া সে মুহূর্তে মাতিয়া উঠিল।

চায়ের গন্ধ পাইয়া ও স্টিলের মগের শব্দ শুনিয়া তৃষ্ণার্তের মত আগ্রহে বসন্ত ইতিমধ্যেই উঠিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ মচকাইয়া হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুইটা মেলিয়া চাহিয়া বসিল—বল কি নাগর। পীরিতে কুলোল না, শেষে যোগবশ!

অপর সকলকে চ পরিবেশন করিতে করিতে নিতাই গান ধরিয়া দিল—

“প্রেমডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে!
আর কি উপায় বৃন্দে—এইবার এনে দে এনে দে—
বশীকরণ লতা— বাঁধবে ছাঁদে ছাঁদে।”

গানটা কিন্তু নিতাইয়ের বাধা নয়, নিতাইয়ের আদর্শ কবিয়াল তারণ মোড়লের বাধা গান; নিতাইয়ের মুখস্থ ছিল।

ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে। নিতাইয়ের গানের অর্থ বসন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার চোখ দুইটা একেবারে শাণিত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেষ্ট মুখ নামাইয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল।

পুরুষদলের একজন বলিল—ভাল। ওস্তাদ, ভাল!

অল্পজন সায় দিল—হ্যাঁ, ভাল বলেছ ওস্তাদ।

—হ্যাঁ। ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া অন্য একটি মেয়ে বলিল—হ্যাঁ, ময়না বলে ভাল। নিতাইয়ের গানের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ, এক বসন্ত নয়—মেয়েদের সকলেরই গায়ে লাগিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন আবার বলিয়া উঠিল—“উনোন ঝাড়া কালে কয়লা-আগুন তাতে দিপি দিপি! ছেঁকা লাগে!”

নিতাই হাসিয়া বলিল—না ভাই, ছেঁকা কি দিতে পারি! আর তোমার সঙ্গে আমার কি পীরিত হয়, না হতে পারে? তুমি ফোঁটা ফুল আমি ধুলো। ফুলের পথের নাগর তো ধুলো—বলিয়াই গুনগুন করিয়া ধরিয়া দিল—

ফুলেতে ধূলাতে প্রেম হয় নাকো ফুল ফোটার কালে!
ফুল ফোটে সই আকাশমুখে চাঁদের প্রেমে হেলেদুলে।
ধূলা থাকে মাটির বুকে, চরণতলে অধোমুখে।
ফুল ঝরিলে করে বুকে
সেই লেখা তার পোড়া কপালে।

বল বটে কিনা?

বসন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটা কি?

প্রৌঢ় বিচারকের মতো স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—তা তোদের হার হল বাছা। জবাব তোরা দিতে নারলি। তা বাবা কি এ সব গান মুখে মুখে বেঁধে সুর দিয়ে গাইছ?

নিতাই সবিনয়ে বলিল—খানিক আদেক চেষ্টা করি। দু’চারটে আসরে কবি-গানও করেছি। গানটা আমার বাঁধাই বটে।

প্রৌঢ় বলিল—পদখানি তো বড় ভাল বাবা!

নিতাই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—তাঁর দয়া।

বসন্ত কোন কথা বলিল না, চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া মগটা নামাইয়া দিয়া আবার সে মাটিতে লুটাইয়া শুইয়া পড়িল। রাজা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাতে হাঁড়িমালসা, বগলে শালপাতার বোঝা। মিলিটারী রাজা—হুকুমের সুরেই ব্যবস্থা জানাইয়া দিল—ভেইয়া লোক, ও-হি বটতলামে জায়গা সাফ হো গিয়া, আব খানা-উনা পাকা লিজিয়ে।

এক সময় রাজাকে একা পাইয়া নিতাই চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—রাজন, এই সব খরচপত্র করছ—

রাজার সময় অত্যন্ত কম এবং সংসারে গোপনও কিছু নাই। সে বাধা দিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই—বলিল—সব ঠিক হ্যায় ভাই, সব ঠিক হ্যায়। বেনিয়া মামা আট আনা দিয়া, কয়লাওয়ালা চার আনা, মুদী আট আনা, মাস্টারবাবু আট আনা, গুদামবাবু আট আনা, গাডবাবু আট আনা, মালগাড়ীকে 'ডেরাইবর' আট আনা, হামারা এক রুপেয়া; বাস, জোড় লেও। তুমার এক রুপেয়া—উলোককে আড়াই রুপেয়া, বারো আনাকে চাউল ডাউল। বাস, হে গিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলিয়া গেল, ওদিকে শাণ্টিং লাইন হইতে একখানা গাড়ী কুলিরা ঠেলিয়া প্রায় পয়েন্টের কাছে লইয়া গিয়াছে।

নিতাই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল; ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়টি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র নিপুণতার সহিত গাছতলায় সংসার পাতিয়া ফেলিল; উনান পাতিয়া তাহাতে আগুন দিল, একটি মেয়ে জল আনিল, একজন তরকারি কুটিতে বসিল, প্রৌঢ় উনানের সম্মুখে বসিয়া মাটির হাঁড়ি ধুইয়া ফেলিয়া চড়াইয়া দিল কিছুক্ষণের মধ্যে। পুরুষেরা তেল মাখিতে

বসিল; মেয়েদের স্নান তখন হইয়া গিয়াছে, সকলেরই ভিজা খোলা চুল পিঠে পড়িয়া আছে, প্রান্তে একটি করিয়া। গেরো বাঁধা। সেখানে ধারে কাছে কেহ নাই কেবল সেই কৃশতনু গৌরাঙ্গী ক্ষুরধার মেয়েটি। নিতাইকে ডাকিয়া প্রৌঢ়া তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স বাবা, ব'স।

পুরুষ কয়জন প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তাই তো, আপনি দাঁড়িয়ে কেন গো? বসুন! উনানে একটা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া প্রৌঢ়া বলিল—খাসা গলা আমার বাবার। তারপর মুখের দিকে চাহিয়া স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—এই 'নাইনেই' থাকবে বাবা? না, কাজকম্মও করবে—এও করবে?

–এই 'নাইনেই' থাকবারই তো ইচ্ছে; তা দেখি।

বিয়ে-টিয়ে করেছ? ঘরে কে আছে?

—বিয়ে! নিতাই হাসিল, হাসিয়া বলিল–ঘরে মা আছে, বুন আছে; মা বুনের কাছেই থাকে। আমি একা।

—তবে আমাদের দলে এস না কেনে?

নিতাই কিন্তু এ কথার উত্তর চট করিয়া দিতে পারিল না। সম্মতি দিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল রাজাকে—মনে পড়িয়া গেল ভূঁইচাঁপার শ্যামল সরস ডাটাটির মত কোমল শ্রীময়ী ভক্ত মেয়েটি —ঠাকুরঝিকে। সে চুপ করিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আবার প্রশ্ন করিল—কি বলছ বাবা?

—বাবা ভাবছে তোমার মনের মানুষের কথা। সঙ্গে সঙ্গে খিল-খিল হাসি। নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া সদ্যঃস্নাতা বসন্ত। মেয়েটা স্নান করিয়া চুল গা মোছে নাই, চুল পর্যন্ত ঝাড়ে নাই। ভিজা চুল হইতে তখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিতাই অবাক হইয়া গেল।

—বউ কেমন হে? বশীকরণের লতায় ছাঁদে ছাঁদে বেঁধেছে বুঝি!

নিতাই এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল—জ্বর গায়ে তুমি চান ক'রে এলে?

—ধুয়ে দিয়ে এলাম। চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর কিনা! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে তাহার সুপরিস্ফুট সর্বাঙ্গও হাসিয়া উঠিল। নিতাইয়ের লজ্জা হইল।

প্রৌঢ়া বলিল—তাই তো বটে! চান করে এলি? ছাড়, ছাড়, ভিজে কাপড় ছাড় বসন। তুই কোন দিন মরবি ওই ক'রে।

বিচিত্র হাসিয়া বসন বলিল—ফেলে দিও টেনে। তা ব'লে চান না ক'রে থাকতে পারি না। চান না করলে—মা-গো! গায়ে যা বাস ছাড়ে।

একটি তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল—চুল ফেরে না লতায় পাতায়, তা বল!

বসন হাত দিয়া মাথার চুলে চাপ দিতে দিতে বলিল-আমার তো আর কেশ দিয়ে নাগরের পা মুছতে হয় না, তা চুল না ফিরিয়ে করব কি?

বহুপরিচর্যাই ইহাদের ব্যবসা, কিন্তু নারীচিত্তের স্বভাবধর্মে একটি বিশেষ অবলম্বন ভিন্নও ইহারাও থাকিতে পারে না; সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেয়েটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে। সেখানে মান-অভিমান আছে, সাধ্য-সাধনাও আছে। কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না। কেহ পতঙ্গের মত তার, শাণিত দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিলে মেয়েটার ক্ষুরধারে তাহার কেবল পক্ষচ্ছেদই নয়, মর্মচ্ছেদও হইয়া যায়। তাই বসন্ত সঙ্গিনীকে এমন কথা বলিল। ফলে ঝগড়া একটা বাঁধিয়া উঠিবার কথা; আহত মেয়েটি কণা তুলিয়াও উঠিয়াছিল; কিন্তু দলের নেত্রী প্রৌঢ়া মাঝখানে পড়িয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিল। হাসিয়া বলিল-ও বসনা, শোন শোন, দেখ আমাদের ওস্তাদকে পছন্দ হয় কিনা!

তাহার কথা শেষ হইল না, বসন্তের উচ্চ উচ্ছল হাসিতে ঢাকা পড়ির গেয়। নিতাই ঘামিয়া উঠিল। প্রৌঢ়া ধমক দিয়া বলিল—মরণ! এত হাসছিস কেনে?

হাসি থামাইয়া বসন্ত বলিল—মরণ তোমার নয়, মরণ আমার!

— কেন?

—মা গো! ও যে বড় কালো; মা–গ!

সকলে নির্বাক হইয়া রহিল।

বসন্ত আবার বলিল—কালো অঙ্গের পরশ লেগে আমি সুদ্ধ কালো হয়ে যাব মাসী। মুখ বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল, তারপর আবার বলিল—যাই, শুকনো কাপড় পরে আসি। 'নিমুনি হ'লে কে করবে বাবা! সে হেলিয়া দুলিয়া চলিয় গেল।

একটি মেয়ে বলিল—মরণ তোমার;.গলায় দড়ি।

প্রৌঢ়া ধমক দিল—চুপ কর বাছা। কোঁদল বাঁধাস নে। মেয়েটি একেবারে চুপ করিল না, আপন মনেই মৃদুস্বরে গজগজ করিতে আরম্ভ করিল। নিতাই আপন মনে মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। হাসিতেছিল ওই গৌরগরবিনীর রকম সকম দেখিয়া। মেয়েটা ভাবে তাহার ওই সোনার মত বরণের ছটায় দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে। সবাই উহাকে পাইবার জন্য লালায়িত। হায়! হায়! হায়!

প্রৌঢ়া আবার কথাটা পাড়িল—বলি হাঁ গো, ও ছেলে!

—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। ছেলেই বলবো তোমাকে। অন্য লোক বলে—ওস্তাদ। রাগ করবে না তো বাবা?

—না-না। রাগ করব কেনে! মাসীর এ কথাটি তাহার বড় ভাল লাগিল।

—কি বলছ? এই 'নাইনেই' যখন থাকবে, তখন এস না আমাদের সঙ্গে।

—না। নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। নিতাই উঠিল—তা হলে আমি যাই এখন; আমাকেও রান্নাবান্না করতে হবে।

—ওহে কয়লা-মাণিক! বসন্তর কণ্ঠস্বর। নিতাই ফিরিয়া চাহিল। ইতিমধ্যেই বসন্ত বিন্যাস করিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে—বিন্যাস করিবার মত চুলও বটে মেয়েটার। ঘন একপিঠ দীর্ঘ কালো চুল! কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে ধপধপে লাল নক্সিপাড় মিলের শাড়ী।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম দিয়েছি ভাই কয়লা-মাণিক। কা্লো মাণিক কি বলতে পারি? সে হাতজোড় করিয়া কালো-মাণিককে প্রণাম করিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—ভাল ভাল! তা বেশ তো! ময়লা-মাণিক বলতেও পার।

—সে ওই কয়লাতেই আছে। বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নিতাই বলিল-তা আছে কিন্তু ময়ে—ময়ে—মিল নাই। ওতে কথাটা মিষ্টি হয়। গানের কান আছে তাই বললাম। কালা হলে বলতাম না। বল কি বলছ?

—আমার একটি কাজ করে দেবে?

—কি, বল?

—চার পয়সার মাছ এনে দেবে? আমার আবার মাছ নইলে রোচে না। দেবে এনে?

—দাও। নিতাই হাত পাতিল। কিন্তু বসন্ত পয়সা দিতে হাত বাড়াইতেই সে আপনার হাতখনি অল্প সরাইয়া লইল, বলিল—আলগোছে ভাই, আলগোছে।

—কেনে? চান করতে হবে নাকি? মেয়েটার ঠোঁটের কোণ দুইটা যেন গুণ দেওয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—কয়লার ময়ল লাগবে ভাই, তোমার রাঙা হাতে।

বসন্তের হাতের পয়সা আপনি খসিয়া নিতাইয়ের হাতে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে ধনুকের গুণ যেন ছিঁড়িয়া গেল। তাহর অধরপ্রান্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই সে

কম্পন তাহার বাঁকা হাসিতে রূপান্তর গ্রহণ করিল। দেখিয়া নিতাইয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। মনে হইল মেয়েটা যেন গল্পের সেই মায়াবিনী। প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ হইলে সে বেজী হয়; বিড়াল হইয়া বেজীরূপিণী তাহাকে আক্রমণ করিলে বেজী হইতে সে হয় বাঘিনী। কান্না তাহার বাঁকা হাসিতে পাল্টাইয়া গেল মুহূর্তে। হাসিয়া সে বলিল—সেই জন্যে আলগোছে দিলাম।

জেলে-পাড়ার পথে নিতাইয়ের মনে গান জাগিয়া উঠিল। নূতন গান। মনে মনে ভাবিয়া সে ওই মেয়েটার একটা তুলনা পাইয়াছে। শিমুলফুল। গুন-গুন করিয়া সে কলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিল—আহা!

‘আহ!—রাঙাবরণ শিমুলফুলের বাহার শুধু সার।’

কবি – ১০

সন্ধ্যায় রাজা বেশ সমারোহ করিয়া আসর পাতিল। রাজা পরিশ্রম করিল সেনাপতির মত; বিপ্রপদ বসিয়া ছিল রাজা সাজিয়া। বেচার বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে পারে না, চীৎকারেই সে সোরগোল তুলিয়া ফেলিল। অবশ্য কাজও অনেকটা হইল। মুদী, কয়লাওয়ালা বিপ্রপদর ব্যঙ্গশ্লেষের ভয়ে শতরঞ্চি বাহির করিয়া দিল, বণিক মাতুল তাহার পেট্রোম্যাক্স আলোটা আনিয়া নিজেই তেল পুরিয়া জালিয়া দিল। লোকজনও মন্দ কেন—ভালই হইল। সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিরা কেহ না আসিলেও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই হংসশ্রোতার মত যথাসাধ্য সাজিয়া-গুজিয়া জাঁকিয়া বসিল, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেবারে ভিড় জমাইয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মাঝখানে আসর পড়িল ঝুমুর নাচের; নিতাই প্রত্যাশা করিয়াছিল উহাদের দলের কবিয়ালের সঙ্গে একহাত লড়িবে অর্থাৎ গাওনার পাল্লা দিবে। অনেক ঝুমুর দলের সঙ্গে এক একজন নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে –স্বতন্ত্রভাবে গাওনা করিবার যোগ্যতা না-থাকা হেতু ওই ঝুমুর দলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা। পথে কোন গ্রামে বা মেলার এমনি ধারার ঝুমুর দলের দেখা পাইলে পাল্লা জুড়িয়া দেয়। মেলায় ঝুমুরের সহিত কবির আসর যোগ হইলে আসরও জোরালো হয়। এ দলেরও এমন একজন কবিয়াল আছে। কিন্তু সে আজ দলের সঙ্গে আসে নাই। কাজের জন্য পিছনে পড়িয়া আছে। দলটার গন্তব্যস্থান আলেপুরের মেলা। কথা আছে, দুই দিন পরে সে সেইখানে গিয়া জুটিবে। নহিলে নিতাই একটা আসর পাইত। কবিয়ালের অভাবে আসর বসিল শুধু নাচগানের। ঢোল, ডুগি তবলা, হারমোনিয়ম, একটা বেহালা লইয়া ঝুমুর দলের পুরুষের আসর পাতিয়া বসিল। তাহদের তেল-চপচপে চুলে বাহারের টেরী, গায়ে রংচঙে ছিটের ময়লা জামা। মেয়েদের

গায়ে গিলটির গয়না—কান, ঝাপ্টা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশানের বডিস, রঙিন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকৃষ্ট ভঙ্গি। ঠোঁটে-গালে লালরঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নো'র প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লাল রঙের ছোপ। দর্শকদের মনে কিন্তু ইহাতেই চমক লাগিতেছে। মেয়েগুলির মধ্যে বসন্তই ঝলমল করিতেছে, মেয়েটার সত্যই রূপ আছে। তার সঙ্গে রুচিও আছে। মেয়েটা সাজিয়াছে বড় ভাল। কবিয়াল নিতাই ফরসা কাপড় জামার উপর চাদরখানি গলায় দিয়া ঝুমুর দলেরই গা ঘেঁষিয়া বসিল। মুখে তাহার গৌরবের হাসি। এ আসরে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি কারণ সে কবিয়াল!

গাওনা আরম্ভ হইল। খেমটার অনুকরণে নাচ ও গান। মেয়েরা প্রথমে গান ধরে, মেয়েদের পরে দোয়ারের সেই গানেরই পুনরাবৃত্তি করে, মেয়েরা তখন নাচে। একালে খেমটা নাচের প্রসার দেখিয়া তাহাদের ঝুমুর নাচ ছাড়িয়া এই ধরিয়াছে। কিছুটা অবশ্য ঝুমুরের রঙ রাখিয়াছে। সেটুকু সবই অশ্লীলতা।

প্রৌঢ়া মধ্যস্থলে পানের বাটা লইয়া বসিয়াছিল, সে নিতাইকে বলিল—বাবা, তুমিও ধর।

নিতাই হাসিল। কিন্তু দোয়রদের সঙ্গে সে গান ধরিল না। প্রথম গানখানা শেষ হইতেই মেয়েরা বিশ্রামের জন্য বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠিয়া পড়িল। কবিয়ালের ভঙ্গিতে চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি একটি নিবেদন পাই।

চারিদিকে নানা কলরব উঠিয়া পড়িল।

—সঙ নাকি?

—ব'স ব'স!

—এই নিতাই!

একজন রসিক বলিয়া উঠিল—গোঁফ কামিয়ে এস্! গোঁফ কামিয়ে এস!

অকস্মাৎ সকল কলরবকে ছাপাইয়া রাজা হুঙ্কর দিয়া উঠিল—চোপ সব, চোপ।

বিপ্রপদও একটি ধমক ঝাড়িল—অ্যা—ও!

সকলে চুপ করিয়া গেল। নিতাই সুযোগ পাইয়া বলিল—আমি একপদ গাইব আপনাদের কাছে।

—লাগাও ওস্তাদ, লাগাও। রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই গান ধরিয়া দিল। বা হাতটি গালে দিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে রাখিয়া অল্প ঝুঁকিয়া আরম্ভ করিল—

"আহা রাঙাবরণ শিমুলফুলের বাহার শুধু সার–
ওগো সখি দেখে যা বাহার।"

কলিট প্রথম দফা গাহিয়া ফেরতার সময় সে হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া বলিল—এই–এই,—এই বাজাও তবলাদার –বলিয়াই সে আবার ধরিল—

"শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা, গাছের অঙ্গে কাটা খরধার।
মন-ভোমরা যাস্ নে পাশে তার। "

নিতাইয়ের কণ্ঠস্বরখানি মধুর এবং ভরাট, এক মুহূর্তে মানুষের মন দখল করিয়া লয়। লইলও তাই। লোকের আপত্তি গ-য়ে গোমাতার মত গানে, কিন্তু এখানে তাহার আভাস না পাইয়া লোকে জমিয়া বসিল।

রাজা বাহবা দিয়া উঠিল—বাহা রে ওস্তাদ, বাহা রে!

বিপ্রপদও দিল—বহুত আচ্ছা।

বণিক মাতুল বলিল—ভাল, ভাল।

লোকেও বাহবা দিল।

নিতাই উৎসাহে মৃদু মৃদু নাচিতে আরম্ভ করিল। একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, মুখে তাহার মৃদু হাসি। রাজার পিছনেই রাজার স্ত্রী, তাহার পাশে ঠাকুরঝি। শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুহূর্তের জন্য নিতাই গান ভুলিয়া গেল, ঠাকুরঝিকে অবহেলা দেখাইলেও ঠাকুরঝি তাহাকে অবহেলা করে নাই। তাহার গৌরবের গোপন অংশ লইতে সে আসিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সে গানের খেই হারাইয়া ফেলিল।

ঝুমুর দলের ঢুলীটা সুযোগ পাইয়া ঢোলে কাঠি মারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ এই কাটল। অর্থাৎ নিতাইয়ের তাল কাটিয়া গেল। মুহূর্তে নিতাই সজাগ হইয়া গান ছাড়িয়া দিয়া হাতে তালি দিয়া বলিল—গান নয়, এবার ছড়া।

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ বলিয়া তালি মারিতে মারিতে পুনরায় ধরতার মুখে ধরিয়া দিল—

"ফল ধরে না ধরে তুলো, চালের বদলে চুলো—"

সঙ্গে সঙ্গে সে নাচিতে শুরু করিল। পরের কলি ভাবিবার এই অবকাশ। নাচিতে নাচিতে সে ফিরিয়া চাহিল—আসরের দিকে। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। কেবল বসন্তর চোখে খেলিতেছে ছুরির ধার। নিতাই তাহার দিকে চাহিয়াই ছড়া কাটিল—

"ফুলের দরে তা বিকালো, মালা হ'লো গলার।"

নিতাইয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই বসন্ত যেন ক্ষেপিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়াকে বলিল—আমি চললাম মাসী। শিমুল ফুলের অর্থ সে বুঝিয়াছে।

—কোথায়?

—বাসায়, ঘুমুতে।

—ঘুমুতে!

—হ্যাঁ।

সূচিপত্র

—তুই কি ক্ষেপেছিল নাকি? ব'স।

—না। এ আসরে আমি গান গাই না। যে আসরে বাঁদর নাচে সে আসরে আমি নাচি না।

বেশ উচ্চকণ্ঠেই কথা হইতেছিল। নিতাই মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। দর্শকের অধিকাংশই চীৎকার করিয়া উঠিল—এই, এই, তুমি থাম।

চটিয়া উঠিল রাজু, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেয়া?

বসন্ত কোনও উত্তরই দিল না, কেবল একবার ঘাড় বাঁকাইয়া, নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে একটা চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। চারিদিকে একটা রোল উঠিল, কেহ নিতাইয়ের উপর চটিয়া চীৎকার শুরু করিল, কেহ অর্থের চুক্তিতে আবদ্ধ ঘৃণিত পথচারিণী মেয়েটার দুবিনীত স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া আস্ফালন তুলিল। কিন্তু মেয়েটা কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ করিল না; সম্মুখের মানুষটিকে বলিল—পথ দাও তো ভাই।

সে পথ ছাড়িয়া দিত কি দিত না কে জানে, কিন্তু সে কিছু করিবার পূর্বেই পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইল নিতাই। হাত জোড় করিয়া সে হাসিমুখে বিনয় করিয়া বলিল—আমার দোষ হয়েছে। যেও না তুমি, ব'স। আমার মাথা খাও!

বসন্ত কথার উত্তর দিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আসরে বসিল। গোলমাল একটু স্তিমিত হইতেই সে উঠিয়া গান ধরিল। গানখানি বাছাই করা গান। ভদ্রজনের আসরে যেখানে খেউর গাওয়া চলে না সেইখানে গাওয়ার জন্য তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত আছে। গানখানি বসন্তর বড় প্রিয়; নাচের সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে। বাছিয়া তাই সে এইখানাই ধরিল—

ঝুম ঝুমঝুম বাজে লো নাগরী;
নূপুর চরণে মোর। ও সে থামিতে না চায় গো।

তোরা আয় গো!
জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখি গাগরী।
রজনী হইল ভোর;–আয় সখি আয় গো; নিশি যে ফুলায় গো!
নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো!
ঝুম ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম ঝুমাঝুম!

ঝুম ঝুমাঝুমের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল নাচ। আসরটা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন কি ক্রুদ্ধ রাজা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটার রূপ আছে, কণ্ঠও আছে। ছুরির ধারের মত উচ্চ সু-কণ্ঠ। তাহার উপর মেয়েটা যেন গান ও নাচের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দ্রুত হইতে দ্রুততর তানে লয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শেষ করিয়া মুহূর্তে একটি পূর্ণচ্ছেদের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এতক্ষণে আসরে রব উঠিল—বাহবার রব। চারিদিক হইতে 'পেলা' পড়িতে আরম্ভ হইল—পয়সা, আনি, দোয়ানি, সিকি, দুইটি আধুলি; দোকানী ঘনশ্যাম দত্ত একটা টাকাই ছুঁড়িয়া দিল। মেয়েটার সেদিকে লক্ষ্য করিবার বোধ হয় অবসর ছিল না, তাহার সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়াছে, বুকখানা হাপরের মত হাপাইতেছে; গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ়া নিজে উঠিয়া পেলাগুলি কুড়াইয়া হইল।

চারিদিক হইতে রব উঠিল—আর একখানা, আর একখানা!

নিতাই বসন্তর দিকে চাহিল, চোখে চোখে মিলিতেই নমস্কার করিয়া সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

প্রৌঢ়া বসন্তর গায়ে হাত দিয়া বলিল—ওঠ,! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিল,—এ কি বসন, জ্বর যে আজ অনেকটা হয়েছে!

হাসিয়া বসন বলিল—একটুকুন মদ থাকে ত দাও।

সামান্য আড়াল দিয়া খানিকটা নির্জলা মদ গিলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রথমবারের মত গতি বা আবেগ কিছুঁই আনিতে পারিল না, সে হাঁপাইতেছিল, গতির মধ্যে ক্লান্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। গান ধরিয়াও গাহিতে পারিল না; দোহারেরা গাহিল। তেহাই পড়িতেই নাচ শেষ করিয়া সে শিথিল ক্লান্ত পদক্ষেপে আসর হইতে বাহির হুইয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিল না, যেন তাহদের দাবি ফুরাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর দেনা-পাওনার ওজন-দাঁড়িতে তাহার দুইখানা গান ও নাচের ভার তাহদের পেলার ভারকে তুচ্ছ করিয়া পাথরের ভারে মাটির বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পথের ধারে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহার আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া নিতাইকে বলিল—দেখ তো বাবা! আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে!

নিতাইও বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া সে বসন্তর সন্ধান করিল। মনে মনে এই মেয়েটির কাছে সে হার মানিয়াছে। ‘শিমুল’ ফুল বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে—অন্যায় নয়, অপরাধ। নূতন গানের কলি তাহার মনের মধ্যে গুনগুনানি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বসন্ত গেল কোথায়? ঝুমুর দলের বাসা তো এই বটগাছতলা। গাছতলাটায় একখানা চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া আছে একটা পুরুষ—দলের মধ্যে শক্তিশালী পুরুষটা। মহিষের মত প্রচণ্ড আকার, তেমনি কালো, রাঙা গোল চোখ; বোবার মত নীরব; তৃষ্ণার্ত মহিষ যেমন করিয়া জল খায়—তেমনি করিয়া মদ খায়, সারাদিন শুইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর হইতে পড়ে তাহার জাগরণের পালা। আগুন জালিয়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া লোকটা জিনিসপত্র আগলাইতেছে। সেখানে নিতাই দেখিল বসন্ত নাই। সে জ্যোৎস্নালোকিত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। এ কি! তাহার বাসার দরজায় কয়জন লোক দাঁড়াইয়া কেন? সে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

—আমরা।

নিতাই চিনিল, ব্যাপরী কাসেদ সেখের ছেলে—নয়ান ওরফে ননাইয়ের দল। সে প্রশ্ন করিল—কি? এখানে কি?

—মেয়েট তোর বাসায় এসে ঢুকেছে।

—এসেছে তা'—তোমরা দাঁড়িয়ে কেনে?

দলকে দল অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

নিতাই বলিল—যাও তোমরা এখান থেকে। নইলে হাঙ্গামা হবে। আমি রাজাকে ডাকব, কনেস্টবল আছে—তাকে ডাকব। নয়ান সেথ নিতাইকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু রাজাকে গ্রাহ্য করে; সে তবুও বলিল—শোন্ না, তোকে বকশিশ করব। নেতাই!

নিতাই একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া বাড়ী ঢুকিয়। দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু কোথায় বসন্ত? কোথাও তো নাই। কিন্তু ঘরের দরজার শিকল খোলা। দরজায় হাত দিয়া সে দেখিল—হ্যাঁ, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

নিতাই ডাকিল-ওহে ভাই, শুনছ। আমি–আমি।

—কে?

—তোমার 'কয়লা-মাণিক'।

—কে! ওস্তাদ?

—ওস্তাদ কি ফোস্তাদ যা বল তুমি।

এবার দরজাটা খুলিয়া গেল। নিতাই ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—বসন্ত ততক্ষণে আবার শুইয়া পড়িয়াছে। তাহারই বিছানাট পাড়িয়া দিব্য আরাম করিয়া শুইয়াছে। বসন্তই বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

—বাইরের দরজা বন্ধ আছে।

—পাচিল টপকে ঢুকবে ভাই—বন্ধ কর। বসন্ত ক্লান্ত অথচ বিচিত্র হাসি হাসিল। নিতাই তাহার কপালে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিল—এ কি? এ যে অনেকটা জ্বর!

—মাথাটা একটু টিপে দেবে?

হাসির নিতাই মাথা টিপিতে বসিল। বসন্ত হাসিয়া বলিল–না, তুমি কোস্তাদ নও, ভাল ওস্তাদ—গানখানি কিন্তুক খাসা। তোমার বাঁধা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও গানটা বাতিল করে দিলাম!

—কেনে? চোখ বন্ধ করিয়াই বসন্ত প্রশ্ন করিল।

—ওটা আমার ভুল হয়েছিল।

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

—আবার নতুন গান বাঁধছি। সে গুন গুন করিয়া আরম্ভ করিল—

"করিল কে ভুল, হ্যায় রে!
মন-মাতানো বাসে ভ;রে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

বসন্তর মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিল—তারপর?

—তারপর এখনও হয় নাই।

–গানটি আমাকে নিকে দিয়ে।

—আমার গান তুমি নিকে নেবে? গাইবে?

–হ্যাঁ।

জানালার দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—আজই শেষ করব –কে? কে?

জানালার পাশ হইতে কে সরিয়া যাইতেছে! বসন্ত হাসিয়া বলিল—আবার কে! যত সব নরুকেদের দল।

নিতাই কিন্তু ওই কথা মানিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। সে যাহা দেখিয়াছে সে-ই জানে। হ্যাঁ—ওই যে দুধবরণ কোমল জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেল লাইনের দিকে চলিয়াছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মত চলিয়াছে। মাথায় কেবল স্বর্ণবিন্দুটি নাই। ঠাকুরঝি!

কবি – ১১

জ্যোৎস্নার রহস্যময় শুভ্রতার মধ্যে দ্রুত চলন্ত কাশফুলটি যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। নিতাই কিন্তু স্তব্ধ হইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। চোখে তাহার অর্থহীন দৃষ্টি, মনের চিন্তা অসম্বন্ধ অস্পষ্ট, বুকের মধ্যে শারীরিক অনুভূতিতে কেবল একটা গভীর উদ্বেগ! –সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল জ্যোৎস্নময়তার মধ্যে ঠাকুরঝি হারাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সবই যেন হারাইয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া মুখরা স্বৈরিণী অসুস্থ দেহেও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার যত জটিল, তত কুটিল। পথচারিণী নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা! সে অভিজ্ঞতায় নিশাচর হিংস্র জানোয়ারের মত মানুষই সংসারে ষোল আনার মধ্যে পনেরো আনা তিন পয়সা; সেই অভিজ্ঞতায় শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বসন্ত উঠিয়া বসিল। সে ভাবিল, যে দলটি বাড়ীর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারাই বোধহয় দলপুষ্ট হইয়া নিঃশব্দ লোলুপতায় নখর দন্ত মেলিয়া বাড়ীর চারপাশ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। আক্রমণের চেষ্ট্র করিতেছে। উৎকণ্ঠিত হইয়া চাপ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল—কি?

নিতাই, তবুও উত্তর দিল না। সে যেমন স্তব্ধ নিস্পদ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরঝির রাগ তো সে জানে! খানিকট গিয়াই সে দাঁড়ায়, পিছন ফিরিয়া তাকায়, ইঙ্গিতে বলে—আমায় ডাক, ডাকিলেই ফিরিব। আজ আর কিন্তু দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল; এই রাত্রে একাই সে চলিয়া গেল। মধ্যরাত্রির নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যেও একটা ভয় আছে। সে ভয় সে করিল না।

বসন্ত এবার উঠিয়া আসিয়া নিতাইয়ের পাশে দাঁড়াইল, জ্বরোত্তপ্ত হাতে নিতাইয়ের হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল–কই?

এতক্ষণে সচকিত হইয়া নিতাই ফিরিয়া চাহিল। রূপে গুণে ক্ষুরধার স্বৈরিণীর কৃশ মুখে, ডাগর দীপ্ত চোখে অপরিমেয় ক্লান্তি–গভীর উৎকণ্ঠা। নিতাই সে মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল না হইয়া পারিল না। সস্নেহে হাসিয়া সে বসন্তর কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—এত জ্বর, তুমি উঠে এলে কেনে? চল শোবে চল। উঃ! ধান দিলে যেন খই হবে, এত তাপ!

–নচ্ছারগুলো ঘুরছে চারিদিকে? ছুরি ছোরা নিয়ে জুটেছে?

–নচ্ছারগুলো! নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল। বসন্তর ভাবনার পথে যাহারা বিচরণ করিতেছিল, তাহদের সে কল্পনা করিতেই পারিল না।

এবার বসন্তর ভ্রু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—থাপ হইতে ক্ষুরের ধার উঁকি মারিল, সে প্রশ্ন করিল—তবে? কি? কে গেল? কি দেখছ তুমি?

চকিতেই নিতাই এবার বসন্তর কল্পনার কথা বুঝিল, হাসিয়া সে বলিল—না, তারা নয়। ভয় নাই তোমার। এস, শোবে এস। সে তাহাকে আকর্ষণ করিল।

—কে যে গেল! কাকে দেখছিলে? কে উঁকি মেরে গেল?

—কে চিনতে পারলাম না।

—চিনতে পারলে না?

–না।

—তবে এমন ক’রে দাঁড়িয়ে আছ যে? যেন কত সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে তোমার?

বসন্তর শাণিত দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেও যেন জ্বলিতেছিল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না, শুষ্ক হাসিমুখে সে বসন্তর দিকে চাহিয়াই রহিল।

বসন্ত অকস্মাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণ দ্রুত হাসি। হাসিয়া বলিল-আ মরণ আমার! চোখের মাথা খাই আমি! যে উঁকি মারলে তার মাথায় যে ঘোমটা ছিল! ও—! আমাকে দেখে—

আবার সেই খিলখিল হাসি।

নিতাইয়ের পা হইতে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। বসন্ত হাসিতে হাসিতে ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিতাই ডাকিল—বসন! ও ভাই! বসন!

দুয়ারের বাহির হইতে উত্তর আসিল—বসন নয় হে, কেয়াফুল, কেয়াফুল! টেনো না, করাত-কাঁটার ধারে সর্বাঙ্গে ছ'ড়ে-ছিঁড়ে যাবে!

নিতাই তবুও বাহিরে আসিল।

স্বৈরিণী তখন কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

এ অবস্থায় নিতাই ডাকিতে গিয়াও পারিল না, লজ্জাবোধ হইল। আপনার দ্বারটিতেই সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওদিকে স্টেশনের ধারে ঝুমুরের আসরে গান হইতেছে। আলোর ছটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া এখানে ওখানে পড়িয়াছে। এদিকটা প্রায় জনহীন স্তব্ধ, পশ্চিম আকাশে চাঁদ অস্তে চলিয়াছে, পূর্বদিকের আকাশে অন্ধকার ঘন হইয়া উঠতেছে। স্বৈরিণী মেয়েটার কিন্তু কোন লজ্জা নাই; খিলখিল হাসির মধ্যে কথা শেষ করিয়া—ঘন অন্ধকারে কাসেদের ছেলে নয়ানের সঙ্গে ওই পূর্বদিকের গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই আকাশের দিকে তাকাইয়া একা দাঁড়াইয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে আবার তাহার মনে নূতন গান গুনগুন করিয়া উঠিল। ভগবান মানুষের মন লইয়া কি মজার খেলাই না খেলেন! এক ঘটে, মানুষ তাঁহার ছলনায় অন্য

দেখে। ঠাকুরঝি বসন্তকে দেখিয়া চলিয়া গেল, বসন্ত ঠাকুরঝিকে দেখিয়া চলিয়া গেল। সে গুনগুন করিয়া তাই লইয়াহ গান বাঁধিতে বসিল –

“বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন!”

ঘটনার মধ্যে সে যেন নিয়তির খেলা বা দৈবের অদ্ভুত পরিহাস দেখিতে পাইয়াছে আজ। ঠিক তাহার অচ্ছুৎ জন্মের মতই এ পরিহাস নিষ্ঠুর। সে তাই গানের মধ্যে হরিকে স্মরণ না করিয়া পারিল না।

ভোরবেলাতে রাজার হাক-ডাকে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ঘরে আসিয়া গান বাঁধিতে বাঁধিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চেতনা হইবামাত্র সেই অসমাপ্ত গানের কলিটাই প্রথমে গুঞ্জন করিয়া উঠিল তাহার মনে—

”বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন,
কুটিল কৌতুকে তুমি হয়কে কর নয়—অঘটন কর সংঘটন।”

রাজা হাঁকডাক শুরু করিয়াছে। সে হাঁকডাকের উচ্ছ্বাসটা যেন অতিরিক্ত। নিতাইয়ের মনে হইল হয়তো নূতন কোন অভিনন্দন লইয়া রাজন তাহার দুয়ারে আসিয়াছে—ধৈর্য তাহার আর ধরিতেছে না। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিমুখে সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজা—তাহার পিছনে ঝুমুরের দলের প্রৌঢ়া। রাজা সটান ঘরের ভিতরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকৌতুকে কাহাকে যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিল।
নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?
—কাঁহা? কাঁহা হ্যায় ওস্তাদিন?

—ওস্তাদিন?

হা-হা করিয়া হাসিয়া রাজা বলিল—সব ফাঁস হো গয়া ওস্তাদ, সব ফাস হো গয়া। কাল রাতমে—সে হা-হা করিয়াই সারা হইল। কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

নিতাই তবুও কথাটা বুঝিতে পারিল না। বুঝাইয়া দিল প্রৌঢ়া। সে এতক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—আ মরণ! ও বসন্ত! বেরিয়ে আয় না লো, এই ট্রেনেই যাব যে আমরা!

নিতাই বলিয়—সে তো এখানে নাই!

–নাই! সে কি? সে আসর থেকে বেরিয়ে এল, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গে। আমি বলেও দিলাম তোমাকে। তারপর আমি খোঁজও করলাম; শুনলাম, তোমার ঘরেই—

নিতাই বলিল—হ্যাঁ, কজন লোক বিরক্ত করছিল ব'লে আমার ঘরেই এসেছিল। আমি এসে দেখলাম শুয়ে আছে, গায়ে অনেকটা জ্বর। কিন্তু খানিক পরেই বেরিয়ে সেই লোকের সঙ্গেই চলে গেল।

প্রৌঢ়া চিন্তিত হইয়া উঠিল; রাজার কৌতুক-হাস্য স্তব্ধ হইয়া গেল!

নিতাই বলিল—কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে গিয়েছে। ওই বোঁপ মত বটগাছটার তলাতেই যেন কথা কইছিল। আসুন দেখি।

তাহারা আগাইয়া গেল।

সেখানেই তাহাকে পাওয়া গেল। সে হতচেতনের মত অসম্বৃত দেহে পড়িয়া ছিল।

বিপুলপরিধি ছায়ানিবিড় বটগাছটির তলদেশটা ছায়ান্ধকারের জন্য তৃণহীন পরিষ্কার; সেইখানেই মাটির উপর বসন্ত তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। কেশের রাশ বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি ভন ভন করিয়া

উড়িতেছে; পাশেই পড়িয়া আছে একটা খালি বোতল, একটা উচ্ছিষ্ট পাতা। কাছে যাইতেই দেশী মদের তীব্র গন্ধ সকলের নাকে আসিয়া ঢুকিল।

প্রৌঢ়া বলিল—মরণ! এই করেই মরবে হারামজাদী! বসনা, ও বসন! রাজা হাসিয়া বলিল—বহুত মাতোয়ারা হেগেয়া। নিতাই দ্রুত সেখান. হইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে লইয়া। দুধ না দিয়া কাঁচা চা, তাহাতে একটু লেবুর রস। কাঁচা চায়ে নাকি মদেয় নেশা ছাড়ে। মহাদেব কবিয়ালকে সে কাঁচা চা খাইতে দেখিয়াছে। বসন্ত তখন উঠিয়া বসিয়াও ঢুলিতেছে অথবা টলিতেছে। প্রৌঢ়া বলিতেছে—এ আমি কি করি বল দেখি?

—এই চা-টা খাইয়ে দিন, এখুনি ছেড়ে যাবে নেশা।

চা খাইয়া সত্যই বসন্ত খানিকট সুস্থ হইল। এতক্ষণে সে রাঙা ডাগর চোখ মেলিয়া চাহিল নিতাইয়ের দিকে।

প্রৌঢ়া তাড়া দিয়া বলিল—চল এইবার।

নিতাই বলিল—চান করিয়ে দিলে ভাল করতেন। সোরও হত, আর সর্বাঙ্গে ধুলো লেগেছে—

তাহার কথা ঢাকা পড়িয়া গেল বসন্তর মত্ত কণ্ঠের খিলখিল হাসিতে। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—মুছিয়ে দাও না নাগর, দেখি কেমন দরদ!

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল—হাসিয়া কাঁধের গামছাখানি লইয়া সযত্নে বসন্তর সর্বাঙ্গের ধূলা মুছাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা, নমস্কার তা হ’লে।

প্রৌঢ়া তাহাকে ডাকিল—বাবা!

নিতাই ফিরিল।

—আমার কথাটার কি করলে বাবা? দলে আসবার কথা?

নিতাই কিছু বলিবার পূর্বেই নেশায় বিভোর মেয়েটা আবার আরম্ভ করিয়া দিল সেই হাসি। সে হাসি তাহার যেন আর থামিবে না।

বিরক্ত হইয় প্রৌঢ়া বলিল—মরণ! কালামুখে এমন সর্বনেশে হাসি কেনে? বুক ফেটে মরবি যে!

সেই হাসির মধ্যেই বসন্ত কোনরূপে বলিল—ওলো মাসী লো—কয়লা-মাণিকেরও মনের মানুষ আছে লো! কাল রাতে—হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি— .

রাজা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়েটাকে একটা ধমক দিয়া উঠিল—কেঁও এইসা ফ্যাক্ ফ্যাক্ করতা হ্যায়?

বসন্তর চোখ দুইটা জলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

ওদিকে স্টেশনে ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল; স্টেশন-মাস্টার নিজে ঘণ্টা দিতে দিতে হাঁকিতেছিল—রাজা! এই রাজা!

রাজা ছুটিল, নতুবা একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব ছিল না। নিতাই হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনার বাসার দিকে ফিরিল।

প্রৌঢ়া এবার কঠিন-স্বরে বলিল—বসন! আসবি, না এইখানে মাতলামি করবি?

বসন্ত ক্লান্তিতে শিথিল পদে চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু হাসি তাহার তখনও থামে নাই। সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইশারা করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল— চললাম হে!

* * *

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

নিতাই আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। ওদিকে ট্রেনটা ছাড়িয়াছে। ট্রেনটা স্টেশন হইতে ছাড়িয়া সশব্দে সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। কামরার পর কামরা। একটা কামরায় ঝুমুরের দলটাকে দেখা গেল। বসন্ত মেয়েটি একধারে দরজার পাশেই জানালায় মাথা রাখিয়া যেন একেবারে এলাইয়া পড়িয়ছে।

অদ্ভুত মেয়ে! নিতাই হাসিল। ঝুমুর সে অনেক দেখিয়াছে! কবিগান করিতে ইহাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ব্যবসায়িনী ক্ষুরধার মেয়ে সে দেখে নাই। ক্ষুরধার নয়, জলন্ত। মেয়েটা যেন জ্বলিতেছে। তবে মেয়েটার গুণ আছে, রূপও আছে। আশ্চর্য মেয়ে! গত রাত্রের গানটা তাহার গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

“করিল কে ভুল—হায় রে!
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।
করিল কে ভুল! হায়রে!”

ট্রেনট চলিয়া গেল। নিতাই বসিয়াই রহিল। চাহিয়া রহিল রেল-লাইনের বাঁকে যেখানে সমান্তরাল লাইন দুইটি এক বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানের দিকে। বসন্ত তো চলিয়া গেল, আর হয়তো কখনও দেখাই হইবে না। অদ্ভূত মেয়ে! ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার এক একটি রূপ, এক রাত্রে উহাকে লইয়াই তিন-তিনখান গান মনে আসিয়াছে। সে খানিকট উদাস হইয়া রহিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা সচেতনতা আসিয়া তাহাকে নাড়া দিল। ওইখানেই বাঁকের ওই বিন্দুটিতে এক সময় একটি স্বর্ণবিন্দু ঝকমক করিয়া উঠিবে, তাহার পর দেখা যাইবে—ও স্বর্ণবিন্দুটির নীচে চলন্ত একটি কাশফুল। স্বর্ণবিন্দু বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখাটির মধ্যে মধ্যে এক একটি চকিত চমকে চোখে

লাগিয়া চোখ ধাধিয়া দিবে। অসমাপ্ত গানগুলি তাহার অসমাপ্তই রহিল, পথের উপর স্থিরদৃষ্টি পাতিয়া নিতাই যেন প্রত্যাশা-বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল।

ঠাকুরঝি কখন আসিবে? কই, ঠাকুরঝি আসিতেছে কই?

ওই কি? না, ও তো নয়! নিতান্তই চোখের ভ্রম। মনের প্রত্যাশিত কল্পনা–এই দিকের আলোর মধ্যেও মরুভূমির মরীচিকার মত মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এমনি দেখা যায়, আবার মিলাইয়া যায়। নিতাই হাসিল। এই তো বেলা সবে দশটা। ঠাকুরঝি আসে ঘড়ির কাঁটাটির মত বারোটার ট্রেনটির ঠিক আগে।

তবু সে উঠিয়া গেল না। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টাগুলো আজ যেন যাইতেই চাহিতেছে না।

ওই! হ্যাঁ, ওই আসিতেছে। চলন্ত সাদা একটি রেখার মাথায় স্বর্ণাভ একটি বিন্দু। কিন্তু না, ও তো নয়, রেখাটির গতি-ভঙ্গি তো তেমন দ্রুত নয়, রেখাটিও তেমন সরল দীঘল নয়!

ওই আর একটি রেখা, এও নয়।

নিতাইয়ের ভুল হয় নাই। রেখাগুলি নিকটবর্তী হইলে সেগুলি নারীমূর্তি হইয়াই উঠিল, মাথায় তাহদের ঘটিও ছিল। তাহারাও এ গ্রামে দুধ লইয়া আসে। কিন্তু তাহদের মধ্যে কেহই ঠাকুরঝি নয়। একে একে তাহারা সকলেই গেল। কিন্তু ঠাকুরঝি কই? কই?

বেলা বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল। রাজা আসিয়া ডাকিল—ওস্তাদ!

সচকিত হষ্টয়া নিতাই হাসিয়া বলিল—রাজন!

—কেয়া ধ্যান করত ভাই, হিঁয়া বইঠ্‌কে? নয়া কুছ গীত বানায়া—?

—না তো—। অপ্রস্তুতের মত নিতাই শুধু খানিকটা হাসিল।

—তুমার উপর হাম গোসা করেগা।

—কেন রাজন, কেন? কি অপরাধ করলাম ভাই?

—ওহি ঝুমুরওয়ালী বোলা তুমারা দিলকে আদমী, মনকে মানুষ—

নিতাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর রাজার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—চল, চা খেয়ে আসি। চা খাওয়া হয় নাই, ঠাকুরঝি আজ আসে নাই দুধ নিয়ে। ঝুমুরওয়ালীর কথায় তুমি বিশ্বাস করেছ? হ্যাঁ রাজন—আছে আমার মনের মানুষ। আমার মনের মানুষ তুমি রাজন, তুমি।

—হাম? রাজা বিকট হাসিতে স্থানটি উচ্চকিত করিয়া দিল। সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—চুমু খাগা ওস্তাদ? আবার সেই বিকট হাসি। সে হাসির প্রতিধ্বনিতে আকাশ হাসিতে লাগিল, বাতাস হাসিতে লাগিল।

কবি – ১২

একদিন, দুইদিন, তিনদিন।.

পর পর তিনদিন ঠাকুরঝি আসিল না। চতুর্থ দিনে উৎকণ্ঠিত হইয়া নিতাই স্থির করিল, আজ ঠাকুরঝি না আসিলে ঠাকুরঝির গ্রামে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিবে।

বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল, সেদিনও ঠাকুরঝি আসিল না। অন্যান্ত মেয়েরা যাহারা দুধ দিতে আসে, তাহারা আসিয়া ফিরিয়া গেল। নিতাইয়ের বার বার ইচ্ছা হইল—উহাদের কাছে সংবাদ লয়, কিন্তু তাহাও সে কিছুতেই পারিল না। কেমন সঙ্কোচ বোধ করিল। নিজেই সে আশ্চর্য হইয়া গেল—বার বার মনে হইল, কেন সঙ্কোচ, কিসের সঙ্কোচ? কিন্তু তবু সে-সঙ্কোচ নিতাই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। চুপ করিয়া সে আপনার বাসায় আসিয়া ভাবিতে বসিল। কোন অজুহাতে ঠাকুরঝির শ্বশুরগ্রামে যাইলে হয় না? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঠিক করিল—হাঁস, মুরগী অথবা ডিম কিনিবার অছিলায় যাইবে। ঠাকুরঝির শ্বশুরের হাঁস মুরগী আছে সে জানে। সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি পর্যন্ত ঠাকুরঝি তাহাকে বলিয়াছে। দেওয়ালে কোথায় একটি সুচ গাথা আছে, নিতাই সেটি গিয়া স্বচ্ছন্দে-চোখ বন্ধ করিয়া লইয়। আসিতে পারে।

—ওস্তাদ রয়েছ নাকি? রাজার কণ্ঠস্বর। নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, রাজা বাংলায় বাত বলিতেছে! বিস্মিত হইয়া সে হিন্দীতে উত্তর দিল—রাজন, আও মহারাজ, কেয়া খবর?

রাজা আসিয়া খবর দিল—বিষন্নভাবে বাংলাতেই বলিল—খারাপ খবর ওস্তাদ, ঠাকুরঝিকে নিয়ে তো ভারি মুশকিল হয়েছে ভাই।

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, উৎকণ্ঠিত স্তব্ধমুখে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

–আজ দিন তিনেক হ'ল, কি হয়েছে ভাই, ওই ভাল মেয়ে-লক্ষ্মী মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ-মরদ সবারই সঙ্গে ঝগড়া-বাটি করছে—মাথামুড় খুড়ছে। কাল রাত থেকে আবার মূর্ছা যাচ্ছে। দাঁত লাগছে, হাত-পা কাঠির মত করছে।

অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হইয়া উঠিল। রাজার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তুমি দেখতে যাবে না রাজন?

রাজা বলিল—বউ গেল দেখতে, ফিরে আসুক। আমি ও-বেলায় যাব।

—আমিও যাব। নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল, মাথা নীচু করিয়া সে তাহা গোপন করিল।

রাজা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বড় ভাল মেয়ে ওস্তাদ। আবার কিছুক্ষণ পর রাজা বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির মরদটি যা কাঁদছে! হাউ হাউ করে কাঁদছে। ছেলেমানুষ তো, সবে ভাব-সাবটি হয়েছে ঠাকুরঝির সঙ্গে। বেচারা! রাজা একটু ম্লান হাসি হাসিল।

টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে এবার ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি খেলাচ্ছলে আঙুল দিয়া জলের চিহ্ন দুইটা বিলুপ্ত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল—রাজন!

—ওস্তাদ!

—ডাক্তার-বদ্যি কিছু দেখানো হয়েছে? হতাশায় ঠোঁট দুইটা দুইপাশে টানিয়া রাজা বলিল—এতে আর ডাক্তার-বদ্যি কি করবে ওস্তাদ! এ তোমার নির্ঘাত অপদেবতা, না হয় ডান ডাকিনী, কি কোন দুষ্ট লোকের কাজ!

কথাটা নিতাইয়ের মনে ধরল। চকিতে মনে হইল, তবে কি ওই ক্ষুরধার মেয়েটার কাজ! ঝুমুর দলের স্বৈরিণী—উহাদের তো অনেক বিদ্যা জানা আছে, বশীকরণে উহারা তো সিদ্ধহস্ত।

রাজা বলিল—মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে। কি ব্যাপার বিত্তান্ত আজই জানা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—আও ভেইরা, থোড়াসে চা পিয়েগা।

এতক্ষণে সে হিন্দী বলিল, অনেকক্ষণ পর রাজা যেন সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

米 米 米

রাজার বাড়ীতেই নিতাই বসিয়া ছিল। রাজার স্ত্রী ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছে। এখনও ফেরে নাই। ভরন শেষ হইলেই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে—সেই সংবাদের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া নিতাই বসিয়া রহিল। রাজা দুঃখ কষ্ট শোক সন্তাপের মধ্যেও রাজা। সে প্রচুর মুড়ি, বেগুনি, আলুর চপু, কাঁচালঙ্ক, পেয়াজ, তাহার সঙ্গে কিছু সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল।

নিতাই বলিল— এ সব কি হবে? এ সমারোহ তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

—খানে তো হোগা ভেইয়া; পেট তো নেহি মানেগা জী! লাগাও থান। তারপর সে চীৎকার আরম্ভ করিল—এ বাচ্চা! এ বেটা!

ডাকিতেছিল সে ছেলেটাকে। রাজার ছেলের ধরণটা অনেকটা সে আমলের যুবরাজের মতই বটে, দিনরাত্রিই সে মৃগয়ায় ব্যস্ত, একটা গুলতি হাতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। শালিক, চড়ুই, কোকিল, কাক—যাহা পায় তাহাই হত্যা করে। হত্যার উদ্দেশ্বে হত্যা। খাওয়ার লোভ নাই। কখনও কখনও পাখীর বাচ্চা ধরিয়া পোষে এবং তাহার জন্য ফড়িং শিকার করিয়া বেড়ায়। যুবরাজ বোধ হয় আজ দূরে কোথাও গিয়া পড়িয়াছিল, সাড়া

পাওয়া গেল না। রাজা চটিয়া চীৎকার করিয়া হাঁক দিল—এ শূয়ার কি বাচ্চা, হারামজাদোয়া–

তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা নিতাইকে বলিল—কিধর গিয়া ওস্তাদ। তারপর হাসিয়া বলিল—উ বাতঠো—কেয়া বোলতা তুম ওস্তাদ? কেয়া?—তেপান্তরকে মাঠকে উধার—কেয়? মায়াবিনী, না কেয়া?

এমন ধারার চীৎকারে সাড়া না পাইলে নিতাই বলে—যুবরাজ বোধ হয় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে মায়াবিনী ফড়িং কি পক্ষিণীর পেছনে ছুটেছে রাজন।

আজ কিন্তু নিতাইয়ের ও-কথাও ভাল লাগিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলির সে একটু ম্লান হাসি হাসিল, সে কেবল রাজার মনরক্ষার জন্য!

রাজাও আর ছেলের খোঁজ করিল না, দুইটা পাত্র বাহির করিয়া আহার্য ভাগ করিয়া একটা নিতাইকে দিয়া, অপরটা নিজে টানিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল—যানে দেও ভেইয়া শূয়ার-কি বাচ্চাকো। নসীবমে ভগবান উস্‌কো নেহি দিয়া, হাম কেয়া করেগা?

নিতাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝির কথা। চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রং ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। আকাশ হইতে মাটি পর্যন্ত পীতাভ রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। চারিপাশে দূরান্তরের শূন্যলোক যেন মৃদ্ধ কম্পনে কাঁপিতেছে বলিয়া মনে হইল। তাহারই মধ্যে চারিদিকেই নিতাই দেখিতে পাইল স্বর্ণবিলুীর্ষ কাশফুল। এদিকে, ওদিকে, সেদিকে—সব দিকেই। .কোনদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেই মনে হইল কম্পমান দূর দিগন্তের মধ্যে একটি স্বর্ণবিদুশীর্ষ কাশফুল দুলিতেছে, কাঁপিতেছে।

ক্ষুধার্তগ্রাসে রাজা খাওয়া শেষ করিয়া বলিল—খা লেও ভাই ওস্তাদ।

ম্লান হাসিয়া নিতাই বলিল—ন।

—দূর, দূর; খা লেও। পেটমে যানেসে গুণ করেগা। তবিয়ৎ ঠিক হে যায়েগা।

— তবিয়ৎ ভালই আছে রাজন, কিন্তু মুখে রুটবে না।

—কাহে? মুখমে কেয়া হয়। ভাই?

রাজার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নিতাই যেন অকস্মাৎ বলিল—রাজন সেদিন তুমি আমাকে শুধিয়েছিলে আমার মনের মানুষের কথা।

—হাঁ। রাজা কথাটা বুঝিতে পারিল না, সে ওস্তাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আমার মনের মানুষ, রাজন, ওই ঠাকুরঝিই। ঠাকুরঝি আমার মনের মানুষ। বলিতে বলিতে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাজার খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে কবিয়ালের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্য সময় হইলে সে হয়তো বিকট হাস্যে কথাটা এই মুহূর্তে পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিত, কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য তাহার বেদনাভারক্রান্ত মন আজ তাহা পারিল না। স্তব্ধ হইয়া দুজনেই বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে কে জানে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রাজার স্ত্রী। ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত নিতাই প্রশ্ন করিতে গিয়া তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জিত শত প্রশ্নের মধ্য হইতে কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করিল, কেবল একটি কথা—কি হ'ল?

রাজার স্ত্রী যেন অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল—ডাইন, ডাকিন, রাক্ষস—তারপর সে অশ্লীল কদর্য অশ্রাব্য বিশেষণে নিতাইকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এবং নিতাইয়ের মুখের উপর আঙুল দেখাইয়া বলিল—তুই, তুই, তুই! তোর নজরেই কচি মেয়েটার আজ এই অবস্থা! এত লোভ তোর? তোর মনে এত পাপ?

অজস্র ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত ও অশ্রাব্য গালিগালাজের মধ্য হইতে বিবরণটা জানা গেল। আজ ঠাকুরঝিকে কালী মায়ের ভরনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ-ধুনা দিয়া কালী মায়ের দেবাশী একগাছ কাটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কালী, করালী, নরমুণ্ডমালী। ভূত, পেরেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, রাক্ষস, পিচাশ, যে মন করেছে যা তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে। তার রক্ত তুমি খাও মা। ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

—বল বল? কে তোকে এমন করলে বল? দোহাই মা কালীর!

ঠাকুরঝি তবুও কোন কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মত দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন কাঁপিতেছিল তেমনি কাঁদিয়াছিল। এবার বজ্রনাদে দুর্বোধ্য অনুস্বার-বহুল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ্ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—বলছি বলছি, আমি বলছি।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের; বলিয়াছে—ওস্তাদ, কবিয়াল। আমাকে লালফুল দিলে। তারপর সে উদ্‌ভ্রান্ত মৃদুস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল—,

“কাল চুলে রাঙা কোলম হেরেছ কি নয়নে?”

রাজার স্ত্রীর মনে পড়িয়াছিল—নিতাইয়ের বাসার জানাল দিয়া দেখা ছবি—নিতাই ঠাকুরঝির চুলে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল। সে কথাটা সমর্থন করিয়া সচীৎকারে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

বাকীটা ঠাকুরঝিকে আর বলিতে হয় নাই। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিয়াই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এখানে আসিয়া নিতাইকে গালিগালাজে—শরবিদ্ধ ভীষ্মের মত জর্জরিত করিয়া তুলিল।

অন্যদিন হইলে রাজা স্ত্রীর চুলের মুঠা ধরিয়া কঞ্চির প্রহারে মুখ বন্ধ করিত। আজ কিন্তু সেও যেন পঙ্গু হইয়া গেল। নিতাই মাথা হেঁট করিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল। গালিগালাজ অভিসম্পাত বিশেষ করিয়া ঠাকুরঝি যাহা বলিয়াছে সেই কথা শুনিয়া—সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পর ট্রেনের ঘণ্টার শব্দে রাজা সচেতন হইয়া উঠিল। তাহাকেও সচেতন করিয়া দিল। ট্রেনের ঘণ্টা পড়িয়াছে। তিনটার ট্রেন। রাজা স্টেশনে যাইবে, সে নিতাইকে ডাকিল। উঠে ভাই ওস্তাদ, কি করবে বল? হম ইস্টিশনমে যাতা হ্যায়! নিতাই উঠিয়া আসিয়া বসিল কৃষ্ণচুড়া গাছের তলায়। উদাসীন স্তব্ধ নিতাই ভাবিতেছিল, পথের কথা। কোন্ পথে গেলে সে এ লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কোন্ পথে গেলে জীবনে শান্তি পাইবে সে?

ঠিক এই মুহূর্তেই একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে—এই যে ওস্তাদ!

নিতাই নিতান্ত উদাসীনের মতই তাহার দিকে চাহিল। মুহূর্তে তাহার মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল—তুমি?

লোকটি বলিল—হ্যাঁ আমি। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ। বড় দায়ে পড়ে এসেছি ভাই। বসন পাঠালে।

—বসন?

—সেই ঝুমুর দলের বসন।

লোকটি সেই ঝুমুর দলের বেহালদার।

আরও ঘণ্টা কয়েক পর। হেমন্তের ধূসর সন্ধ্যা; সন্ধ্যার মান রক্তাভ আলোর সঙ্গে পল্লীর ধোঁয়া ও ধূলার ধূসরতায় চারিদিক যেন একটা আচ্ছন্নতায় ঢাকা পড়িয়াছে। ওদিকে

সন্ধ্যার ট্রেনখানা আসিতেছে। পশ্চিমদিক হইতে পূর্বমুখে। যাইবে কাটোয়। সিগন্যাল ডাউন করিব রাজা লাইনের পয়েন্টে নীল বাতি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল নিতাই।

—রাজন!

রাজা ফিরিয়া দেখিল—নিতাই। তাহার পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, গায়ে জামা, গলার চাদর, বগলে একটি পুঁটলি। রাজা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কাহা যায়েগা ওস্তাদ? পাঁচটা টাকা তাহার হাতে দিয়া নিতাই বলিল—দুধের দাম, ঠাকুরঝিকে দিও। রাজা ফিস্ ফিস্ করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল—ঠাকুরঝিকা জাত মে জাত দেগা ওস্তাদ? নিতাই বিস্মিত হইয়া রাজার দিকে চাহিল।

—ঠাকুরঝিকে সাদী হাম বাতিল কর দেগা। তুমারা সাথ ফিন সাদী দেগা। 'সাগাই' দে দেগা।

নিতাই মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া হাসিয়া কেবল একটি কথা বলিল—ছি!

—ছি কাহে?

—মামুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি!

রাজা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস করিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

নিতাই বলিল—তুমি বিশ্বাস কর রাজন, আমি কবিগান করি, কিন্তু মন্ততন্ত কিছু জানি না, কিছু করি নাই। তবে হ্যাঁ, টান—একটা ভালবাসা হয়েছিল। তা বলে ঠাকুরঝিকে নষ্টও আমি করি নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া বাঁকের মুখে ট্রেনের সার্চ-লাইট জ্বলিয়া উঠিল। ট্রেনটা ওদিক হইতে স্টেশনে ঢুকিতেছে। নিতাই দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে চলিল। এতক্ষণে এই

সার্চলাইটের আলোতে নিতাইয়ের বেশভূষা ও বগলের পুঁটলি যেন রাজার চোখে খোঁচা দিয়া বুঝাইয়া দিল নিতাই কোখাও চলিয়াছে। এতক্ষণ কথাটা তাহার মনে হয় নাই। এবার সে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল–কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ?

ওদিকে ট্রেনটা সশব্দে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় নিতাই কিছু বলিল কিন রাজা বুঝিতে পারিল না। ট্রেনথান স্টেশনে প্রবেশ করিলে পয়েণ্ট ছাড়িয়া রাজা ছুটয়া প্লাটফর্মে আসিল।

—ওস্তাদ —ওস্তাদ!

তখন নিতাই গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়ছে। গাড়ীর কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া নিতাই উত্তর দিল—রাজন!

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে রাজন প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ভাই?

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—বায়ন এসেছে ভাই। আলেপুরের মেলায়।

আলেপুরে মহাসমারোহে নূতন মেলা হইতেছে। কিন্তু বায়না কখন আসিল? রাজার মনে চকিতে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। ঠাকুরঝির দুধের দাম পাঁচ টাকা মিটাইয়া দিয়া সে বায়না লইয়া কবিগান করিতে চলিয়াছে! মিথ্যা কথা। সে বলিল—ফুট বাত।

—না রাজন। এই দেখ, লোক। রাজা দেখিল, সেই ঝুমুর দলের বেহালাদার। দলনেত্রী প্রৌঢ়া মেলায় গিয়াছে, সেখান হইতে নিতাইয়ের কাছে লোক পাঠাইয়াছে। তাহাদের দলের কবিয়াল পলাইয়া গিয়াছে। বসন ঝগড়া করিয়া তাহাকে লাথি মারিয়াছে।

নিতাই বলিল—আলেপুর, আলেপুর থেকে কান্দর, কানারা থেকে কাটোয়, কাটোয়। থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে—

ট্রেনের বাঁশী তাহার কথাটাকে ঢাকিয়া দিল।

বাঁশী থামিল, ট্রন চলিতে আরম্ভ করিল। রাজা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চুটিতে ছুটিতে প্রশ্ন করিল—অগ্রদ্বীপসে কাঁহা? দুনিয়া ভোর কি তুমারা বায়না আয়া হ্যায়? উতার আও ওস্তাদ, উতার আও। —রাজার কষ্ঠের আর্তমিনতি মুহূর্তের জন্য নিতাইকে বিচলিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করির হাসিল। মনে মনেই বলিল—হ্যাঁ, দুনিয়া ভোর বায়না আয়া হ্যায় রাজন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ট্রেন প্লাটফর্ম পার হইয়া দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

কবি – ১৩

ট্রেনখানা পূর্ব মুখের বাঁকটা ঘুরিয়া ফিরিল দক্ষিণমুখে। এ সেই বাঁকটা যেখানে ঠাকুরঝি আসিলে তাহার মাথার ঘাটটি রোদের ছটায় ঝিকমিক করিয়া উঠিত। গাড়ীখানা দক্ষিণমুখে চলিতেছে। এবার বাঁ পাশে পড়িল পূর্বদিগন্ত। পূর্বদিগন্তে তখন শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল। আকাশে পাতলা মেঘের আভাস রহিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণ। তাহার আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে! নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকেই চাহিয়া রহিল। ছোট লাইনের ট্রেনগুলি বড় বেশী দোলে, আর শব্দও করে বড় লাইনের ট্রেনের চেয়ে অনেক বেশী—শূন্য কুম্ভের মত। যে লোকটি নিতাইকে লইতে আসিয়াছিল, সে ঝুমুর দলের বেহালাদার। কিন্তু বাজনাও সে জানে। সে বেশ খানিকট নেশার আমেজে ছিল, ট্রেনের এই অত্যধিক শব্দে এবং বর্ণকুনিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল—এ যে ঝাঁপতাল লাগিয়ে দিলে ওস্তাদ। এবং ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া বেঞ্চ বাজাইয়া বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেখাদেখি ওপাশের বেঞ্চে দুইটা ছোট ছেলে ট্রেনের শব্দের মর্মার্থ উদ্ধার আরম্ভ করিল। একজন বলিল— কাঁচা-তেঁতুল— পাকা-তেঁতুল। কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল।

নিতাইয়ের মন কিন্তু কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না। চাঁদের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিলঠাকুরঝির কথা, রাজনের কথা, যুবরাজের কথা, বণিক মাতুলের কথা, বিপ্রপদর কথা, কৃষ্ণচূড়া গাছটির কথা, স্টেশনটির কথা, গ্রামখানির কথা। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইতেছিল—পরের স্টেশনেই সে নামিয়া পড়িবে।

স্টেশন পার হইয়া গেল, কিন্তু সে নামিতে পারিল না। হঠাৎ একসময়ে সে অনুভব করিল —নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চোথ কখন জুলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে কাঁদিতেছে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি মান হাসিয়া এতক্ষণে সে সচেতন হইয়া উঠিল। . পরক্ষণেই স্বাভাবিক সুকণ্ঠে সে গান ধরিল—আহা! বার দুই-তিন তা-না-না করিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে চাঁদ, তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

বাজনদারটা নেশার মধ্যেও সজাগ হইয়া বসিয়া বলিল—বাহবা ওস্তাদ! গলাখানা পেয়েছিলে বটে বাবা! বলিয়াই সে ধরতার মুখে বেঞ্চে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল—হেঁই— তা—তেরে কেটে—তা—তা!

গাহিতে গিয়া নিতাই পরের কলি বদলাইয়া দিল। মন যেন গানে ভরির উঠিয়াছে, সুরে ফেলিলেই সে গান হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—

"না না, তাও করে মার্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এই কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।"

স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেন চলিয়াছিল। নিতাই গানখানা বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়। চলিয়াছে। গাছিয়া যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ট্রেনটা খট্ খট্ শব্দে লাইনের জোড়ের মুখ অতিক্রম করিয়া একটা স্টেশনে আসিয়া ঢুকিল।

স্টেশনের জমাদার হাঁকিতেছে—কান্দরা, রামজীবন পু-র্। বাজনদার জানাল দিয়া মুখ বাড়াইয়া স্টেশনটার চেহারা দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওই, এরই মধ্যে চলে আইচে লাগচে। নামো—নামো–ওস্তাদ নামো।

নিতাই নামিল, কিন্তু গান বন্ধ করিল না। গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতেই সে স্টেশন পার হইয়া পথে নামিল—

“তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে,
কাকের মুখে বাত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।”

স্টেশন হইতে মাইল দুয়েক হাঁটা-পথে চলিয়া নিতাইয়ের মনের অবসাদ অনেকখানি কাটিয়া আসিল। রাসপূর্ণিমায় আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে। ইহার পূর্বেও নিতাই দেখিবার জন্য এ মেলায় আসিয়াছে। কেবল আলো—আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জল পণ্যসম্ভারভরা সারি সারি দোকানা, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক—লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর—যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক। এমনই একটি আসরে আজ তাহকে গান করিতে হইবে। কবি ও ঝুমুর দল এক হইয়া অপর একটি এমনিই দলের সহিত পাল্লা দিয়া গান করিবে। সঙ্গের লোকটি বলিয়াছে, তাহাকেই মুখপাত—অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে গান করিতে হইবে। তাহাদের যে লোকটা এমন আসরে গান করিত, সে লোকটা বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া অন্যদলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গলাও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, লোকটাও ছিল দুর্দান্ত মাতাল, গান বাঁধিবার ক্ষমতাও তাহার আর তেমন ছিল না। গতকাল একটা গানের সুরতাল লইয়া বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়াছিল। দুজনেই ছিল মত্তাবস্থায়। শেষ পর্যন্ত লোকটা বসন্তকে অশ্লীল গাল দেওয়ায় বসন্ত তাহার পিঠে লাথি বসাইয়া দিয়াছিল। ফলে লোকটা তাহার প্রণয়িনী মেয়েটাকে লইয়া অন্য দলে চলিয়া গিয়াছে। কবিয়াল এবং ভালো গানেওয়ালা না হইলে মেলায়

চলিবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রৌঢ়া নিতাইকে স্মরণ করিয়াছে। মানসম্মানের সমস্ত ভরসা এখন নিতাইয়ের উপর। সেইজন্য একান্ত অনুরোধ জানাইয়া ঝুমুর দলের নেত্রী প্রৌঢ়া তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে।

মনে মনে একটা খুব ভাল ধূয়া রচনা করিতে করিতে নিতাই পথ চলিতেছিল—মনটা ছিল মনে নিবদ্ধ, দৃষ্টি ছিল আকাশে নিবন্ধ, ওই আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে। ঠাকুরঝি, রাজন, যৌবরাজ, কৃষ্ণচুড়ার গাছ সমস্তই সম্মুখের ওই ভাস্বর আলোকে আলোকিত তাহার নিজের দেহের পিছনে দীর্ঘ ছায়ার অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সে যত সম্মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, পশ্চাত্রে ছায়া দৈর্ঘ্যে পরিধিতে তত বড় এবং ঘন হইয়া উঠিতেছে—সেই ক্রমবর্ধমান ছায়ার অন্ধকারে পিছনটা ক্রমশ যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে!

তাহার মনকে টানিতেছে মেলার আসর। ঠাকুরঝির চিন্তা, সেখানকার সকলের চিন্তাকে দুখকে ছাপাইয়া মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছে। আজ সে কবিয়াল হইয় আসরে নামিবে। চণ্ডীমায়ের মেলায় মহাদেবের সঙ্গে পায় হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে এক আর এ এক। আজ সে সত্যিই কবিয়াল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া মেলায় গাওনা করিতে চলিয়াছে। এমন ভাগ্য যে তাহার কখনও হইবে, সে ভাবে নাই।

সে গাহিবে বসন্ত নাচিবে। অপর মেয়েগুলিকে সে নাচিতে দিবে না। আসরে বসিয়া তাহারা দোয়ারকি করিবে। এই সব কল্পনা করিতে করিতে তাহার মনে একটা কলিও আসিয়া গেল।

“ব্রজ গোকুলের কূলে কালো কালিন্দীরই জলে—
হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি–

ওহে কুটিল কালা।”

সঙ্গে সঙ্গে সুরে ফেলিয়া সে গুন গুন করিয়া গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অপর দলের কবিয়াল নাকি বেজায় রঙদার লোক, গোড়া হইতেই রঙ তামাসা আরম্ভ করিয়া দেয়। রঙের জোরেই সে আসর জিতিয়া লয়। নিতাই কিছুতেই প্রথম হইতে রঙ আরম্ভ করিবে না। মানুষ কেবল মদই ভালবাসে, দুধে তাহার অরুচি—এ-কথা সে বিশ্বাস করে না। যদি অরুচি দেখে তবে মদই সে দিবে। দেখাই যাক না।

হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খাইয়া নিতাইকে দাঁড়াইতে হইল। মেলার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের জনতা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কবিয়ালির চিন্তায় বিভোর হইয়াই নিতাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, হঠাৎ বাকের মুখে লোকটার সহিত ধাক্কা বেশ একটু জোরেই লাগিয়া গেল। লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কানা নাকি। একেবারে হন্যে হয়ে ছুটেছে!

নিতাই অবনত হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—তা অন্যায় হয়ে গিয়েছে ভাই।

লোকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিল—অঃ, একেবারে ঠাঁই করে লেগেছে—

নিতাই বলিল—তবে দোষ এক আমার নয়, বেবেচনা ক’রে দেখুন।

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল।

এই অন্ধকার মোড়টা ফিরিয়াই মেলা। সারা মেলাটার বিভিন্ন পটি অতিক্রম করিয়া তাহারা মেলার বিপরীত প্রান্তে আসিয়া পড়িল। এখানে আলোকের সমারোহটা কম, কিন্তু লোকের ভিড় বেশী। মেলার এই প্রান্তে একটা গাছের তলায় খড়ের ছোট ছোট থান-কয় ঘর বাঁধিয়া ঝুমুরের দলটি আস্তানা গাড়িয়াছে। আশেপাশে এমনি আরও গোটাকয়েক ঝুমুরের দলের আস্তানা। একপাশে খানিকটা দূরে জুয়ার আসর। তাহারই পর চতুষ্কোণ,

আকারের একটা খোলা জায়গায় সারি সারি খড়ের ঘর বাঁধিয়া বেশ্যাপল্লী বসিয়া গিয়াছে। সে যেন একটা বিরাট মধুচক্রে অবিরাম গুঞ্জন উঠিতেছে।

মধ্যে মধ্যে নেশায় উন্মত্ত জনতা উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে ফাটিয়া পড়িতেছে। তেমনি একটা কোলাহলে নিতাইয়ের গানের কলি দুইটা গোলমাল হইয়া গেল।

বসন্তদের ঝুমুরদলের আস্তানায় ঘরগুলার সামনে গাছতলায় চ্যাটাই পাতিয়া লণ্ঠনের আলোয় প্রৌঢ়া সুপারি কাটিতেছিল—জন-দুইয়েক রান্নায় ব্যস্ত ছিল। একটা খড়ের কুঠুরীতে উজ্জল আলো জ্বলিতেছে, মেয়েপুরুষের সম্মিলিত হাসির উচ্ছ্বাসে ঘরখানা উচ্ছ্বসিত। তাহার মধ্যে নিতাই চিনিল—-বসন্তর হাসি; এমন ধারালো খিল-খিল হাসি বসন্ত ভিন্ন কেহ হাসিতে পারে না, অন্যত ঝুমুর দলের কোন মেয়ে পারে না।

নিতাইকে দেখিয়াই প্রৌঢ়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া দাঁড়াইল—এস, এস, বাব এস। আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।

রন্ধনরত মেয়ে দুইটি রান্না ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—হাসিমুখে বলিল—এসে গিয়েছ—লাগছে!

নিতাই হাসিয়া বলিল—এলাম বৈকি।

প্রৌঢ় বলিল—ওলো, বাবাকে আমার চা ক'রে দে। মুখে হাতে জল দাও বাবা।

একটি মেয়ে বলিল—খুব ভাল করে গান করতে হবে কিন্তুক।

অন্য মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া আলোকোজ্জল কুঠুরীটার দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—ওলো বসন, কবিয়াল আইচে লো! তোর কালো-মাণিক!

নিতাই হাসিয়া সংশোধন করিয়া দিল—কালো-মাণিক লয়, কয়লা-মাণিক।

বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার পা টলিতেছে, ডাগর চোখের পাতা ভারী হইয়া নামিয়া আসিতে চাহিতেছে, নকের ডগায় চিবুকে কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে। সে

আসিয়া দৃষ্টি বিস্ফোরিত করিয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয় তাহার হাত ধরিয়া বলিল—না, তুমি আমার কালো-মাণিক। আমার মনে রেখেছ তুমি, ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ—তুমি আমার কালো-মাণিক।

নেশার প্রভাবে বসন্তর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই খানিকট আবেগময় হইয়াছিল—কিন্তু সে আবেগ, শেষ কথা কয়টি বলিবার সময় যেন অনেক গুণে বাড়িয়া গেল।

প্রৌঢ়া রহস্য করিয়া বলিল—তা ব'লে যেন কাঁদতে বসিস না বসনা, নেশার ঘোরে!

নেশায় অর্ধনিমীলিত চোখ দুইটি আবার বিস্ফারিত করিয়া বসন এবার খানিকক্ষণ প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ কাঁদব, কালো-মাণিকের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দোব। এমন যত্ন ক'রে কে চা ক'রে দেয়—কে গায়ের ধুলো মুছিয়ে দেয়? আজ সারারাত কাঁদব—। বলিতে বলিতেই সে আপনার ঘরের হুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল—এই নাগরের, যাও, চলে যাও তোমরা। আর আমোদ নেহি হোগা!

প্রৌঢ়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বসন্তর হাত ধরিয়া বলিল—এই বসন! বসন! ছিঃ! করছিস কি? খদের লক্ষ্মী—তাড়িয়ে দিতে নাই।

বসন প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—তা বলে আমি কাঁদতেও পাব না মাসী, আমি কাঁদতেও পাব না?

নিতাই উঠিয়া আসিয়া বলিল—না কাঁদবে কেনে? ছি!

—তবে তুমিও এস! তুমি গান করবে আমি নাচব।

—আচ্ছা, আচ্ছা। প্রৌঢ়া বলিল—যাবে। এই এল, চ খেয়ে জিরুক খানিক, তারপর যাবে; তু চল ততক্ষণ।

—চা? না, চা থাবে কি! চা খাবে কেনে? খুব ভাল মদ আছে—মদ খাবে! এস। বসন্ত নিতাইয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

নিতাই হাত টানিয়া লইয়া বলিল—ছাড়্।

–না।

—মদ আমি খাই না।

—খেতে হবে তোমাকে। আমি থাইয়ে দোব।

–না,

বসন্ত ঘাড় বাঁকাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল-আলবৎ খেতে হবে তোমাকে।

প্রৌঢ়া বলিল—মাতলামি করিস না বসনা, ছাড়্, ঘরে যা।

তেমনি বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিয়া বসন নিতাইকে বলিল—যাবে না তুমি? মদ খাবে না?

–না।

—আমার কথা তুমি রাখবে না?

—এ কথাটি রাখতে পারব না ভাই।

বসন্ত নিতাইকে ছাড়িয়া দিল। তারপর টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল–বন্ধ করে দেও দরজা।

প্রৌঢ়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—মেয়েট ওই মদ খেয়েই নিজের সর্বনাশ করলে। এত মদ খেলে কি শরীর থাকে!

নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যে মেয়েটি চা করিতে গিয়াছিল, সে একটা কলাইকরা গ্লাসে চা আনিয়া বলিল—লাও, চা খাও ওস্তাদ।

হাসিয়া নিতাই চায়ের গ্লাসটি লইয়া বলিল—নক্ষী দিদি আমার, বাঁচালে ভাই!

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—বাঃ, বেশ হয়েছে। নির্মল, তু ওস্তাদকে দাদা বলে ডাকবি। ভাইদ্বিতীয়েতে ফোঁটা দিবি ওস্তাদকে, কিন্তুক কাপড় লাগবে!

নিতাই পরম প্রীত হইয়া বলিল–নিশ্চয়!

অপর মেয়েটি রান্নাশাল হইতেই বলিল – তা হলে আমি কিন্তুক ঠাকুরঝি সম্বন্ধ পাতালাম।

প্রৌঢ়া খুশী হইয়া সায় দিয়া বলিল—বেশ বলেছিস ললিতে, বেশ বলেছিস! বসন তোকে দিদি বলে।

নিতাইয়ের হাত হইতে চায়ের গ্লাসটা খসিয়া পড়িয়া গেল—ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!

* * *

রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সে এক বীভৎস দৃপ্ত। নিতাইয়ের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। মেলা উৎসবের আলোকোজ্জ্বল সমারোহের একটি বিপরীত দিক আছে। সে দিকটা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। আলোকের বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলায় সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে। অবশ্য নিতাইয়ের যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম, সে পারিপার্শ্বিকও অবস্থাপন্ন সভ্যসমাজের ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিক। সভ্যসমাজের আবর্জনা ফেলার স্থান। সেখানেও অনাবিষ্কৃত চির-অন্ধকার—মেরুলোকের মত চির অন্ধকার। এ ধরনের বীভৎসতার সঙ্গে তাহার পরিচয় না-থাকা নয়। তবুও এমন করিয়া প্রত্যক্ষ মুখোমুখি হইয়া সে কখনও দাঁড়ায় নাই। সে হাঁপাইয়া উঠিল।

নির্মলা এবং ললিতার ঘরেও আগন্তুক আসিয়াছে। মত্ত জড়িত কণ্ঠের অশ্লীল হাস্যপরিহাস চলিতেছে।

বসন্তর ঘর হইতে সে লোক দুইটা চলিয়া গিয়াছে, আবার নূতন আগন্তুক আসিয়াছে।

প্রৌঢ়া দলের পুরুষগুলিকে লইয়া মদ খাইতে বসিয়াছে। নিতাইকে আবার একবার চা দেওয়া হইয়াছে। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝিকে। ইচ্ছা হইতেছিল—এখনই এখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সে পলাইয়া যায়। কলঙ্ক তো তাহার হইয়াই গিয়াছে, সে কলঙ্কের ছাপ ঠাকুরঝির অঙ্গেও লাগিয়াছে। হয়তো তাহার স্বামী এজন্য তাহাকে পরিত্যাগই করিবে—বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। দশের ভয়ে তার বাপও হয়তে তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। আজ তাহার সব লজ্জা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘর ভাঙিতে আর বাকী নাই। ভাঙিয়াই গিয়াছে। তার আর ভয় কেন? আজ তো নিতাই গিয়া ঠাকুরঝির হাত ধরিয়া বলিতে পারে—"এস, আজ হইতে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি।" নিতাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—চলিয়াই সে যাইবে, ইহাদের এই মেলার গানের আসর সারিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু গ্রামে নয়, অন্য যেখানে হোক—এত বড় দুনিয়ায় যেদিকে মন চায় সেই দিকে চলিয়া যাইবে। মুহূর্তে পূর্বের চিন্তা কল্পনা সব তাহার পাণ্টাইয়া গিয়াছে—না না, সে হয় না। ঠাকুরঝির ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগিবে, তাহার মুখের সংসার আবার মুখে ভরিয়া উঠিবে।

ঠাকুরঝি তাহাকে ভুলিয়া যাক। না দেখিলেই ভুলিয়া যাইবে। সন্তান-সন্ততিতে তাহার কোল ভরিয়া উঠুক, মুখে সম্পদে সংসার উথলিয়া পড়ুক, স্বামী সন্তান সংসার লইয়া সে সুখী হোক।

কবি – ১৪

বিগত রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র চোখেই সে যাপন করিয়াছিল। কিছুতেই ঘুম আসে নাই। ভোরে উঠিয়াই সে ঝুমুর দলের আস্তানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড দীঘিকে মাঝখানে রাখিয়া দীঘির চারিপাশে মেলা বসিয়াছে। রাসপূর্ণিমায় রাসোৎসব মেলা; দীঘির পূর্ব দিকে রাধাগোবিনের মন্দির; পাশেই সেবাইত বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া; মুখ হাত ধুইয়া নিতাই সেই রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গিয়া বসিল। রাসমঞ্চে অষ্টসখীপরিবৃতা রাধাগোবিন্দকে তাহার বড় ভাল লাগিল। সেখানেই বসিয়া সে গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। রাধাকৃষ্ণের যুগল-রূপের স্তবগান। প্রথমে গুন গুন করিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া—বেশ গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। মিষ্ট গলার গানে বেশ কয়েকজন লোকও জমিয়া গেল। আখড়ার মোহন্তও বাহির হইয়া আসিলেন।

নিতাই গাহিতেছিল—

"আশ মিটায়ে দেখ রে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী!"

মোহন্ত, চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাল দিতে দিতে একজনকে বললেন–খোল আন তো বাবা।

মোহন্ত খোল লইয়া নিজেই সঙ্গত আরম্ভ করিয়া দিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন—তোমার কণ্ঠটি তো বড় ভাল! পদাবলী জান বাবা?

নিতাই পদাবলী কথাটা বুঝিল না। বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে! —মহাজন পদাবলী বাবা–চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের পদ? নিতাই হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু, অধীনের অধম নীচ কুলে জন্ম। এ সব কি করে জানব বাবা?

হাসিয়া মোহন্ত বলিলেন–জন্ম তো বড় নয় বাবা, কর্মই বড়, মহাপ্রভু আমার আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন।

মুহূর্তে নিতাইয়ের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল, বলিল—কর্মও যে অতি হীন প্রভু; ঝুমুর দলে—বেশ্যাদের সঙ্গে থাকি, কবিগান করি।

—কবিগান কর?

–আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।

—যে গান তুমি গাইলে, সে কি তোমার গান?

মাথা নত করিয়া সলজ্জ হইয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোহন্ত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—ভাল ভাল! চমৎকার গান! তারপর বলিলেন–কর্ম তোমার তো অতি উচ্চ কর্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি! যারা কবি, তারাই তো সংসারে মহাজনা, তারাই তো সাধক। কবির গানে ভগবান বিভোর হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন।

টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোট জল নিতাইয়ের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল—কিন্তু সঙ্গ যে অতি নীচ সঙ্গ বাবা, বেশ্যা–

মোহন্ত হাসিয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিতাইকে বাধা দিলেনা, বলিলেন—প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা। নিজে, পরে নয়—নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে দিয়েছ বাবা? সূর্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার রঙের মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু। জান বাবা, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী?

নিতাই বিল্বমঙ্গলের কাহিনী জানিত। গ্রামের বাবুদের থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল পালা সে দেখিয়াছে। সে বলিল—হ্যাঁ। কাহিনীটা সব তাহার মনে পড়িয়া গেল।

মোহন্ত সস্নেহে বলিলেন—তবে?

নিতাই ফিরিয়া আসিল—অদ্ভুত এক মন লইয়া। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি গানবাজনায় নাচে মুরে তালে পারদর্শিনী বলিয়া কবিয়াল নিতাই বাহিরে তাহদের খাতির করিত, কিন্তু মনের গোপন কোণে ঘৃণাই সঞ্চিত ছিল। আজ এই মুহূর্তে সেটুকুও যেন মুছিয়া গেল। মনটা যেন তাহার জুড়াইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে বার বার তাহার চোখে জল আসিল। কাপড়ের খুঁটে সে চোখ মুছিল-আর মনে মনে বাবাজীকে প্রণাম করিল। মনে মনে সংকল্প করিল গোবিন্দের প্রসাদের সঙ্গে সে বাবাজীর প্রসাদকণাও চাহিয়া লইবে।

ঝুমুর দলের আস্তানায় আসিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এও বুঝি গোবিন্দের রূপা।

আশ্চর্য! আজিকার প্রভাতের এই স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির রূপের সহিত গতরাত্রির স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির এতটুকু মিল নাই। সমস্ত স্থানটা গোবরমাটি দিয়া অতি পরিপাটীরূপে নিকাইয়া ফেলা হইয়াছে। গাছতলায় একটি কলার পাতায় অনেকগুলি ফুল, মেয়েগুলি স্নান সারিয়া জলসিক্ত চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া শান্তভাবে বসিয়া আছে; সকলের পরনেই লালপাড় শাড়ী—একটি নিবিড় এবং গভীর শান্ত পবিত্রতার আভাস যেন সর্বত্র পরিস্ফুট। বসন্ত পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, নির্মল ও ললিত বসিয়া ছিল এইদিকে মুখ ফিরাইয়া। তাহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বেশ মানুষ যা হোক তুমি। এই এত বেলা পর্যন্ত কোথা ছিলে বল দেখি?

বসন্ত মুখ ফিরিয়া চাহিল। নিতাই মৃদু হাসিল। বসন্ত মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পরক্ষণেই রান্নাশালে চলিয়া গেল। নিতাই আসিয়া নির্মলা ও ললিতার কাছে বসিয়া বলিল–বাঃ,

ভারি ভাল লাগছে কিন্তুক; চারিদিক নিকানে, তোমর সব স্নান করেছ, লালপেড়ে কাপড় পরেছ—

হাসিয়া নির্মলা বলিল—আজ যে লক্ষ্মীপুজো গো দাদা!

—লক্ষ্মীপূজো?

—হ্যাঁ। পূর্ণিমা বেরস্পতিবার, আমাদের বারমেসে লক্ষ্মীপূজো আজ।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। এতদিন মেলামেশা করিয়াও এ কথাটা সে জানিত না। ইহাদেরও ধর্মকর্ম আছে। সে প্রশ্ন করিল—কখন হবে লক্ষ্মীপূজো?

—সেই সন্ধ্যেবেলায়। আজ তোমার পালা আরম্ভ হতে সেই ল'টার আগে লয়।

প্রৌঢ়া বলিল—বাবা আমার ভক্তিমন লোক। ভাল লোক।

ললিত বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—লোক ভাল, কিন্তু পাল্লা মোগলের। খানা—

প্রৌঢ়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ।

বসন্ত আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একটি গ্লাস। গ্লাসটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—লাও।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি?

মুখ মচকাইয়া বসন বলিল—মদ লয়, ধর!

নিতাই গ্লাসটি লইয়া দেখিল—সদ্য প্রস্তুত ধূমায়িত চা। ললিত হাসিয়া বলিল—বুঝে-মুঝে খেও ভাই জামাই; বশীকরণের ওষুধ দিয়েছে।

বসন্ত চলিয়া যাইতেছিল, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আগুন পোড়ারমুখে।

নিতাই হাসিয়া কথাটা নিজের গায়ে লইয়া বলিল—তাই দাও ভাই, কয়লার ময়লা ছুটে যাক। আগুনের পারা বরণ হোক আমার। জান তো?

"আগুনের পরশ পেলে কালো কয়লা রাঙা বরণ।"

ললিত খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—যাও কেনে, আগুনের শীষ তো জ্বলছেই, গায়ে গায়ে পরশ নিয়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এস।

বসন্তের চোখে ছুরির ধার খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে সে হাসিয়া বলিল—মদ জ্বলে দেখেছিস? বলিয়া নিজের দেহখানা দেখাইয়া সে বলিল—এ হ'ল মদের আগুন। বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রির কথা; সে হাসিল। ইহার মধ্যে নিতাই বসন্তের হইয়া গিয়াছে। বসন্ত জানিয়াছে নিতাই তাহার।

মেয়েদের সেদিন সমস্ত দিন উপবাস। সে উপবাস তাহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করিল। সন্ধ্যায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই, নানা উপচারে ও ফুল, ধূপ, দীপ নানা আয়োজনে পরম ভক্তির সহিত তাহারা লক্ষ্মীপূজা করিল। পূজা শেষে প্রৌঢ়াকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিল। নিতাই অদূরেই বসিয়া ছিল। অপর পুরুষগুলি দূরে মদ্যপান করিতে বসিয়াছে। মদ খাইতে খাইতেই তাহার রাত্রির আসরের জন্য সাজসজ্জা করিতেছে। বেহালাদার বেহালার পরিচর্যায় ব্যস্ত; বার্নিশের শিশি, তার, রজন লইয়া বসিয়াছে। দোহারটা ঢুলীর সহিত তাল লইয়া তর্ক বাধাইয়াছে। হাতে তাল দিতেছে, আর বলিতেছে—এই—এই— এই ফাক। বাজনদার আপন মনেই বাজাইয়া চলিয়াছে। সে দোহারের কথা গ্রাহ্যও করিতেছে না। –

মহিষের মত লোকটা মদের ঝোঁকে বিমাইতেছে। সম্মুখে জ্বলিতেছে ধুনী। অগ্নিকুণ্ডে মোটা মোটা কাঠের চ্যালা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লাল আগুনের শিখা জ্বলিতেছে। লোকটা ঝুমুর দলের পাহারাদার। চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অদূরে মেয়েদের আসর। তাহারই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া প্রৌঢ়া ব্রতকথা বলিতেছিল।

* * *

ব্রতকথা শেষ হইল। হুলুধ্বনি দিয়া সকলে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। তারপর প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল যে যাহার আপন ঘরে। অর্থাৎ ওই খড়ের কুটরিতে। প্রৌঢ়া পুরুষদের ডাকিয়া বলিল—যাও সব, প্রসাদ লাও গা। অর্থাৎ নাও গে যাও।

নিতাই একটা গাছতলায় বসিয়া ছিল। বসন নিজের ঘরে ঢুকিবার মুখে দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল—শোন।

—আমাকে বলছ?

–হ্যাঁ।

আজ এই নিষ্ঠাবতী বসন্তর কাছে যাইতে নিতাইয়ের এতটুকু সঙ্কোচ হইল না। ঘরে ঢুকিয়া সে পরমাত্মীয়ের মত স্নেহমধুর হাসি হাসিয়া বলিল—কি বলছ বল।

বসন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ চোখ নামাইয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে বলিল—একটু প্রসাদ খাও। বলিয়াই সে পরিপাটি করিয়া ঠাঁই করিয়া একখানি পাতায় ফলমূল সন্দেশ সাজাইয়া দিল। বসনের এই নূতন রূপ দেখিয়া নিতাই মুগ্ধ হইয়া গেল; সেই বসন এমন হইতে পারে!

নিতাই আসনের উপর বসিয়া পড়িল। খাইতে খাইতে বলিল—জয়-জয়কার হোক তোমার।

বসন বসিল—এক টুকরো পেসাদ রেখো যেন।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—পেসাদ?

—হ্যাঁ, নাগরের পেসাদ খেতে হয়। সে হাসিল। বসনের মুখে এমন হাসি নিতাই কখনও দেখে নাই। সে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বসন জিনিসপত্র

গুছাইবার অজুহাতে তাহার দিকে পিছন ফিরিল। গুনগুন করিয়া সে গান করিতেছিল। নিতাই সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

'তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।'

বা! বা! বা! এমন গান! নিতাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

'কহে চণ্ডীদাস—'

—কি? কি? বসন! চণ্ডীদাস কি?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বসন বলিল—মহাজনের গান—চণ্ডীদাসের পদ যে।

—চণ্ডীদাসের পদ তুমি জান?

—জানি। বসন্ত-হাসিল।

—আমাদের গানের খাতায় কত পদ লেখা আছে।

কবি – ১৫

রাত্রি নয়টার পর দুই দলে পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের গান, মহাজনের পদ নাই। আকাশ আর পাতাল। রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মেলার নৈশ-আনন্দসন্ধানী মানুষের জনতার মধ্যে নগ্ন জীবনের প্রমত্ত তৃষ্ণার গান। বক্ষোভাণ্ডের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন স-ফেন মদ্যরসে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম আসর পাইয়াছিল বিপক্ষ দল। সে-দলের কবিয়ালটি রঙ-তামাশায় দক্ষ লোক। আসরে নামিয়াই সে নিজে হইল বৃন্দে দূতী–নিতাইকে করিল কৃষ্ণ; পালা ধরিল মানের। অভিমানিনী নায়িকার দূতীরূপে সে গানে কৃষ্ণকে গালাগালি আরম্ভ করিল। ধূয়া ধরিল—

"কা-দা জা-মের বো-দা–কষের রসে ওলো মজেছে কালা,
আমের গায়ে মিছে— ধরিল রঙ—মিছে সুবাস ঢালা।
চন্দ্রাবলী কাদা জাম—
রাধে আমার পাকা আম—"

তাহার পরেই সে আরম্ভ করিল খেউড়। চন্দ্রাবলীর রূপ গুণ কাদা জামের সহিত তুলনা উপলক্ষ্য করিয়া সে বসনের রূপ-গুণের অশ্লীল বিকৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তবে লোকটার ছন্দে দখল আছে, আসরটাকে অশ্লীল রসে মাতাল করিয়া তুলিল। এ দলের পুরানো কবিয়াল বসন্তের চড় খাইয়া যে দল ত্যাগ করিয়াছে, সেই লোকটাই বসন্তের প্রতিটি দোষ ও খুতের সংবাদ ওই দলের কবিয়ালকে দিয়াছে। কবিয়ালটা বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া চন্দ্রাবলীর খেউড় গাহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করিল বিপক্ষ দলের মেয়েগুলি। তাহারা পর্যন্ত বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া নাচিল।

নিতাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই খেউড়ের আসরে তাহার গান জমিবে না, জমাইতে সে পারিবে না, খেউড় তাহার যেন আসে না। মুখে যেন বাধে। কিন্তু শঙ্কা তাহার নিজের পরাজয়ের জন্য নয়। সে বসন্তর কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। যে মেয়ে বসন্ত! একদণ্ডে সে আগুন হুইয়া উঠে। আসরেই সে একটা কাণ্ড না করিয়া বসে! বার বার সে বসন্তর মুখের দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু এই পাল্লার ক্ষেত্রে আশ্চর্য ধৈর্য বসন্তের; চুপ করিয়াই বসন্ত বসিয়া আছে—যতবার নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলিল, ততবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে নিতাইয়ের ভুল হইল না, হাসিয়া বসন্ত ইঙ্গিতে বলিতে চাহিতেছিল—শুনছ? এর শোধ দিতে হবে; নিতাইয়ের মনে পড়িল গতরাত্রের কয়টি কথা, বসন্ত তাহাকে প্রথম সম্ভাষণেই বলিয়াছে—কয়লা-মানিক লয়, তুমি আমার কালোমাণিক। আমার ছিদ্র কুম্ভে জল রেখেছ, আমার মান রেখেছ তুমি।

বসন্তকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে। নাচের আসরের সাজসজ্জা করিবার তাহার অবকাশ হয় নাই; এলোচুর্ণই পিঠের উপর পড়িয়া আছে, লালপেড়ে তসরের শাড়ীখানিই সে একটু আঁটসাট করিয়া পরিয়াছে; সকলের চেয়ে ভাল লাগিতেছে তাহার চোখের সুস্থ দৃষ্টি। মেয়েরা আজ কেহই মদ খায় নাই, সেও খায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য! বসনের চোখের দৃষ্টিই সকলের দৃষ্টির চেয়ে সাদা মনে হইতেছে। অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের! চোখে মদের নেশার আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মতো রাঙা এবং ধারালো হইয়া উঠে। আবার সুস্থ

বসন্তের চোখ দেখিয়া মনে হইতেছে—এ চোখ যেন রূপার কাজললতা।

বিপক্ষ দলের ওস্তাদ গান শেষ করিয়া বসিল। আশেপাশে শ্রোতার দল জমিয়াছিল, পচা মাছের বাজারে মাছির মত। পয়সা-আনি দুয়ানি-সিকি-আধুলিতে প্যালার থালাটা ততক্ষণে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে, গোটা টাকাও পড়িয়াছে দুই-তিনটা। গান শেষ

হইতেই শ্রোতার হরিবোল দিয়া উঠিল—হরি হরি বল ভাই। বিচিত্র, ইহাই উহাদের সাধুবাদ!

পাশেই সস্তা তেলেভাজা ও মাংসের দোকান—মদও বিক্রী হয় গোপনে—সেখানে আর এক দফা ভিড় জমিয়া গেল –এবং দলের দুইটা মেয়েকে লইয়া দোকানের ভিতর চেয়ার টেবিলে আসর করিয়া বসাইয়া কয়েকটি শৌখিন চাষী খাবার খাইতে বসিয়া গেল।

কপালে হাত ঠেকাইয়া মা-চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া নিতাই উঠিল। কিন্তু হাত-পা তাহার ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। গলা যেন শুকাইয়া যাইতেছে —এই এত বড় মদ্য-তৃষাতুর জনতা, ইহাদের কি দিয়া সে তৃপ্ত করিবে? অনেক ভাবিয়া সে গান ধরিল—

"মদ সে সহজ বস্তু লয়,
চোখেতে লাগায় ধাঁধাঁ—কালোকে দেখায় সাদা—
রাজা সে খানায় পড়ে রয়!"

কবিয়ালদের সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল কূটবুদ্ধি; এবং বড় শক্তি হইল গলাবাজি, অর্থাৎ জোর করিয়া আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় করিয়া গলার জোরেই কবিয়লিরা জিতিয়া যায়। বুদ্ধি করিয়া অশ্লীল রসের গালিগালাজ বাদ দিয়া নিতাই সেই চেষ্টা করিল। সে ধরিল—

"বৃন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ,
নয় আকারণ—কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।"

নতুবা ওগো মাতাল বৃন্দ, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর নিন্দা করিতে না। চন্দ্রাবলী কে? যে রাধা, সেই চন্দ্রাবলী। যে কালী, সেই কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। আগে তেঁতুল খাও, মাথায় জল দাও-নেশা ছুটাও, তারপর চন্দ্রাবলীর দিকে চাও। দেখিবে চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা, রাধার মধ্যেই চন্দ্রাবলী। রাধাতত্ত্বের মানের পালার দশ পৃষ্ঠার

দশম লাইন পড়িয়া দেখিও। তারপর সে আরম্ভ করিল—চন্দ্রাবলীর রূপবর্ণনা। অর্থাৎ বসন্তের রূপকেই সে বর্ণনা করিল। একেবারে সপ্তম স্বর্গের বস্তু করিয়া তুলিল। বসন্ত নাচিতেছিল। সুস্থ দেহমনে আজ সে বড় ভাল নাচিতেছিল –কিন্তু রূপ-যৌবন আজ কামনায় লাস্যে তীব্র ও তীক্ষ হইয়া উঠে নাই। সেটা নেশার অভাবেও বটে এবং নিতাইয়ের গানে ঐ রসের অভাবেও বটে। শুধু বসন্তের নাচই নয়, ক্রমে ক্রমে আসরটা ধীরে ধীরে ঝিমাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; জনতা কমিয়া আসিতে শুরু হইল। দুই-চারিজন যাইবার সময় বলিয়া গেল-দূর!

তাহাদের থালায় প্যালা পড়িল না বলিলেই হয়। প্রৌঢ়া কয়েকবার নিম্নস্বরে নিতাইকে বলিল—রঙ চড়াও, ওস্তাদ, রঙ চড়াও! ঢুলিদার বসন্তের কাছে গিয়া বলিল—একটুকুন হেলেছলে, চোখ একটুকুন খেলাও!

বসন্ত চোখ খেলাইবে কি, চোখ ভরিয়া তার বার বার জল আসিতেছে। হেলিয়া দুলিয়া হিরোল তুলিবে কি, দেহ যেন অবসাদের ভারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আসরে নামিয়া শ্রোতাদের এমন অবহেলা তাহাকে বোধ করি কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইয়ের গানের তত্ত্বকথার বিরক্ত হইয় তাহার দিকে লোকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। নিতাইয়ের ধর্মকথার জ'লো রসে তাহার নাচে রঙ ধরিতেছে না। সর্বোপরি দলের পরাজয়টাই তাহার কাছে মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী রূপ-পসারিনী তাহারা, দেহ ও রূপ লইয়া তাহাদের অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে শুধু অহঙ্কারই—জীবনের মর্যাদা নয়। কারণ তাহাদের দেহ ও রূপের অহঙ্কারকে পুরুষের আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ এবং রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগই করে, চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মত ফেলিয়া দিয়া যায়। তাই ইহাদের জীবনের সকল মর্যাদা পুঞ্জীভূত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে

নৃত্যগীতের অহঙ্কারটুকুকে আশ্রয় করিয়া। ওই দুইটা বস্তুই যে তাহদের জীবনের একমাত্র সত্য—সে কথা তাহারা বুঝে। তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, ভাল নাচগানের যে কদর—তাহা মেকী নয়। হাজার মানুষ চুপ করিয়া শোনে তাহদের গান, বিস্ফোরিত মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখে তাহদের রূপের মধ্যে বিচিত্র এক অপরূপের অভিব্যক্তি। মরুভূমির মত জীবনের ওইটুকুই তাহাদের একমাত্র শ্যামল সজল আশ্রয়কুঞ্জ। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধেই তাহারা অগণ্য শ্রোতার উপস্থিতিকে নগণ্য করিয়া মাথা তুলিয়া নাচে, গায়। সমাজে গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকের সঙ্গেও অকুণ্ঠিত দাবিতে গানের তাল মান লইয়া তর্ক করে। খেউড় কবির দলের অপরিহার্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউড় না জানিকে এ দলে গাওনা করার অধিকারই হয় না। মাসী বলে—কত বড় বড় মুনি-ঋষি কামশাস্ত্রে হার মানিয়া —শেষ তাহদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। তাহা হইলে খেউড় ছোট জিনিস কিসে? আজ দলের পরাজয়ের সঙ্গে—সেই মর্যাদা ধূলায় লুটাইয় পড়িতেছে বলিয়া অবসাদে বসন্ত যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জিতিতে হইলে কবিয়াল ও নাচওয়ালী দুজনকে একসঙ্গে জিতিতে হইবে। একজন জিতিবে, একজন হারিবে—তাহা হয় না।

কোনমতে গান শেষ করিয়া পরাজয়ের বোঝার ভারে মাথা হেঁট করিয়া নিতাই বসিল। ঢোলের বাজনায় তেহাই পড়িল—বসন্তও নাচ শেষ করিল। নাচ শেষ করিয়া আসরে সে আর বসিল না; শ্রান্ত অথচ ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। প্রৌঢ়ী দলনেত্রী তাহার দিকে চাহিয়া কেবল প্রশ্নের সুরে ডাকিয়া বলিল—বসন?

বসন ফিরিয়া দাঁড়াইল—বলিল শরীর খারাপ করছে, মাসী। প্রৌঢ়া হাসিল, বলিল—দেখ না, দোসরা আসরে বাবা আমার কি করে! বসন্ত নিতাইয়ের দিকে একবার ফিরিয়া

চাহিল। নিতাই দেখিল—সে চোখে তাহার ক্ষুরের ধার। পরমুহূর্তেই বসন্ত বাহির হইয়া গেল।

প্রৌঢ়া কিন্তু অদ্ভূত। সে যেন এতটুকু বিচলিত হয় নাই। দলের বেহালাদারকে নির্বিকার ভাবেই বলিল—প্যালার থালাটা আন।

লোকটি প্যালার থালা অনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—কয়েকটা দোয়ানীর বেশী আর পড়ে নাই। সবসুদ্ধ দু টাকাও হইবে না।

প্রৌঢ়া বলিল–গুনে দেখ কত আছে। তারপর সে পানের বাটাটা টানিয়া লইয়া বলিল—মেলার আসর, রঙ-তামাসা-খেউড়ী-খোরাকী লোকেরই ভিড়! নইলে বাবার গানে আর ওই ফচকে ছোড়ার গানে? গান তো বোঝ তুমি, তুমিই বল কেনে?

বেহালাদার বলিল—ত বটে। তবে রঙেরই আসর যখন, তখন না গাইলে হবে কেনে বল? রঙের গানও তো গান।

প্রৌঢ়াকে স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল—একশো বার। রঙ ছাড়া গান না গান ছাড়া রঙ! একটা মোট পান মুখে পুরিয়া সে আবার বলিল—ওস্তাদের মার শেষ আসরে। দেখ না, বাবা আমার কি করেই দেখ না!

নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ভবিতেছিল।

নির্মলা, ললিতা মেয়ে দুইটির মুখেও হাসি নাই, পরস্পরে তাহারা মুখভার করিয়াই কথা বলিতেছে—বোধ হয় এই হারজিতের কথাই হইতেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই মাথা হেঁট করিল। সকলের লজ্জা যেন জমিয়া জমিয়া বোঝা হইয়া তাহার মাথার উপর প্রচণ্ডভারে চাপিয়া বসিতেছে। শুধু তো লজ্জাই নয়, দুঃখেরও যে তাহার সীমা ছিল না। খেউড় যে তাহার কিছুতেই আসিতেছে না!

* * *

ওদিকে বিপক্ষ দলের ঢুলী বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল; লোকটার বাজনার মধ্যে যেন জয়ের ঘোষণা বাজিতেছে। বাজানোর ভঙ্গির মধ্যেও হাতের সদম্ভ আস্ফালন। ও-দলের কবিয়াল বোধ হয় বাহিরে ছিল—সে একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা ছড়া কাটিতে কুটিতে ছুটিয়া আসরে আসিয়া প্রবেশ করিল—

“হায়—হায়—হায়—হায় কালাচাঁদ বলে গেল কি?”

‘কুকুরী আর ময়ুরী, সিংহিনী আর শূকরী, শিমূলে আর বকুলে, কাকে আর কোকিলে, ওড়না আর নামাবলী, রাধা আর চন্দ্রাবলী—তফাৎ নাইক, একই?’ ইহার পরই সে আরম্ভ করিল অশ্লীলতম উপমা। সঙ্গে সঙ্গে আসরে যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ বহিয়া গেল। লোকে হরিবোল দিয়া উঠিল। এবার লোকটা একটু থামিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

“আ—কালাচাঁদের কালো মুখে আগুন জ্বেলে দে গো—
টিকেয় আগুন দিয়ে রাধে তামুক খেয়ে লে গো!”

অর্থহীন উপমায় যে-কোন প্রকারে কতকগুল গালিগালাজ দিয়া এবং অশ্লীল কদর্য ভাব ও উপমার অবতারণা করিয়া সে আসরটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই জমাইয়া তুলিল।

নিতাই আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ও-দলের একটা মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজেই আথর দিয়া গাহিয়া উঠিল–

“ধর ধর ধর কালাচাঁদে, পলায়ে যে যায় গো!
এক আমি ধরতে লারি সবাই মিলে আয় গো!”

আসরে একটা তুমুল হাসির রোল পড়িয়া গেল। নিতাই কিন্তু তাহাতেও রাগ করিল না। সে হাসিমুখেই মেয়েটির এই তীক্ষ উপস্থিত বুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রশংসা করিয়া বলিল—ভাল, ভাল! ভাল বলেছ তুমি!

* * *

আসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিতাই ঝুমুর দলের আস্তানায় বসন্তের খুপরির দুয়ারে দাঁড়াইল। খড়ের আগড়টা আধখোলা অবস্থায় রহিয়াছে। ভিতরে একটা লণ্ঠন মৃদুশিখায় জ্বলিতেছে। বাহিরে খোলা আকাশের তলায় উঠানে বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে সেই একটা অগ্নিকুণ্ডই উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতেছে এবং তাহারই সম্মুখে মহিষের মত প্রচণ্ডকায় লোকটা পূর্ণ উদর হিংস্র কোন পশুর মত বাসা আগলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। পদশব্দে সে ফিরিয়া চাহিল, এবং নিতাইকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার মুখ ফিরাইয়া ঝিমাইতে লাগিল। নিতাই বসন্তের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল, ঢুকিতে সাহস করিল না। দেহ-ব্যবসায়িনীর ঘর! সে বাহির হইতেই ডাকিল—বসন?

—কে? ঘরের ভিতর হইতে বিরক্তিভর কণ্ঠস্বরে বসন্ত উত্তর দিল।

—আমি নিতাই। রসিকতা করিয়া ‘কয়লা-মণিক বলিতে তাহার মন উঠিল না।

—কি?

—ভেতরে যাব?

—কি দরকার?

—একটু’ন কাজ আছে।

মুহূর্তে বসন্ত নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর অস্থির ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর হইতে নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া ঝলকিয়া উঠিল, ঠিক খাপ হইতে একটানে বাহির হইয়া আসা তলোয়ারের মত। বাহিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোর রাঙা আভা পূর্ণ দীপ্তিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ঝলকিয়া উঠিল। নিতাই দেখিয়া শঙ্কিত হইল। আজিকার অপরাহ্নের পূজারিণী, শান্ত স্নিগ্ধ নম্র সে বসন্ত আর নাই, এ সেই

পুরানো চেনা বসন্ত। তাহার সর্বাঙ্গে ক্ষুরের ধার ঝলসিয়া উঠিয়াছে। রাঙা আলোর প্রতিচ্ছটায় সে যেন রক্তাক্ত। সে ফিরিয়া আসিয়া মদ খাইয়াছে। চোখে ছটা বাজিতেছে।

বসন্ত বলিল—আমি যাব না। আমি যাব না। কেনে এসেছ তুমি?

নিতাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ কঠিনতম আক্রোশে বসন্ত তাহার গালে সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিল, বলিল —ন্যাকার মত আমার সামনে তবু দাঁড়িয়ে! কেনে, কেনে, কেনে? প্রশ্নই করিল, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করিল না। মুহূর্তে যে অধীর অস্থির গতিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল সেই গতিতেই সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এই আঘাত করিয়াও যেন তাহার ক্ষোভ মেটে নাই। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সে নিজের কপালে কয়ট চাপড় মারিল; তাহার শব্দটাই সে কথা বলিয়া দিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সেই আগলদার লোকটার কাছে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—পালোয়ান!

লোকটা দলের মধ্যে পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। নেশায় ভাম লোকটা রাঙা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিল মাত্র, কথার উত্তর দিল না। সম্মুখের কয়টা দাঁত শুধু বাহির হইয়া পড়িল।

নিতাই বলিল—তোমার কাছে মাল আছে? মদ?

নিরুত্তর লোকটা এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। বোতলটা হাতে করিয়াও নিতাই একবার ভাবিল—তারপর এক নিঃশ্বাসে খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। বুকের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া গেল; সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চিৎকার করিয়া উঠিল; দুর্নমনীয় বমির আবেগে—সমস্ত দেহটা মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে

আবেগ সে রোধ করিল। ধীরে ধীরে আবেগটা যখন নিঃশেষিত হইল তখন একটা দুর্দান্ত অধীরতাময় চঞ্চল অমুভূতি তাহার ভিতরে সদ্য জাগিয়া উঠতেছে। সে তখন আর এক মানুষ হইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও আর এক পৃথিবী হইয়া যাইতেছে। আশ্চর্য! সব যেন দুলিতেছে; ভিতরটা জ্বলিতেছে; দুনিয়া যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে! এখন সে সব পারে। সে-কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি মদের স্পর্শে—জলের পর্শে মহামারীর বীজাণুর মত, পুরাণের রক্তবীজ হইয়া অধীর চঞ্চলতায় জাগিয়া উঠিতেছে।

আবার সে খানিকটা মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

দ্বিতীয়বার আসরে যখন সে প্রবেশ করিল তখন তাহার রূপটাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। সে আর এক মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। নীতিকথাগুলো ভুলিয়াছে, পাপপুণ্য লইয়া হিসাব-নিকাশ ভূলিয়াছে, হা-হা করিয়া অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হইবে না কেন? সামাজিক জীবনে মানুষের যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু কদর্য, যাহা কিছু উলঙ্গ অশ্লীল তাহাই আবর্জনা-স্তুপের মত যেখানে জমা হয়, সেই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহার জন্ম। দারিদ্র্য ও কঠিন দাসত্বের অনুশাসনের গণ্ডীর ভিতর বঙ্গ যুগ যাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, সে তাহাদেরই সন্তান। মা সেখানে অশ্লীল গালিগালাজে শাসন করে, উচ্ছ্বসিত স্নেহে অশ্লীল কথায় আদর করে, সন্তানকে সকৌতুকে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। অশ্লীলতা, কদর্য ভাষা, ভাব নিতাইয়ের অজানা নয়। কিন্তু জীবনে সামান্য শিক্ষা এবং কবিয়ালির চর্চা করিয়া সে-সব সে এতদিন ভুলিতে চাহিয়াছিল। সে-সবের উপর একটা অরুচি, একটা ঘৃণা তাহাব জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজ বসন্তের কাছে আঘাত খাইরা সেই আঘাতে ক্ষোভে নির্জলা মদ গিলিয়া সে উন্মত্ত হইয়া গেল। মদের নেশার মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভে অর্জন-করা সব কিছুকে ভুলিয়া সে উদগীরণ করিতে আরম্ভ করিল জান্তব

অশ্লীলতাকে। ছন্দ এবং সুরে তাহার অধিকার ছিল, কণ্ঠস্বর তাহার অতি সুমিষ্ট; দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল।

আসরে ঢুকিবার মুখেই সে কবিয়ালসুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে দোহারদে ডাকিয়া কহিল—দোহারগণ!

সবিস্ময়ে সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ওই অপ্রস্তুত হওয়ার পর নিতাই যে আবার ফিরিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। তাহারা সাড়া দিতে ভুলিয়া গেল।

বুলিল না মাসী। সে চতুর। সে মুহূর্তে সাড়া দিল—বল ওস্তাদ!

নিতাই বলিল—

ধর্ম্ম কথায় যখন মন ওঠে না—বসে না—তখন দিতে হয় গাল!

ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল।

যখন ঠাণ্ডা জলে গলে না ডাল—

তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জ্বাল!

ওদিকের কবিয়ালট রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল—বলিহারি কালাচাঁদ, টিকেয় আগুন দিয়েছ লাগছে; তেতেছ!

নিতাই বলিল—এমন তেমন তাতা নয় বিন্দে, জ্বলছি! সেই জ্বালাতে তোকে বলছি—শোন! সহজে তো তুই শুনবি না -দোহারগণ!

-হাঁ—হাঁ!

নিতাই শুরু করিল—

বুড়ী দূতী নেড় কুত্তি জুত্তি ছাড়া নয় সায়েস্তা

ছড়ির বাড়ি মারলে ভাবে একি আমার সুখ অবস্থা!

বুড়ীকে ছড়ি মেরে কিছু হয় নাই। এবার লাগাও জুতি—লাগাও পঁয়জার! তারপর প্রৌঢ় লোকটার মুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—বুড়ীর কোঁচকা মুখে টেরীর বাহার দেখুন, তেলকের বাহার দেখুন—

এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোচক মুখে রসকলি কাটিস নে!

রসের ভিয়েন জানিস নেকে গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস নে!

তারপর তার মুখের কাছে আঙুল নাড়িয়া বলিল—

ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লাল চাটিস নে!

আসরে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর জমিয়া গিয়াছে। সে নিজেও সেই জমজমাটের মধ্যে হারাইয়া গিয়া মিশিয়া একাকার হঠয়া গিয়াছে। সে গান ধরিল—

বুড়ী মরে না—মরণ নাই!

হায়—হায়!

গানের সঙ্গে সে নাচিতে লাগিল।

বুড়ী খানকী নেড়ী কুটনী মরে নাই, মরে নাই

ও হ্যায়, তার মরণ নাই—মরণ নাই!

তাহার পর একটার পর একটা অশ্লীল বিশেষণ তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতাদের অট্টহাসিতে রাত্রিটা যেন কাঁপিতেছে, সমস্ত আসর এবং আলো তাহার চোখের সম্মুখে দুলিতেছে। একটা মানুষ দুইটা বলিয়া বোধ হইতেছে। ওই তো দুইটা ললিতা; ওই তো বাজাইতেছে দুইটা বায়েন; মাসীও দুইটা হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অকস্মাৎ একসময়ে সে দেখিল—বসন্তও দুইটা হইয়া নাচিতেছে! বাহবা-বাহবা–সে কি নাচ। বসন্ত কখন আসিয়া আসরে নামিয়া নাচিতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

চরমতম অশ্লীলতায় আসরটাকে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন করিয়া দিয়া টলিতে টলিতে সে বসিল। এবার তাহদের প্যালার থালাট ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এবার বিপুল কলরবে হরিধ্বনি উঠিল।

প্রৌঢ়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—বাবা আমার! এই দেখ, মাল না খেলে কি মেলা-খেলায় গান হয়? যে বিয়ের যে মন্তর! বসন, বাবাকে আমার আর এক পাত্য দে। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

বসন! এতক্ষণে নিতাই স্থির দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

নিতাইয়ের চোখ রক্তমাখ, পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবী জুলিতেছে; শঙ্কা, সঙ্কোচ, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে জয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাসে। বসন্ত, অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। সে চোখে তাহার কামনা ঝরিতেছে। নিতাইয়ের বুকেও কামনা সাড়া দিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য বসন্ত! সে হাসিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে নিতাইয়ের গালে চড় মারিয়া যে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে, তাহার জন্য এখন সে একবিন্দু লজ্জাও বোধ করিতেছে না; বরং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার চোখ-মুখ ঝলমল করিতেছে। নিতাইয়ের গরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

—দাও, পত্য দাও। নিতাই হাসিল।

—এস, ঘরে এস, ভাল মদ আছে—বেলাতী। বসন্ত তাহার হাত ধরিয়া গরবিনীর মত তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ঘরে কাচের গেলাসে বিলাতী মদের সঙ্গে জল মিশাইয়া বসন্ত নিতাইকে দিল। নিঃশব্দে গেলাসটি শেষ করিয়া নিতাই বসনের দিকে চাহিয়া হাসিল। এ বসন্ত যেন নূতন বসন্ত; নিতাইয়ের নেশার ঘোর ঝলমল করিয়া উঠিল।

সে আবার হাত বাড়াইল। তাহার তৃষ্ণা জাগিয়াছে। বলিল-দাও তে, আমাকে আর এক গেলাস দাও।

বসন্ত হাসিয়া আবার অল্প একটু তাহাকে দিল। সেটুকুও পান করিয়া নিতাই বলিল—দাঁড়াও, তোমাকে একটুকুন দেখি।

বসন হাসিয়া বলিল—না, চল আসরে চল।

—না। দাঁড়াও। সে বসন্তর হাত চাপিয়া ধরিল।

বসন্ত দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী; পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয়—লজ্জ তাহাদের থাকে না, থাকিলে চলে না। পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায় হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে। বসন্ত তাহদের মধ্যেও আবার লজ্জাহীন। সেই বসন্তের মুখ তবু আজ রাঙা হইয়া উঠিল।

এবং আরও আশ্চর্যের কথা; মুহূর্ত পরেই তাহার চোখে জল দেখা দিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। নিতাই সবিস্ময়ে বলিল—তুমি কাঁদছ কেনে?

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বসন্ত বলিল—না, আমাকে তুমি দেখো না। এক পা সে পিছাইয়াও গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুই পা আগাইয়া আসিয়া নিতাই বলিল—কেন?

বসন্ত বলিল—আমার কাশরোগ আছে। মধ্যে মধ্যে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জ্বর হয় দেখ না? টপ টপ করিয়া বসন্তের চোখ হইতে এবার জল ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল।

—হোক। নিতাইয়ের বুকখানা তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে; উচ্ছৃঙ্খল বর্বর, বীরবংশীর সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সে রূপ ঠাকুরঝি কখনও সহ করিতে পারিত না। কিন্তু বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে, তার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মামুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্তি সহ করিবার সাহস আছে। নিতাইকে অগ্রসর হইতে

দেখিয়া বিষন্ন দৃষ্টিতে প্রসন্ন মুখে সে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এবং নিতাইয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া পিষ্ট হইতে হইতে সে মৃদুস্বরে গাহিল :

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাৰে কে!
তেজি' জাতি কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে'।"

নিতাইয়ের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। গান শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—এ কি গান! তাহার নেশা যেন ফিক হইয়া যাইতেছে। এ কি মুর। তাহার স্খলিত হাত দুইখানা বসন্ত নিজেই নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া আবার গাহিল—

"পরাণ-বঁধুয়া তুমি,
তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি!"

অপূর্ব! অপূর্ব লাগিল নিতাইয়ের; চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। ধরা গলার সে প্রশ্ন করিল—কোথা শিখলে এ গান? এ কোন কবিয়ালের গান?

হাসিয়া বসন্ত দুইটি হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া গাহিল—

"যে হোল সে হোল—সব ক্ষমা কর বলিয়া ধরিল পায়,
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়।"

গান শেষ করিয়া সে বলিল—মহাজনের পদ গো!

অধীর মত্ততার মধ্যেও নিতাইয়ের অন্যরের কবিয়াল জাগিয়া উঠিল। সে বসন্তের দুই হাত নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া ধরিয়া বলিল—আমাকে শেখাবে?

বসন্ত আবেগভরে নিতাইয়ের মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল।

কবি – ১৬

সকালে নিতাই যখন উঠিল, তখন তাহার জিভের ডগা হইতে বুকের ভিতর পর্যন্ত তেতো হইয়া উঠিয়াছে; কপাল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বালা করিতেছে। নিজের নিশ্বাসেরই একটা বীভৎস দুর্গন্ধ নিজের নাকে আসিয়া ঢুকিতেছে। সর্বাঙ্গ যেন ক্লেদাক্ত উত্তাপে উত্তপ্ত, বিষে বিষাক্ত! শীতের প্রারম্ভে—তাহার উপর সকালবেলা—এই শীতের সকালেও তাহার মৃদু-মৃত্যু ঘাম হইতেছে। মাথার মধ্যে অত্যন্ত রূঢ় একটা যন্ত্রণা। সমস্ত চেতনা যেন গ্রীষ্মদ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত মাঠের ধুলায় আচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর-এবং মাঠের মরীচিকার মত কম্পমান। পেট জ্বলিতেছে, বুক জ্বলিতেছে, ভিতরটা শুকাইয় যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে।

বসন্ত ঘরের মধ্যেই ছিল, সে আপন মনে অল্প কাজ করিতেছিল। কয়েকদিনের বসবাসের জন্য তৈরী খড়ের ঘর, সেই ঘর সে গোছগাছ করিয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইতে অকস্মাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে উঠিয়াই ঘরকন্নার কাজগুলা যেন তাহাকে দুই হাত মেলিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। মেলায় সে কয়েকখানা ছবি কিনিয়াছিল, নূতন আমলের সাধারণ দেশীয় লঘুরুচি শিল্পীদের হাতের বিলাতী বর্ণসমাবেশে আঁকা—জার্মানিতে ছাপা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ছবি। দুখানা উলঙ্গ মেমসাহেবের ছবি। ছবিগুলি সে ঘরের বাঁশের খোঁটার গায়ে টাঙাইতেছিল। নিতাইকে উঠিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল—উঠলে?

ওই হাসি এবং এই প্রশ্নেই নিতাইয়ের আজ রাগ হইয় গেল—রাঙা চোখে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তিক্ত-কণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় বসন্ত প্রথমটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিল, বলিল—শরীর খারাপ হয়েছে, না? হবে না? প্রথম দিনেই যে মদটা খেলে! মুখ হাত ধোও, চা খাও, খেয়ে চান কর। কাঁচা চা ক'রে দি। তুমি সেদিন দিয়েছিলে আমাকে, ভারি উপকার হয়েছিল।

নিতাই কথার উত্তর দিল না, টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পায়ের তলার মাটি এখনও যেন কাঁপিতেছে।

প্রাত:কৃত্য সারিয়া সে যখন ফিরিল, তখন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। দীঘির ঘাটে মাথার যন্ত্রণা উপশমের জন্য বার বার মাথা ধুইয়া ফেলিয়াছিল। ভিজা চুল হইতে তাহার সর্বাঙ্গে জলধারা ঝরিতেছিল, সে ধারাগুলি পড়িতেছিল যেন উত্তপ্ত লোহার পাত্রে জলবিন্দুর মত। বসন্ত তখন একগাদা কাপড় লইয়া কাচিবার জন্য বাহির হইতেছিল। নিতাইকে দেখিয়া সে কাপড় রাখিয়া তাড়াতাড়ি চা করিয়া দিল। লেবুর রস দিয়া কাঁচা চা নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল, চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া সে আবার ঘরের মেঝের বিছানো খড়ের উপরেই শুইয়া পড়িল। শুইবামাত্র নিতাই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক ঘুম নয়, অশান্ত তন্দ্র। তাহারই মধ্যে নিতাই শুনিতে পাইল বসন্ত বলিতেছে—খড়ের ওপরেই শুলে?

সে চোখ মেলিয়া চাহিল। একগাদা ভিজা কাচ কাপড় কাধে ফেলিয়া আপাদমস্তক-সিক্ত বসন্ত দ্বারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

—ওঠ, একটা মাছুর পেতে একটা বালিশ দি। অ ভাই নির্মলা, তোর দাদাকে একটা মাদুর আর.একটা বালিশ দিয়ে যা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে।

নিতাই চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—না।

বসন্ত এবার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া শাসনের সুরে বলিল—না নয়, ওঠ, ওঠ।

নিতাই এবার উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বসন্তর দিকে চাহিল।

—কই? দাদা কই? বলিয়া হাসিমুখে নির্মলা মেয়েটি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সযত্নে মাদুর ও বালিশ পাতিয়া দিতে দিতে বলিল—ওঃ, দাদা আমার আচ্ছা দাদা! যে গান কাল গেয়েছে! নিতাইয়ের এতক্ষণে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক খেলিয়া গেল।

এই মুহূর্তে ই ওপাশের খড়ের ঘর হইতে দলের নেত্রী প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিল-বাবা আমার উঠেছে? পরমুহূর্তেই সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—ও মা-গো। তোর কি কাণ্ড বসন? এই ক'দিন জর ছেড়েছে, আর আজ এই সকালেই তু এমনি করে জল ঘাঁটছিল! মৃদু হাসিয়া বসন্ত বলিল—সব কাচতে হ'ল মাসী। এইবার চান করব।

—কাচবার কি দরকার ছিল?

নির্মল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—পিরীতি সামান্য নয় মাসী। দাদা কাল বমি ক'রে বিছানা-পত্য ভাসিয়ে দিয়েছে।

প্রৌঢ়াও এবার মৃদু হাসিল, বসন্তকে বলিল—যা যা, ভিজে কাপড় রেখে চান করে আয়। কাপড় ছেড়ে বরং ও-গুলো মেলে দিবি।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল—আমি বমি করেছি?

নির্মল আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘাড় হেঁট করিয়া নিতাই ভাবিতেছিল—ঘরের এই দুর্গন্ধ তাহা হইলে তাহারই বমির দুর্গন্ধ! অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গে ওই বমির ক্লেদ লাগিয়া আছে। সেই গন্ধই

নিশ্বাসের সঙ্গে তাহার ভিতরটাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে! নিজের অঙ্গের ক্লেদ এইবার এক মুহূর্তে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

—মাথা ধরেছে, লয় গো দাদা? তুমি শোও, আমি খানিক মাথা টিপে দি! নির্মল তাহার কপালে হাত দিল। বড় ঠাণ্ডা আর নরম নির্মলার হাতখানি। কপাল যেন জুড়াইয়া গেল। ভারি আরাম বোধ হইতেছে। কিন্তু নিতাই স্নান না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—না চান করব আমি।

বসন্ত কাপড়গুলি রাখিতেছিল, সে বলিল—নির্মলা, ওই দেখ, 'বাসকো'র পাশে ফুলেল তেলের বোতল রয়েছে, দে তো ভাই বার ক'রে। তারপর সে নিতাইকে বলিল—বেশ ভাল ক'রে তেল মাখো। দেহ ঠাণ্ডা হবে, শরীলের আরাম পাবে। আর সাবান লাও তো তাই লাও!

—না। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছে তাহার জলে ডুবিয়া মরিতে! চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন বসন্ত স্নান করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া বাক্স লইয়া কিছু করিতেছিল। নিতাই ঘরে ঢুকিতেই সে হাসিয়া বলিল-আজ কেমন সাজব, তা দেখবে। ওই দেখ, আয়না আছে, চিরুনি আছে, স্নো আছে, মুখে লাও খানিক।

স্নান করিয়া নিতাই সুস্থ হইয়াছে বটে কিন্তু মনের অশান্তি ইতিমধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। ছি! এ সে করিয়াছে কি! ছি! ছি! ছি! স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে সে সংকল্প করিয়া আসিয়াছে, আজই সে পলাইয়া যাইবে। ইহারা যাইতে দিবে না, সুতরাং পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। জিনিসপত্র পড়িয়া থাক, 'বাজার ঘুরিয়া আসি' বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে। অন্য জিনিসপত্রের জন্য দুঃখ নাই। কিই বা জিনিসপত্র! কয়েকখান কাপড় দুইটা জামা একটা কম্বল, দুইটা কাঁথা বালিশ। দুঃখ কেবল তাহার

দপ্তরটির জন্য। দপ্তর তো তাহার এখন নেহাৎ ছোটটি নয় যে গায়ের জোরে আলোয়ানের আড়াল দিয়া বগলে পুরিয়া লইয়া পালাইবে। রামায়ণ, মহাভারত এবং আরও অনেক পুরাণ লইয়া তাহার দপ্তরটা অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। মেলায়, বাজারে—যেখানে সে গিয়াছে—দুই-একখানা করিয়া বই কিনিয়াছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জার গানত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মনসার ভাসান, চণ্ডীমাহাত্ম্য, সত্যপীরের গান, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল—অনেক বই সে কিনিয়াছে। বাবুদের পাড়ায় ছেঁড়া পাতা কুড়াইয়া পড়িয়া ভাল লাগিলে সংগ্রহ করা তাহার একটা রোগ ছিল। সেগুলিও আছে। বাবুদের থিয়েটারের আশপাশ ঘুরিয়া কয়েকখানা আদি-অন্তহীন নাটকও তাহার সংগ্রহে আছে। এ ছাড়া নিজের লেখা গানের খাতা, সেও যে এখন অনেক হইয়াছে—সব গানই সে এখন খাতায় লিখিয়া রাখে।

একখানা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া বসন্ত বলিল—উলঙ্গবাহার শাড়ী। এই কাপড় আজ পরব।

কথাটার ইঙ্গিত নিতাই বুঝিল। অর্থাৎ বসন্ত আজ প্রায় নগ্নরূপে নৃত্য করিবে। সে শিহরিয়া উঠিল।

বসন্ত বলিল—দেখব আজ কার জিত হয়, তোমার গানের, না আমার নাচের।

নিতাই আয়না-চিরুনিটা রাখিয়া দিয়া জামা পরিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্তে সে দ্বিধাশূন্য হইয়াছে, থাক তাহার দপ্তর পড়িয়া—সে চলিয়া যাইবে। এখানে সে থাকিতে পারিবে না।

—জামা পড়ছ যে? যাবে কোথা?

–এই আসি।

বসন্ত নিতাইয়ের আকস্মিক ব্যস্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল—মানে?

—এই একটুকুন বাজার ঘুরে আসি।

—ন। এখন বাজারে যেতে হবে না। একটুকুম ঘুমিয়ে লাও। ওই দেখ খানিকট মদ ঢেলে রেখেছি, খাও, খোঁয়ারি ছেড়ে যাবে।

—না। আমি একবার মন্দিরে যাব।

—মন্দিরে?

-হ্যাঁ।

—এই বলছ বাজার, এই বলছ মন্দির। কোথা যাবে ঠিক করে বল কেনে?

—বাজারে যাব। রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও যাব!

—চল। আমিও যাব।

নিতাই বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভূত তীক্ষ দৃষ্টি–নিতাইয়ের মুখের দিকে সে চাহিয়া ছিল, হাসিয়া বলিল—কি ভাবছ বল দেখি?

নিতাই উত্তর দিল না।

বসন্ত এবার বলিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন সরছে না? লজ্জা লাগছে?

নিতাই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আকস্মিক প্রশ্নে সে চকিত হইয়া উঠিল; অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল-না—না—না। কি বলছ তুমি বসন! এস-এস।

বসন্ত বলিল—মুখ দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে আমার, তুমি যেন পালাতে পারলে বাঁচ। কে যেন তোমাকে দড়ি বেঁধে টানছে। আচ্ছা, বাইরে চল তুমি, আমি কাপড় ছেড়ে যাই।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। বসন্তর চোখের দৃষ্টি তো ছুরি নয়–সূঁচ, একেবারে বুকের ভিতর বিঁধিয়া ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পায়। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া বসন্তকে এড়াইয়া চলিয়া যাইবে সে তা-ই ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ওদিকে নির্মলা, ললিতা তাহাদের প্রিয়জন বেহালাদার ও প্রধান দোহারকে লইয়া তখন মদের আসর পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে। মহিষের মত বিরাটকায় লোকটা–প্রৌঢ়া দলনেত্রীর মনের মানুষ। লোকটা অদ্ভুত। ঠিক সেই একভাবেই বসিয়া আছে, অনাদি অনন্তর মত। উহাকে দেখিয়া নিতাই তাহার সমস্ত কথা স্মরণ না করিয়া পারে না। লোকটা কথাবার্তা বলে না, আমড়ার আঁটির মত সৌষ্ঠবহীন রাঙা চোখ মেলিয়া চাহিয়াই থাকে। রাক্ষসের মত খায়; প্রায় সমস্ত দিনটাই ঘুমায়, রাত্রে আকণ্ঠ মদ গিলিয়াও ঠাঁয় জাগিয়া বসিয়া থাকে। তাহার সামনেই থাকে একটা আলো-আর একটা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। এই ভ্রাম্যমান পরিবারটির পথে-পাতা ঘরের গণ্ডির ভিতর রূপ ও দেহের খরিদ্দার যাহারা আসে তাহদের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়িয়া পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্দান্ত মাতালগুলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে দেখিয়া—অনেকটা শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ভদ্র সুবোধ হইয়া উঠে। লোকটা ভাম হইয়া একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়া আছে, নির্বিকার উদাসীনের মত। রান্নাশালার চালায় প্রৌঢ়া তেলেভাজা ভাজিতে বসিয়াছে।

ওই এক অদ্ভুত মেয়ে! মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আবার মুহূর্তে চোখ দুইটা রাঙা করিয়া এমন গম্ভীর হইয় উঠে যে, দলের সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার পরমুহূর্তেই সে হাসে। গানের ভাণ্ডার উহার পেটে। অনর্গল ছড়া, গান মুখস্থ বলিয়া যায়। গৃহস্থালি লইয়া চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত। উন্মত্ত বুনো একপাল ঘোড়াকে রাশ টানিয়া চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রথ-রথী-সারথি সবই সে একাধারে নিজে।

নির্মলা হাসিয়া ডাকিল—এস গো দাদা, গরীব বুনের ঘরে একবার এস।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কি হচ্ছে তোমাদের?

—কালকে নক্ষীর বার গিয়েছে, পারণ করছি সকালে। বসন কই? সে আসছে না কেনে? মদের বোতলটা তুলিয়া দেখাইয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে নীরবে হাত দুইটি কেবল জোড় করিয়া মার্জনা চাহিল।

বেহালাদার হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাকেই ডাক। কান টানলেই মাথা আসবে।

নিতাইয়ের পিছনেই বসন্তের সকৌতুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—মাথা এখন পুণ্য করতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কানকেও যেতে হবে। তবে যদি কেটে লাও কানকে, সে আলাদা কথা!

বসন্তর কথা কয়টি নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। বাঃ, চমৎকার কথাটি বলিয়াছে বসন! খুশী হইরা নিতাই পিছন কিরিয়া দেখিল—গতকালকার ভক্তিমতী পূজারিণীর সাজে সাজিয়া বসন্ত দাঁড়াইয়া আছে। বসন্ত হাসিয়া বলিল—চল।

পথের দুইধারেই দোকানের সারি।

বসন্ত সামগ্রী কিনিল অনেক। ফলমূল মিষ্টিতে পুরা একটা টাকাই সে খরচ ফেলিল। একটা সিকি ভাঙাইয়া চার আনার আধলা লইয়া নিতাইয়ের হাতে দিয়া বলিল— পকেটে রাখ।

নিতাই আবার চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল—এ বাঁধন কেমন করিয়া কাটিয়া ফেলা যায়, সেই কথা। মন্দির হইতে ফিরিলেই তাহাকে লইয়া আবার সকলে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিবে। বসন্তও তখন আর এ বসন্ত থাকিবে না। হিংস্র দীপ্তিতে তখন বসন্ত ক্ষুরধার হইয়া উঠিবে। বসন্তের রাত্রির রূপ তাহার তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। সে ঠিক করিল, ফিরিবার পথে বসন্তকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া পথ হইতেই সে সরিয়া পড়িবে। অজুহাতের অভাব হইবে না। তাহার কোন গ্রামবাসীর সন্ধান করিবার জন্য মেলাটা ঘুরিবার একটা অজুহাত হঠাৎ তাহার মনে আসিয়া গেল, সে সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এই অবস্থায় বসন্ত আধলাগুলি তাহার হাতে দিতেই ভ্রূ তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল—কি হবে?

—ও মা গো! রাজ্যের কানা খোঁড়া মন্দিরের পথে বসে আছে। দান করব। মৃদু হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্ময়ের ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ তুমি বল দেখি?

ব্যস্ত হইয়া নিতাই অভিনয় করিয়া হাসিয়া বলিল—কিছু না!

—কিছু না?

নিতাই আবার অভিনয় করিয়া বলিল, ভাবছি তোমাকে চিনতে পারলাম না। নিতাই হাসিল।

সে অভিনয়ে বসন্ত ভূলিল, বলিল—আমার ভারি মায়া লাগে গো! আহা! কি কষ্ট বল দিকিনি কানা খোঁড়া রোগ লোকদের? বাপ রে! বলিতে বলিতে সে যেন শিহরিয়া উঠিল। নিতাই সত্যই এবার অবাক হইয়া গেল। একি! বসন্তের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিয়। সে টলমল করিতেছে!

চোখ মুছিয়া বসন্ত আবার হাসিয়া বলিল—সে হাসি বিচিত্র হাসি, এমন হাসি নিতাই জীবনে দেখে নাই—হাসিয়া বসন্ত বলিল—আমার কপালেও অনেক কষ্ট আছে গো! কাল তো তোমাকে বলেছি, আমার কাঁসির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কাসের ব্যামো! এত পান-দোক্ত খাই তো ওই জন্যে। রক্ত উঠলে লোকে বুঝতে পারবে না। আর আমিও বুঝতে পারব না। দেখলেই ভয়, না দেখলেই বেশ থাকি। দলের কেউ জানে না, জানে কেবল মাসী। কিন্তু এখনও নাচতে গাইতে পারি, চটক আছে, পাঁচটা লোক দেখে বলেই দলে রেখেছে। যেদিন পাড়ু হয়ে পড়ব, সেদিন আর রাখবে না, নেহাৎ ভাল মানুষের কাজ করে তো নোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। নইলে, যেখানে রোগ বেশী হবে, সেইখানেই ফেলে চলে যাবে, গাছতলায় মরতে হবে। জ্যাস্ততেই হয়তো শ্যালকুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

নিতাই শিহরিয়া উঠিল। বলিল—বসন।

বসন বলিল—সত্যি কথা কবিয়াল—এই আমাদের নেকন। তবে আমার নেকন আরও খারাপ। তুমি সেই ইস্টিশানে গেয়েছিলে—'ফুলেতে ধুলোতে প্রেম' –কবিয়াল, তখন ধুলোর সঙ্গে মাটির সঙ্গে প্রেম হবে আমার। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিরা থাকিরা সে আবার বলিল— দুর্ব্বো ঘাসের রসে আর কতদিন উপকার হবে।

রোজ সকালে বসন্ত দূর্বাঘাস থেতো করিয়া রস খায়। অত্যন্ত গোপনে সে এই কাজটি করে। নিয়মিত খাওয়া হয় না। তাহার অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় সম্ভব হইয়া উঠে না! মধ্যে মধ্যে প্রৌঢ়া মনে করাইয়া দেয়—বসন, সকালবেলায় দূর্ব্বোর রস থাস তো?

বসন্ত কখনও কখনও সজাগ হইয়া উঠে, কখনও বা ঠোঁট উল্টাইয়া বলে—ম'লে ফেলে দিয়ে। মাসি। ও আমি আর পারি না।

আবার কাসি বেশী হইলেই সে সভয়ে গোপনে দূর্বাঘাস সংগ্রহ করিতে ছোটে। ঘাস ছেঁচিতে ছেঁচিতে আপন মনেই কাঁদে।

মন্দিরের পথে চলিতে চলিতেই কথা হইতেছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া উঠিল। একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহাব বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল। এমন হাসিতে হাসিতে বসন্ত তাহার কাঁসির অমুখের কথাগুলো বলিল যে নিতাইয়ের মনে হইল, বসন্তের ওই ক্ষীণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোঁট দুইটির কোলে-কোলে লাল কালির কলমে টানা রেখার মত রক্তের টকটকে রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ফেলিয়া চলিয়া যাইবে গাছতলায় মরিতে হইবে। জীবন্তই হয় তো শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে!' সে ছবিগুলা যেন তাহার মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল। অগ্র-পশ্চাৎ তাহার সব ভুল হইয়া গেল। পলাইবার কথা তাহার মনে রহিল না। অজুহাতটার কখাও ভুলিয়া গেল। শুধু নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসন্তের সঙ্গে মন্দিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই বসন্ত আবার কথা বলিল—তাহার সে বিষন্ন কণ্ঠস্বর আর নাই; কৌতুকসরস কণ্ঠে মৃদু হাসিয়া বলিল—গাঁটছড়া বাঁধবে নাকি? গাঁটছড়া?

কথাটা বসন নেহাৎ ঠাট্টা করিয়াই বলিল। আশ্চর্য বসন! এইমাত্র নিজের মরণের কথা এত করিয়া বলিয়া ইহারই মধ্যে সে-সব সে ভুলিয়া বসিয়া আছে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। স্থির দৃষ্টিতে বসন্তকে কিছুক্ষণ সে দেখিল। শাণিত-ক্ষুরের মত ঝকঝকে ধারালো বসন্তের ধার ক্ষয় হইয়া একদিন টুকরা-টুকরা, হয়ত গুঁড়া হইয়া যাইবে উখায় ঘষা ইস্পাতের গুঁড়ার মত।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—দেখছ?

–হ্যাঁ!

—কি দেখছ? কেয়াফুলও শুকোয়। চোখের কোণে কালি পড়েছে!

বসন্তের মুখে তখনও হাসির রেখা। সে হাসি আশ্চর্য হাসি।

নিতাই মুখে কোন উত্তর দিল না। হাত বাড়াইয়া বসন্তের আঁচলখানি টানিয়া লইয়া নিজের চাঁদরের খুটের সঙ্গে বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

বসন্ত চমকিয়া উঠিল—ও কি করছ? সে এক বিচিত্র বেদনার্ত উত্তেজনাভরে সে আপনার কাপড়ের আঁচলখানা আকর্ষণ করিয়া বলিল—না না, না। ছি! ও আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। তুমি কি সত্যি ভাবলে নাকি?

প্রসন্ন হাসিতে নিতাইয়ের মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—গিঁট আগেই পড়ে গিয়েছে বসন। টেনো না। আমি যদি আগে মরি, তবে তুমি সেদিন খুলে নিও এ গিঁট; আর তুমি যদি আগে মর, তবে সেই দিন আমি খুলে নোব গিঁট।

বসন্তের মুখখানি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল।

ঠোঁট দুইটা, শীতশেষের পাণ্ডুর অশ্বত্থপাত উতলা বাতাসে যেমন থরথর করিয় কাঁপে, তেমনি করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার রক্তাভ সুগৌর মুখখান যেন সঙ্গে সঙ্গে সাদা হইয়া গিয়াছে। গরবিনী দর্পিতা বসন্ত যেন এক মুহূর্তে কাঙালিনী হইয়া গিয়াছে।

নিতাই এবার হাসিয়া বলিল—এস এস, আমার আর তর সইছে না। ঠাকুরের দরবারে রাগ করে না।

—রাগ? বসন্ত বলিল—আমার রাগ সইতে পারবে তো তুমি?

—পায়ে ধরে ভাঙাব। নিতাই হাসিল। –এস এস।

বাসায় ফিরিতেই একটা কলরব পড়িয়া গেল। নির্মলা-ললিতাদের মদের নেশা তখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে। ফুলের মালা গলায় গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিতাই ও বসন ফিরিবামাত্র তাহাদের দেখিয়া তাহার হলুধ্বনি দিয়া হৈ হৈ করিয়া উঠিল। গাঁটছড়াটা খুলিবার কথা নিতাই বা বসন দুইজনের কাহারও মনে হয় নাই।

নিতাই হাসিতে লাগিল। আশ্চর্য, সে লজ্জা পাইল না–কোন গ্লানিও অনুভব করিল না। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, লজ্জা পাইল বসন্ত। গাঁটছড়াবাঁধা নিতাইয়ের কাধের চাদরখানা টানিয়া লইয়া সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

কবি – ১৭

ভ্রাম্যমাণ নাচ-গানের দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায়— গ্রাম হইতে গ্রামান্যরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। কবে কোন পর্বে কোথায় কোন মেলা হয়, কোন পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হয়—সে সব ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ, পদব্রজে, গরুর গাড়িতে, ট্রেনে তারপর নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া—রাজসাহী, মালদহ, দিনাজপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাড়ি ফেরে।

প্রৌঢ়া বলে–আগে আমরা পদ্মাপারে নিচের দিকেও যেতাম। পদ্মাপারে বাঙাল দেশে আমাদের ভারি খাতির ছিল।

নির্মলা প্রশ্ন করে—পদ্মাপার তুমি গিয়েছ মাসী?

নির্মলার কথা শেষ হইতে না হইতে মাসী পদ্মাপারের গল্প বলিতে বসে। বলে—যাইনি? বাপরে, সে কি ধুম!

তারপর বেশ আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারী কাটিতে কাটিতে বলে—বাতের তাল খানিক মুলিশ করে দে দিখি; পদ্মাপারের কথা বলি শোন। .

আপসোসের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—আঃ মা, তোরা আর কি দেখলি–কি-ই বা রোজগার করলি আর কি-ই বা খেলি। সে 'দ্যাশ' কি! সোনার 'দ্যাশ'! মাটি কি! বারোমাস মা-নক্ষী যেন আঁচল পেতে বসে আছেন। সুপুরী কিনতে হয় না মা। সুপুরীর বন। যাও—কুড়িয়ে নিয়ে এস। ডাব নারিকেল—আমাদের 'দ্যাশের' তালের মতন। দু-ধারি পাটের 'ক্ষ্যাত'।

সে হাত দুইখানা দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাড়াইয়া দিয়া সুবিস্তীর্ণ পাট চাষের কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে—এক এক পাটের ব্যাপারী কি! পয়সা কত! এই বড়

বড় লৌকো। ব্যাপারীদের নজর কি, হাত দরাজ কত। প্যালা দেয় আধুলি, টাকা; সিকির কম তো লয়। আর তেমন কি খাবার সুখ। মাছই কত রকমের। ইলিশ-ভেটকি-কত মাছ মাছ—'অছল্যি' মাছ! আঃ তেমনি লঙ্কা খাবার ধুম!

ললিতা বলে—আমাদের একবার নিয়ে চল মাসী ওই দ্যশে।

মাসী বলে—মা, সি রামও নাই আর সি অযুধ্যেও নাই। সি দ্যাশে আর আমাদের সে আদরও নাই মা। সি কালে আমরা যেতাম—পালাগান গাইতাম। পদাবলীর গান—আমাদের সি কালের ওস্তাদের আবার বেশ রসান দিয়ে পালাগান 'নিকতো'—সে-সব গান আমরা গাইতাম। যে যেমন আসর আর কি! তেলক কাটতে হ'ত, গলায় কণ্ঠি পরতে হ'ত। আবার বাজারে হাটে হালফেশানী গান হ'ত। আজকাল আর পালাগান কে শোনে বল?

নইলে পালাগান নিয়েই তো ঝুমুর!

বেহালাদার মাসীর কথা শুনিতে শুনিতে বলিল—উ দ্যাশের মাঝিদের গান শুনেছ মাসী?

—শুনি নাই? ভারি মিষ্টি সুর। প্রৌঢ়া নিজের মনেই গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। বার দুয়েক ভাঁজিয়া নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উহু, আসছে না ঠিক।

বেহালাদার কি মনে করিয়া বার দুয়েক বেহালার উপর ছড়ি টানিল, প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল— হ্যাঁ হ্যাঁ! ওই বটে। কিন্তু বেহালাদার সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল।

নির্মলা সুরটি শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল, বেহালাদার থামিয়া যাইতেই সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওই এক ধারার মানুষ! বাজাতে আরম্ভ করে থেমে গেল!

নির্মলার প্রিয়জন বেহালাদার একটু বিচিত্র ধরণের মানুষ; সারাদিন বেহালাটি লইয়া ব্যস্ত। ছড়িতে রজন ঘষিতেছে, বেহালার কান টানিয়া টানিয়া তার ছিঁড়িতেছে আবার তার পরাইতেছে। কখনও ঝাড়িতেছে, কখনও মুছিতেছে। মাঝে মাঝে কখনও সযত্ন-সঞ্চিত

বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া মাথাইতে বসে। কিন্তু বড় একটা বাজায় না। আসরে বাজায়, বাসায় নতুন গানের মহল বসিলেও বাজায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সারাদিন যে মানুষটা বেহালা লইয়াই বসিয়া থাকে সে কখনও আপন মনে কোন গান বাজায় না ইহাই সকলের আশ্চর্য লাগে। ছড়ি টানিয়া সুর বাঁধিতে বাঁধিতেই জীবন কাটির গেল। তবে এক একদিন, সেও ক্বচিৎ, গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায়, সে বেহালা বাজাইতে বসে। সেও একটি গান! এবং তেমন দিনটিরও একটি লক্ষণ আছে। সেদিনের সে লক্ষণ নিতাই আবিষ্কারও করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারে। নির্মলার ঘরে আগন্তুক আসিয়া যেদিন সারারাত্রির মহোৎসব জুড়িয়া দিবে সেই দিন; নিতাই বুঝিতে পারে যে আজ বেহালাদার বেহালা বাজাইবে।

সে এক অদ্ভূত গান। নিতাই বাজনায় সে গান শুনিয়াছে। অন্ধকারে কোন গাছতলায় একা বসিয়া বেহালাদার সে গান বাজায়। কিন্তু কেহ কাছে আসিয়া বসিলেই বেহালাদার বেহালাখানি নামাইয়া রাখে। এমন রাত্রে, অর্থাৎ নির্মলার ঘরে মহোৎসবের রাত্রে নিতাই এই গানটি শুনিবার জন্য ঘুমের মধ্যেও উদগ্রীব হইয়া থাকে। নিস্তব্ধ রাত্রে বেহালার মুর উঠিবামাত্র তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। কিন্তু সে ওঠে না, শুইয়া শুইয়াই শোনে। একমাত্র মহিষের মত লোকটাকেই বেহালাদার গ্রাহ্য করে না। লোকটা যেন লোকই নয়, একটা জড়পদার্থ। লোকটাও চুপচাপ রাঙাচোখ দুইটা মেলিয়া নেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

ললিতার প্রিয়জন দোহার লোকটি অত্যন্ত তার্কিক, তর্ক তাহার অধিকাংশ সময় ওই বাজনদার লোকটির সঙ্গে। বাজনার বোল ও তাল লইয়া তর্ক তাহদের লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে ললিতার সঙ্গেও ঝগড়া বাঁধিয়া যায়। ললিতা তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, লোকটা মাসীর কাছে নালিশ করে, মাসীর বিচারে পরাজয় যাহারই হউক,

সে-ই ললিতার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলে—দোষ হইছে আমার, ঘাট মানছি আমি। আর কখুনও এমন কর্ম করব না। কান মলছি আমি। লোকটা সত্যই কান মলে।

নির্মলা ও বসন্ত লোকটার নাম দিয়াছে—'ছুঁচো! ছি-চরণের ছুঁচো।' কথাটা অবশ্য আড়ালে বলিতে হয়, নহিলে ললিতা কোঁদল বাঁধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে। দোহার লোকটি কিন্তু রাগে না, হাসে।

বাজনদারটির প্রিয়তমা কেহ নাই। জুটিলেও টেকে না। লোকটির কেমন স্বভাব—যে নারীটির সহিত সে প্রেম করিবে, তাহারই টাকা-পয়সা সে চুরি করিয়া বসিবে। লোকটি প্রৌঢ়। নির্মল, ললিত দুইজনেই এক এক সময় তাহার প্রিয়তম ছিল। কিন্তু ঐ কারণেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে। লোকটা কিন্তু বাজায় খুব ভাল—যেমন তাহার তালজ্ঞান, বাজনার হাতটিও তেমনি মিঠা। কতবার চুরি করিয়া ঝগড়া করিয়া দল হইতে চলিয়া গিয়াছে, আবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকটা অতিমাত্রায় চরিত্রহীন। রাত্রে বাজনা বাজায়, দিনে সে ঘুরিয়া বেড়ায় নারীর সন্ধানে।

নির্মলা ললিতা নিতাইয়ের এক নাম দিয়াছে। বলে—'বসন্তের কোকিল'।

বসন্ত নিতাই দুজনেই হাসে।

নূতন জীবনে এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিতাইয়ের দিন কাটিতে লাগিল। জীবন-স্রোতের টানে কোথা হইতে সে কোথায় আসিয়া পড়িল, ঠাকুরঝি কোথায় ভাসিয়া গেল, রাজা কোথায় থাকিল—এ সব ভাবিতে গেলে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে, ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বসন্তের মুখপানে চাহিয়া সে তাহা পারে না। যে গিঁটটা সে বাঁধিয়াছিল সে গিঁটটা যেন অহরহই বাঁধা আছে, খুলিতেছে না। ঘাত-প্রতিঘাত সহ করিয়া, একহাতে চোখের জল মুছিয়া, অন্য হাতখানি কবিগানের সঙ্গে দর্শকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে নিস্পৃহ নিরাসক্তির এমন একটি আবরণ তৈয়ারী করিয়া

লইয়াছে যে, সব কিছুই তাহার সহ্য হইল, অথচ সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে কোনপ্রকারে কোনদিকে সঙ্কুচিত করিল না। বসন্তকে সে ভালবাসিল। দুই হাত দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে ভূলিল না। বসন্তের ঘরে যেদিন মানুষ আসে সেদিন এক গাছতলায় শুইয়া মনে মনে ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কয় অথবা বিরহের গান বাঁধে। অহরহই তাহার মনের মধ্যে ঘোরে গানের কলি। বসন্তের কোকিল নাম দেওয়ায় সে একটা গান বাঁধিয়াছে, কবিগানের পাল্লার আসরে যে কোন রকমে খাপাইয়া লইয়া সেই গানটি সে গাহিবেই গাহিবে—

"তোরা—শুনেছিস কি—বসন্তের কোকিল-ঝঙ্কার!
বাঁশী কি সেতার—তার কাছে ছার—
সে গানের কাছে সকল গানের হার।"

'কোকিল' নামটাই তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। 'কালো-কোকিল'। ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত।

ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে, অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিদ্ধ পালাগানের লাইন তাহার মুখস্থ। হরুঠাকুর, গোপাল উড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যান্টনী সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা হইতে নিতাইয়ের মনে মনে বরণ করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্যন্ত কবিয়ালদের গল্প গান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। অবসর সময়ে কত খেয়ালই হয় নিতাইয়ের। বসিয়া বসিয়া ঝুমুর দলের মেয়েদের লক্ষ্মীর কথাটিকে সে একদিন পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষ্মীর বারের দিন সে বসন্তকে অবাক করিয়া দিল। বসন্ত যখন ব্রতের কথা শোনা শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সযত্নে ঠাঁই করিয়া নিতাইকে প্রসাদ খাইতে দিল, তখন নিতাই বলিল— কথা শোনা হয়ে গেল?

–হ্যাঁ।

—তবে আমার কাছে একবার শুনে লাও।

সবিস্ময়ে বসন্ত বলিল—কি?

—লক্ষ্মীর কথা! বলিয়াই নিতাই হাতখানি বসন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া কবিগানের ছড়া বলার সুরে আরম্ভ করিয়া দিল—

"নমো নমো লক্ষ্মী দেবী—নমো নারায়ণী—
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।
শতদল পদ্মে বৈস—তেঁই সে কমলা।
সামান্য সহে না পাপ—তাই তো চঞ্চল।"

বসন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে জিজ্ঞাস করিল—কোথা থেকে যোগাড় করলে? নতুন পাঁচালীর বই কিনেছ, তাতেই আছে বুঝি?

নিতাই কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিতে লাগিল।

—বল কেনে?

—আগে শোনই কেনে। ভনিতেতেই সব পাবে।

"অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল—
লক্ষ্মীর বন্দন গায় শুনহ নিখিল!"

মুখরা দর্পিত বসন্ত উল্লাসে বিস্ময়ে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া অনিল— ওগো মাসী, নক্ষ্মীর পাঁচালী নিকেছে!

মালী জিজ্ঞাসা করিল—কি? কে?

বসন্ত হঁপাইতে হাপাইতে বলিল—নক্ষ্মীর পাঁচালী! লিখেছে তোমার জামাই!

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে সে আসর করিয়া সকলকে ডাকিয় কবিয়ালের পাঁচালী শুনাইয়া তবে ছাড়িল। নিতাইকে বলিল—বেশ সুর করে বল!

নিতাইয়ের পাঁচালী-শুনিয়া দলের সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই পাঁচালীটি ভাল হইয়াছিল। তাহ ছাড়া, তাহাদের পরিচিত কবিয়ালের কবিগান করে, ছড়া কাটে, দুই-চারিট গানও লেখে, কিন্তু এমনভাবে ধর্মকথা লইয়া কেহ পাঁচালী রচনা করে না। সেকালের বড় বড় কবিয়ালরা করিয়া গিয়াছে, তাই আজ পর্যন্ত চলিয়াছে, ভনিতার সময়ে—সেই সব কবিয়ালদের উদ্দেশে—ইহার প্রণাম জানায়। সকলে বিস্মিত হইল যে নিতাই তেমনি পাঁচালী রচনা করিয়াছে। এবং সেই দিন হইতেই তাহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গেল।

নিতাইয়ের পাঁচালীই এখন এই দলটিতে ব্রতকথা দাঁড়াইয়াছে। শুধু এই দলেই নয়, আর পাঁচ-সাতটা দলের ওস্তাদ এই পাঁচালী লিখিরা লইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবারে যখন মেয়ের বসিয়া তাহার রচনা করা লক্ষ্মীর পাঁচালী বলে, তখন নিতাই বেশ একটু গভীর হইয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, আর কী এমন রচনা করা যায়, যাহাদেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তাহার দপ্তরটিও ক্রমশ বড় হইয়া উঠিল। অনেক নূতন বই সে মেলায় কিনিয়াছে। আজকাল কলিকাতা হইতেও বই আনায়। এই সন্ধানটি শিখাইয়াছে দলনেত্রী ওই মাসী। মাসী অনেক জানে। নিতাই এক এক সময় অবাক হইয়া যায়। সে তাহাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে। বিদ্যাসুন্দরের সন্ধান তাহাকে মাসীই দিয়াছিল। বসন্ত একদিন চুল বাঁধিতে বাঁধিতে খোপা না বাঁধিয়াই বেণী ঝুলাইয়া কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিল। নিতাই বলিয়াছিল –বিনুনীতেই তোমাকে মানিয়েছে ভাল বসন, খোপা আর বেঁধো না।

মাসী সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

নিতাই বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মাসীর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া মাসী বলিয়াছিল—'বিদ্যেসোন্দর' জান বাবা? রায় গুণাকরের 'বিদ্যেসোন্দর'?

বসন্ত, ললিতা, নির্মলা ধরিয়া বসিয়াছিল—আজ কিন্তু "বিস্তেসোন্দর' বলতে হবে মাসী।

—সব কি মনে আছে মা! ভুলে গিয়েছি।

—তবে সেই তোমার কথাটি বল। সেটি তো মনে আছে! বসন্ত হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

—মেলেনী মাসীর কথা? মাসী হাসিয়া আরম্ভ করিয়াছিল—

"কথায় হীরার ধার—হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।"

মাসী গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁন্দ কোন্দল ভেলায়।
পড়শী না থাকে পাছে কোন্দলের দায়।"

নিতাই মাসীর কাছে বসিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে বলবে মাসী, আমি খাতায় লিখে রাখব?

—আমার তো সব মনে নাই বাবা। তুমি বিদ্যেসোন্দর বই আনাও কেনে। বটতলার ছাপাখানায় নিকে দাও, ডাকে চলে আসবে। তুমি দাম দিয়ে ছাড়িয়ে লেবে। বটতলার ঠিকানা পাঁজিতে পাবে।

বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে সে অন্নদামঙ্গল পাইয়াছে। বইয়ের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া দাশু রায়ের পাঁচালী, উদ্ভট কবিতার বইও আনাইয়াছে। দাশু রায় পড়িয়া তাহার মনের একটা

সংশয় কাটিয়াছে। "ননদিনী, ব'লো নাগরে। ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" এবং "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,—স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করায়ে চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল," দাশু রায়ই লিখিয়াছেন; আবার খেউড়েও দাশু রায় চরম লেখা লিখিয়া গিয়াছেন। আসরে খেউড়ের পালা গাহিবার আগে সে দাশু রায়কে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রণাম করে।

খেউড় আর তাহাকে খুব বেশী গাহিতে হয় না, গাহিতেও আর সঙ্কোচ হয় না। কিছু দিনের মধ্যেই কবিয়াল এবং কবিগান-শ্রোতাদের মধ্যে তাহার বেশ একটা সুখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে লোকে এখন তাহার গান মন দিয়া শোনে; অশ্লীল খেউড়, গালিগালাজের উত্তরে সে চোথা-চোখ বাঁকা রসিকতায় গান আরম্ভ করিলে লোকে এখন তাহারই তারিফ করে। কিছুদিন আগে একটা আসরে এমনি এক কবিয়ালের সঙ্গে আসর পড়িয়াছিল। লোকটা বুড়া হইয়াছে, তবুও যত তাহার টেরির বাহার তত লোকটা অশ্লীল। খেউড়ে নাকি বুড়ার নাম-ডাক খুব। লোকে তাহাকে 'খেউড়ের বাঘ' বলে।

সেও একটা ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকে। বুড়াই আগে আসর লইয়া নিতাইকে কালাচাঁদ খাড়া করিয়া নিজে বৃন্দে সাজিয়া বসিল। সেই সম্বন্ধ পাতাইয়াই চন্দ্রাবলী অর্থাৎ বসন্তকে বুড়া গালিগালাজ দিতে আর বাকী রাখিল না। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ হিসাবে নিতাইকে যেন জীবন্ত মাটিতে পুতিতে চাহিল। এই সম্বন্ধটি কবির পাল্লায় বড় সুবিধার সম্বন্ধ। বিশেষ যে আগে আসরে নামে, সে বৃন্দা হইয়া প্রতিপক্ষকে কালাচাঁদ করিয়া গালিগালাজের বিশেষ সুবিধা করিয়া লয়। তাহা ছাড়া প্রথম আসরে যেদিন বসন্ত তাহাকে চড় মারিয়াছিল, সেদিন প্রতিপক্ষ কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতাইয়াই তাহাকে যে জব্দ করিয়াছিল, সে কথাও কাহারও অজানা নাই। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাইলেই প্রতিপক্ষ এই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। লোকটা আসরে নামিয়াই খেউড় আরম্ভ করিল।

নিতাইয়ের চেহারা, বসন্তের চেহারা লইয়া এবং অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া আসর শেষ করিল।

নিতাই আসরে নামিতেই প্রৌঢ়া বলিল—বাব, সেই পুরনো পালা। খানিকটা রঙ চড়াবে নাকি?

নিতাই হাসিয়া বলিল—চড়াব বইকি! দেখি এক আসর, তারপর হবে। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল। গানটা সেই পুরানো গান।

"এ বুড়ে বয়সে বৃন্দে-কুচকে মুখে—আর রসকলি কাটিস নে।
রসের ভিয়েন না জানিস যদি—গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস নে।
শোনের নুড়ি পাকা চুলে—কাজ নেই আর আলবোট তুলে—
ও তোর-ফোক্লা দাঁতে—পড়ছে লালা—জিভ দিয়ে আর চাটিস নে।
—ও—হায়,—বুড়ি মরে না—মরণ নাই—
ও-ভয়ে যম—আসে নাকো—ও—তাই মরণ নাই।"

—ভয় কিসের? দোহারগণ, জান তোমরা যমের ভয়টা কিসের?

একজন বলিল—অরুচি, যমের অরুচি।

–উঁহু।

অন্য একজন বলিল—পাছে সেখানে পেজোমি করে, তাই।

–উঁহু। বলি চন্দ্রাবলী জান?

বসন্ত বিব্রত হইল, কি বলিলে কবিয়ালের মনোমত হইবে বা সুবিধা হইবে সে জানে না, তবু সে ঠকিবার মেয়ে নয়, সে বলিল—বুড়ী পাছে যমের সঙ্গে পিরীত করতে চায়, তাই সে ওকে নেয় না।

নিতাই বাহা-বাহা করিয়া উঠিল। লোকেও একেবারে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ঠিক ঠিক। বলিয়াই সে গান ধরিয়া দিল—

“ও পাছে, পিরীত করিতে চায়—যম ওরে নেয় না তাই—
ও তোর পায়ে ধরি—ওরে বুড়ি—ফোকলা দাঁতে হাসিস নে।
যমকে ভালবাসিস্ নে।”

নিতাইয়ের মিলের বাহারে, মিঠাগলার মাধুর্যে, ব্যঙ্গ-শ্লেষের তীক্ষতায় জমিয়া উঠি বেশ। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত নাচে। বসন্তও আজকাল তেমন অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া নাচে না, তবে নাচে সে বিভোর হইয়া। লোকে পছন্দ করে। জনতার এক একটা অংশ অবশ্য অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু বেশী অংশ তারিফই করে। দুই-দশজন ভদ্রলোককেও ক্রমে জমিতে দেখা যায় নিতাইয়ের পালার আসরে। নিতাইও অবসর বুঝিয়া গানকে আনিয়া ফেলে মিষ্ট রসের খাতে।

সে গান ধরে—

“(তোমায়) ভালোবাসি ব’লেই তোমার সইতে নারি অসৈরণ,
নইলে তোমায় কটু বয়ার চেয়ে ভাল আমার মরণ।”

সে আরম্ভ করে, তুমি বৃন্দে—তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু—তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ—তুমিই তো রচনা করিয়াছ—পূর্ণিমায় পূর্ণিমায়—কুঞ্জশয্যা, আমাদের সম্মুখে রাখিয়া—তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল-রূপের মাধুরী— ওগো দূতী—সেই তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই মতিভ্রম দেখিয়া মনের যাতনায় তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। তুমি নিজেই একবার ভাবিয়া দেখ তোমার নিজের কথা।

“রসের ভাণ্ডারী তুমি–কথা তোমার মিছরীর পানা
সেই তুমি আজ হাটে বেচ–সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা। ”

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আসরের মোড় ফিরাইয়া দেয় নিতাই। বসন্ত রাগ করে। কেন শেষকালে লোকটাকে এমন ধারার মিষ্ট কথা বলিলে?

সে বলে—ওকে বিঁধে বিঁধে মারতে হ'ত। খাতির কিসের?

নিতাই হাসিয়া বলে—বসন, নরম গরম পত্রমিদং, বুঝলে? নরম গরম—মিঠে কড়া — বুঝলে কিনা—ওতেই আসর মাৎ। তারপর বুঝাইয়া বলে—লোকটার বয়েস হয়েছে—প্রাণে দুঃখ দিলে কি ভাল হ'ত? তুমিই বল।

বসন্ত ইহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। নিতাই হাসিয়া বলে—রাগ করলে বসন?

বসন্ত হাসিয়া বলে—না।

—তবে?

—তবে ভাবছি, তুমি আমাকে সুদ্ধ নরম করে দিলে।

নিতাই হাসে।

বসন্ত বলে—সে চড় মনে পড়ে?

—সে চড় না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না। ও আমার গুরুর চড়।

বসন্ত আজ তাহার গলা জড়াইয়া ধরে। নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়।

খেউড়, যাহাকে বলে কাঁচা খেউড় অর্থাৎ নগ্ন অশ্লীলতার গানা,—সেও তাহাকে গাহিতে হয়। দুই একটা স্থানে, গভীর রাত্রে এমন গান না গাহিলে চলে না। শ্রোতারা দাবী করে। আবার এমনও আসর আসে যেখানে এই বুড়ার মত প্রতিদ্বন্দ্বীরা হটিয়া হটিয়া গিয়া নিজের আস্তাকুঁড়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকেও টানিয়া আনে। আসর ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া গোড়াতেই তাহা বুঝা যায়! একটা পালাগানের পরেই সেদিন তাহার চেহারাটা হইয়া উঠে থমথমে। চোখ দুইটা ইয়া উঠে উগ্র। প্রথম হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া যায়। দলের লোকেরাও বুঝিতে পারে, আজ লাগিল। বসন্ত এবং প্রৌঢ়া বুঝিতে পারে সর্বাগ্রে।

প্রৌঢ়া বলে—বসন! ইঙ্গিত করিয়া সে হাসে।

বসন্ত উত্তর দেয়—হ্যাঁ মাসী।

সে আসর হইতে বাহির হইয়া যায়, সেখান হইতে নিতাইকে ডাকে—শোন।

প্রৌঢ়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়-বাবা! ডাকছে তোমাকে। বাবা গো!

নিতাই চমকির উঠে। তারপর গভীর মুখেই বাহিরে যায়, বসন্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায়। সে জানে কিসের জন্য বসন্ত তাহাকে ডাকিয়াছে। গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া বসন্ত মদ ঢালিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিয়া নিতাই আসিয়া আসরে বসে আর এক চেহারা লইয়া।

তারপর রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসর মাতিতে থাকে—খেউড়ে অশ্লীলতায়। প্রতি আসরের পূর্বেই বসন্ত পরিপূর্ণ মাস মদ তুলিয়া দেয় তাহার হাতে। সে খায়। মধ্যে মধ্যে নিজে ঢালিয়া বসন্তকে খাওয়ায়। বসন্তর মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠে। সেদিন আসরে আর কিছু বাকী থাকে না। নিতাইয়ের রক্তের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে সেদিন মদের বিশেষ স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠে-তাহার জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ; সমাজের আবর্জনা-স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ শৈশবে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহর মধ্যে জাগিয়া উঠে রক্তবীজের মত। ভাষায়—ভাবে—ভঙ্গীতে অশ্লীল কদর্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধে না। শুধু তাই নয়—সেদিন সে এমন উগ্র হইয় উঠে যে, সামান্য কারণেই যে কোন লোকের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়।

প্রৌঢ়া সেদিন দলের লোককে সাবধান করে। বলে-হাতী আজ মেতেছে বাবা। তোরা একটুকুন সমীহ ক'রে সয়ে থাক। তোরা সব কত সময়ে কত বলিস। ও তো সব সয়।

নির্মলা হাসিয়া বলে—মাউতকে (মাহুত) বল মাসী।

প্রৌঢ়া হাসে—সে বসন্তের দিকে চায়। বসন্তও হাসে। এমন দিনে বসন্তের সে হাসি অদ্ভুত হাসি।

বসন্তের মুখে এই হাসি দেখিয়া নির্মল খিলখিল করিয়া হাসে; বলে—কি লো হাসতে গিয়ে যে গলে পড়েছিস বসন।

বসন্তের মস্তিষ্কেও মদের নেশা–চোখ তাহার ঢুলঢুল করে। সে তবুও হাসে কারণ এমন দিনটি তাহার বহু প্রত্যাশার দিন। এমন দিনেই নিতাই—বসন্তকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয়। বসন্তকে লইয়া সে অধীর হইয় উঠে।

সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। বসন্ত নির্জীবের মত ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি। তবুও এমন দিনটি বসন্তের বহু প্রত্যাশার দিন।

সহজ শান্ত নিতাই আর এক মানুষ—সে আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকে বসন্তের নাগালের বাহিরে।

তখন বসন্ত আপনা হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে টানিয়াও লয় না, আবার ঠেলিয়া সরাইয়াও দেয় না। তাহার মাথায় কিংবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়—বসন্ত যেন কত ছেলেমানুষ। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষাও করা যায় না—এমন পরম সমৃদর আছে তাহার মধ্যে।

বসন্ত ছুতানাতা করিয়া অভিমান করে, কাঁদে।

নিতাই হাসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দেয়। বলে—তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাই বসন। তার পর গুন গুন করিয়া গান ধরে—

“তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি!

তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহা জান নাকি?”

সঙ্গে সঙ্গে বলে–বল সত্যি কি না!

বসন্ত মনে মনে খুশী হয়। মুখে তাহার হাসি ফোটে। নিজেই চোখ মুছিয়া সে বলে—বলব না। হ্যাঁ, কোকিল বটে আমার! বাহারের গান হয়েছে। শেষ কর। নিকে রাখ।

কিন্তু শেষও হয় না, লিখিয়া রাখাও হয় না। অসমাপ্ত গানগুলা হারাইয়া যায়।

এই সেদিন একদিন—নিতাই যে গানটি গাহিল, সে গানটি শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল বসন্তর সেই প্রথম রূপ। বসন্তর চোখে সে কি প্রখর চাহনি সে দেখিয়াছিল। আজ সেই বসন্তই কাঁদিতেছে।

নিতাই হাসিয়া গান ধরিয়া দিল—

“সে আগুন তোমার গে-লো কোথা শুধাই তোমারে?

ও তোমার নয়নকোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে,

আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে—দেখে নি কি সখি হে?

ও হায়—সে আগুন আজ জল হ’ল কি পুড়াইয়ে আমারে?

শুধাই তোমারে! ”

গান শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে বসন্ত ক্ষান্ত হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কিন্তু বলিল—গানটি শেষ কর, আমি শিখে তবে উঠব। তারপর বলিল—তোমাকে চড় মেরেছিলাম, সে কথা তুমি ভোল নাই তা হ’লে?

নিতাই বলিল—ভগবানের দিব্যি বসন—

বাধা দিয়া বসন্ত বলিল—না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। আবার হাসিয়া বলিল—এই তো, তুমিও তো ঠাট্টা বুঝতে পার না।

বসন্তও তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাল লাগে। এই তো গান। পদাবলীর 'পিরীতি' এক, আর টপ্পার ভালবাসা অন্য জিনিস–একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পিরীতি। টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয়। এই না হইলে গান!

"তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ।"

কিংবা—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।"

আহা হা! এ যেন মিছরীর পান। নিতাই মিছরীর পানার সহিত তুলনা দেয়। নিতাইয়ের সাধ, সে এমনই গান বাঁধিবে—সে মরিয়া যাইবে, নূতন কবিয়াল নুতন ছোকরার তাহার গান গাহিবে আর বলিবে—বাহবা! বাহবা! বাহবা!

অহরহই তাহার মনে গানের কলি গুন গুন করে।

আবার মধ্যে মধ্যে নিতাই কেমন উদাসীন হইয়া উঠে। মনে পড়িয়া যায় সেই রেলস্টেশন। সেই তাহাকে।

গ্রামপথে চলিবার সময় দ্বিপ্রহরে—দূরে পথের বাঁকে—হঠাৎ রোদের ছটায় ঝকমক করিয়া উঠে স্বর্ণবিন্দুর মত একটি বিন্দু। বাংলাদেশে পল্লীগ্রামে–এই সময়টাই জলখাবারের সময়, গরু খুলিবার বেলা, এই সময়েই কৃষকবধূরা মাঠে যায় পুরুষের

জলখাবার লইয়া, গৃহস্থঘরে দুধের যোগান দিবার সময়ও এই। মাঠের পথে—গ্রামের পথে-ঘটি মাথায় চলন্ত কৃষকবধূদের রৌদ্রচ্ছটা প্রতিবিম্বিত ঝকমকে বিন্দুটি দেখিলেই নিতাইয়ের মন উদাস হইয় উঠে।

তাহার মনে পড়ে সেই কাশফুলের মাথায় সোনার টোপর। ঠাকুরঝি! সঙ্গে সঙ্গে, সব বিস্বাদ হইয়া যায়। এসব তাহার আর কিছুঁই ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয় এইখান হইতেই সে ছুটিতে আরম্ভ করে, ফিরিয়া যায় তাহার সেই গ্রামে। কৃষ্ণচূড়ার তলাটিতে বসিয়া রেললাইনের বাঁকের দিকে তাকাইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাহার সেই পুরানো বাঁধা গান—"ও আমার মনের মানুষ গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।"

—নাঃ! পরক্ষণেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—না। চাঁদ, তুমি আকাশে থাক। ঠাকুরঝি তুমি মুখে থাক। সংসার তোমার মুখের হোক।

আর ফিরিয়া যাইবারই বা তাহার সময় কই? পাঁচদিন আবার আসর বসিবে, এবার আর ঝুমুরদলের কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা নয়। আসল কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা। তারণ কবিয়াল, মহাদেব কবিয়াল, নোটন কবিয়ালের মত দস্তুরমত কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা হইবে। একটা মেলার আসরে কবিয়াল হিসাবে পাল্লা দিবার জন্য তাহাকে শুধু বায়না করিতে আসিয়াছিল। ঝুমুরদলের সঙ্গে কোন সংস্রবই নাই। তবু সে বলিয়াছে—উহারা ভিন্ন তাহার দোহারের কাজ কেহ করিতে পরিবে না। সুতরাং উহারাও যাইবে।

এ বায়নার পর দল চলিবে ধুলিয়ান অঞ্চলের দিকে। সে চলিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে? দলট কানা হইয়া যাইবে যে। সে যে তাহারই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। তা ছাড়া— বসন্ত আছে। বসন্তকে সে কথা দিয়াছে। সে যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন সে তো তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনে পড়ে গাঁটছড়া বাঁধার কথা। কথা আছে—যে কেহ একজন মরিলে তবে এ গাঁটছড়া খুলিয়া লইবে অপর জন। ভাবিতে ভাবিতেও

সে শিহরিয়া উঠে। বসন্তের মৃত্যুকামনা করিতেছে সে? না না। ঠাকুরঝি, তুমি দূরেই থাক—সুখেই থাক—তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো হইবে না। সে বসন্তের কালো-কোকিল—যেখানে বসন্ত সেবখানে ছাড়া অন্য কোখাও যাইতে পারে না সে। বসন্ত বাঁচিয়া থাক—সে সুস্থ হইয়া উঠুক—বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তে কয়দিনের জীবন। কয়টা দিন। ইহার মধ্যে—বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি ভালবাসার শেষ করিতে পরিবে সে? ইহার পর আবার ঠাকুরঝিকে ভালবাসিবে? এমনি করিয়াই তো একদিন ঠাকুরঝিকে ছাড়িয়া—তাহাকে ভালবাসার লীলাটা অসমাপ্ত রাখিয়া-চলিয়া আসিয়া বসন্তকে পাইয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করিয়াছে। আবার বসন্তকে ছাড়িয়া ঠাকুরঝির কাছে? না। এই ভাল।

তবুও তাহার ভাল লাগে না। সে দল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠে বসিয়া থাকে। কখনও আপনিই একসময় চকিত হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া আসে, কখনও বা দল হইতে কেহ যায়, ডাকিয়া আনে।

বসন্ত বলে—এই দেখ, এইবার তুমি ক্ষেপে যাবে।

নিতাই নিবিষ্টচিত্ততার মধ্যেই হাসে—কেনে? কি হ’ল?

—সকাল থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে এলে। খেতে-দেতে হবে না?

—ভারি ভাল কলি মনে এসেছে বসন। শোন—

—না, এখন নাও দিকিনি!

—না। আগে শোন। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়া আরম্ভ করে—

“এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ–কুলাল না এ জীবনে।
হয়, জীবন এত ছোট কেনে?

এ ভূবনে?”

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিল। গানটা শুনিয়া সে যেন পাথর হইয়া গেল।

নিতাই সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—বসন! কি হ’ল বসন? বসন!

ধীরে ধীরে দুই চোখের কোণ হইতে দুটি জলের ধারা গড়াইয়া আসিল বসনের। সে বলিল —এ গান তুমি কেনে লিখলে কবিয়াল?

—কেনে বসন?

ক্লান্ত বিষন্ন কণ্ঠে সে বলিল—আমি তে এখন ভাল আছি কবিয়াল—তবে তুমি কেনে লিখলে, কেনে তোমার মনে হ’ল জীবন এত ছোট কেনে?

অকারণে নিতাইয়ের বুকটা ধড়াস করিয়। উঠিল।

কবি – ১৮

সত্যই বসন এখন ভাল আছে। অনেক ভাল আছে। দেহের প্রতি যত্ন তাহার এখন অপরিসীম। মদ এখন সে খুব কমই খায়। দূর্বাঘাসের রস আগে নিয়মিত খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। এখন নিয়মিত সকালে উঠিয়াই দূর্বাঘাসের রসটি খাইয়া তবে অন্য কাজে সে হাত দেয়। স্বাস্থ্যও তাহার এখন ভাল হইয়াছে। শীর্ণ রুক্ষ মুখখানি অনেকটা নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, রুক্ষ দীপ্ত গৌরবর্ণে একটু শ্যাম আভাস দেখা দিয়াছে। কথার ধার আছে, জ্বালা নাই। এখুন আর সে তেমন তীক্ষ-কণ্ঠে খিলখিল করিয়া হাসে না। মুচকিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

ললিতা নির্মলা ঠাট্টার আর বাকি রাখে না। বসন্ত যখন নিতাইয়ের কোন কাজ করে তখন ললিত নির্মলাকে অথবা নির্মলা ললিতাকে একটি কথা বলে—'হায়-সখি,-অবশেষে ' অর্থাৎ যে পিরীতিকে এককালে বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণা করিত, সেই পিরীতিতেই সে পড়িল অবশেষে।

বসন্ত রাগে না, মুচকি হাসিয়া শুধু বলে—মরণ।

প্রৌঢ়াও হাসে। মধ্যে মধ্যে সেও দুই চারিট রহস্য করিয়া থাকে।

—বসন, ফুল তবে ফুটল। কোকিল নাম পাল্টে ওস্তাদের নাম দে বসন ভোমরা। কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো।

বসন্ত হাসে।

শুধু একটা সময়, বসন্ত—পুরানো বসন্ত। সেটা সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার পর হইতেই সে উগ্র হইয় উঠে। এটা তাহদের দেহের বেসাতির সময়। সন্ধ্যার অন্ধকার হইলেই ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়। মেয়ের গা ধুইয়া প্রসাধন করিয়া সাজিয়া গুঁজিয়া বসিয়া থাকে।

তিনজনে তখন তাহারা বসে একটি জায়গায়। অথবা আপন আপন ঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসে—মোট কথা এই সময়ের আলাপ-রঙ্গরহস্য সবই মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষদের সঙ্গে ভাবটা যেন ছাড়াছাড়া। মেয়েরা ইঙ্গিতময় ভাষায় অশ্লীল ভাবের রঙ্গরহস্য করে নিজেদের মধ্যে।

নির্মলা মৃদুস্বরে ডাকে—নি-ব, নি-স, নি-ন্ত। অর্থাৎ নি শব্দটাকে যোগ করিয়া সে ডাকে—বসন্ত।

বসন্ত উত্তর দেয়—নি-কি? মানে—কি?

ওই নি শব্দটাকে যোগ করিয়া তারপর চলে অশ্লীল রহস্য! কোন এক দিনের ব্যভিচারবিলাসের গল্প। সকলেই তাহ্‌রা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। যেন সম্মুখের দেহব্যবসায়ের আসরের জন্য মনটাকে তাহারা শানাইয়া লয়। এই কাজ হইতে তাইাদের নিষ্কৃতি নাই। একদিকে মাসী দেয় না, অন্যদিকে চিরজীবনের অভ্যাস—সেও দেয় না। উপায় নাই।

পুরুষেরাও এ সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন পাতে। তাহদেরও যেন সাময়িক ভাবে মেয়েগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া যায়। একান্ত নির্লিপ্তের মত তাহারা বসিয়া থাকে।

নিতাই একটা নিরালা জায়গা বাছিয়া বসে, আপনার লণ্ঠনটি জালিয়া দপ্তর খোলে, লেখে, পড়ে। বসন্তের ঘরে আগন্তুকদের মত্ত কণ্ঠের সাড়া জাগে—নিতাই রামায়ণ পড়ে। কৃষ্ণলীলা পড়ে। গানও রচনা করে—

“আর কতকাল মাকাল ফলে ভুলবি আমার মন?”

অথবা—

“আমার কর্মফল
দয়া ক’রে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল!”

কখনও সে বসিয়া ভাবে। ভাবে, বড় বড় কবিয়ালদের কথা—যাহারা সত্যকারের কবিয়াল। ঝুমুরের আসরে যাহারা গান গায় না। তেমন বায়না ইদানীং তাহার ভাগ্যেও দুই-একটা করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার তাহার এ দল হইতে বাহির হইয়া পড়া উচিত। এক বাধা বসন্ত। বসন্ত যে রাজী হয় না! সে সবই বুঝিতে পারে। তবুও সে এ দল ছাড়িয়া যাইতে পারে না। আশ্চর্য! সে আপন মনেই একটু হাসে।

—কি রকম? হাসছ যে আপন মনে!

নিতাই চাহিয়া দেখে—বেহালাদার তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে। সে বসিয়া আছে অল্প দূরে। বেহালাদার বসিয়া আপনার বেহালাখানিকে লইয়া পড়িয়াছে। সুর বাঁধিতেছে। সে সুর-বাঁধা যেন তাহার ফুরাইবার নয়। সুর বাঁধিয়া একবার ছড়ি টানিয়াই আবার তার-বাঁধা কানটায় মোচড় দেয়। তার কাটিয়া যায়। বেহালাদার নতুন তার পরাইতে বসে। ছড়িতে রজন ঘষে। বেহালাখানাকে ঝাড়ে। মাঝে মাঝে বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া বার্নিশ মাথায়।

নির্মলার ঘরে কলরব উঠে।

বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায়। রাত্রি একটু গভীর না হইলে—বাজনা তাহার ভাল জমে না। বারোটা পার হইলেই তাহার যেন হাত খুলিয়া যায়। একটা অদ্ভূত বাজনা সে বাজায়। লম্বা টানা একটা সুর। সুরটা কাঁপিতে কাঁপিতে বাজিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে, শরীর সত্যই বিমঝিম করিয়া উঠে। মনে হয় যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া গিয়াছে, চারিদিক যেন হিম হইয়া গেল। যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাতপায়ের প্রান্তভাগও যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনের চিন্তা-ভাবনাও যেন অসাড় হইয়া যায়।,

দোহারটা তর্ক করে বাজনাদারের সঙ্গে।

বাজনাদারটার উপরে কোন কিছুরই ছায়া পড়ে না। তাহার কেহ ভালবাসার জন নাই। সে হা-হা করিয়া হাসে—বাজনা বাজায়। দোহারটার তর্কের জবাব দেয়। মধ্যে মধ্যে মেয়েদের ঘরে গিয়া মদ খাইয়া আসে। বেহালাদারের জন্য মদ লইয়া আসে। তারপর ঘুম পাইলেই বিছানা পাড়িয়া শুইয়া পড়ে।

দোহারটি ললিতার ঘরে গিয়া ললিতার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে।

মহিষের মত লোকটা ধুনির সম্মুখে বসিয়া থাকে। প্রৌঢ়া ঘরগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া সুপারি কাটে। লোকজন আসিলে মেয়েদের ডাকিয়া দেখায়, দরদস্তুর করে, টাকা আদায় করে। গোপনে মদ বিক্রী করে। প্রৌঢ়ার এই সময়ে মূর্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গম্ভীর, কথা খুব কম কয়, চোখের ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া ভ্রূকুটি উদ্যত করিয়াই রাখে; দলের প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত হয়। বসন্ত উগ্র হইয়া দেহের খরিদারের সঙ্গে ঝগড়া করে। প্রৌঢ়া মাসী আসিয়া দাঁড়ায়, বসন্তকে সে প্রায় ধমক দেয়

–এই বসন! কি ব্যাপার? ঝগড়া করছিস কেনে?

—বেশ করছি। মদ খেতে বলছে, আমি মদ খাব না।

—এক-আধটু খেতে হবে বৈকি। তা না হ'লে হবে কেনে? নোকে আসবে কেনে?

—না আসে, না-ই এল। আমার ঘরে নোক এসে দরকার নাই।

—দরকার নাই!

—না।

—বেশ, কাল সকালে তুমি ঘর চলে যেয়ো। আমার এখানে ঠাঁই হবে না।

শুধু বসন্তই নয়, নির্মল ললিতাও মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয় পড়ে। তাহারাও বলে—দরকার নাই, আর পারি না। মাসীর কিন্তু ক্লান্তি নাই, সে অনড়। তাহার সেই এক

উত্তর–তাহলে বাছা তোমাদের নিয়ে আমার দল চলবে না। তোমরা পথ দেখ ঝুমুর দলের লক্ষ্মী ওইখানে। ও পথ ছাড়লে চলবে না।

সকলকেই চুপ করিতে হয়, বসন্তকেও হয়। আবার এটাও আশ্চর্যের কথা যে, যে ব্যবসাটা তাহারা ছাড়িতে চায়, যে জীবনে বিষ আছে বলিয়া মনে হয়, সেই ব্যবসায় ও সেই জীবনে ভাটা পড়িয়া আসিলে, মন্দা পড়িলে তাহদেরই আর ভাল লাগে না, তাহারাই চিন্তিত হইয়া পড়ে। আপনাদের মধ্যেই আলোচনা হয়।

দূর, দূর, রোজগার নাই, পাতি নাই, লোক নাই, জন নাই—কিছু নাই। সব ভোঁ ভোঁ। সঙ্গে সঙ্গে অপর একজন বলে—ঠিক বলেছিস ভাই, ভাল লাগছে না মাইরী!

-ললিতে!

—কি?

—এ কেমন জায়গা বল তো?

—কে জানে ভাই। পাঁচটা টাকা রেখেছিলাম—নাকছবি গড়াব ব'লে, চার টাকা খরচ হয়ে গেল। বসন!

বসন চুপ করিয়াই থাকে। তাহার দেহ-মন দুই-ই ক্লান্ত। নির্মলা ললিতা আবার ডাকে। —কি লো চুপ করে রয়েছিল যে! তারপর বলে—তোর ভাই অনেক টাকা।

কোন দিন ইহার উত্তরে বসন ফোঁস করিয়া উঠে। ঝগড়া বাধিয়া যায়। কোন দিন বিষণ্নহাসি হাসিয়া উঠিয়া যায়। মেয়েটার মতিগতি কখন যে অস্থির, কখন যে শান্ত বুঝিয়া ওঠা দায়। ঝগড়া বাধিলে নিতাইকে আসিয়া থামাইতে হয়। বসনকে ঘরে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া শান্ত করে। শান্ত হইলে প্রশ্ন করে—কেন এমন কর বসন?

বসন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িয়া বলে—জানি না।

নিতাই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়।

খুব বেশী মন্দা পড়িলে—মাসী নূতন পথ ধরে। মেয়েদের ডাকিয়া বলে—আজ সাজগোজ কর দেখি ভাল ক'রে। গাঁয়ের বাজারে বেড়াতে যাব।

অর্থাৎ মেয়েগুলিকে বাজারের পথে পথে ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনিবে।

মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া সাবান লইয়া পুকুরঘাটে যায়। স্নো, সিঁদুর, পাউডার, টিপ লইইয়া সাজিতে বসে। হাঙ্গামা হয় বসনকে লইয়া। সে কোনদিন যাইতে চায়—কোনদিন চায় না। মাসী ইহার ওষুধ জানে। সে আগে হইতেই বসনকে খানিকটা মদ খাওয়াইয়া রাখে। অবশ্য মদ খাওয়াইবার জন্য অনেক ছলনা করিতে হয়, ভুলাইতে হয়।

ধোঁয়া ধপধপে কাপড় পরনে প্রৌঢ়া গালে একগাল পান পুরিয়া মেয়েদের সঙ্গে বাহির হয়। মেয়েদের এই দেহের বেসাতির উপার্জনেও প্রৌঢ়ার ভাগ আছে। এই উপার্জন তিন ভাগ হইবে। দুই ভাগ পাইবে উপার্জনকারিণী মেয়েটা, এক ভাগ পাইবে ওই প্রৌঢ়া—এই নিয়ম। গানের আসরের উপার্জনও এমনি ভাগ করিয়া বিলি হয়। আসরের উপার্জন হয় আট ভাগ— আট ভাগ হইতে—এক ভাগ হিসাবে—মেয়ে তিনটি পায় তিন ভাগ—এক ভাগ প্রৌঢ়ার—দুই ভাগ কবিয়ালের, এক ভাগ বেহালাদারের—এক ভাগ আধ ভাগ হিসাবে দোহাররা ও বাজনদার পায়। উপার্জন যে লোক হইতে হইবে না—প্রৌঢ়া তাহাকে দলে রাখিবে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে উপার্জনের পথগুলির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কোন দিক হইতে ক্ষীণতম সাড়া পাইলেই সে মিষ্টিমুখে সরস বাক্যে সাদর আহবান জানাইয়া বলে-কে গে। বাবা? এস, এগিয়ে এস। নজ্জা কি ধন? ভয় কি? এস এস। আগন্তুক আগাইয়া আসিলে সে একটা মোড়া পাতিয়া বসিতে দেয়, পান দিয়া সম্মান করিয়া বলে—পানের জন্য দু আন পয়সা দাও বাবা! দিতে হয়।

পয়সা কয়টা খুটে বাঁধিয়া তবে মেয়েদের ডাকে—ওলো বসন, নির্মলা ইদিকে আয়। বলি ললিতে, ক'ভরি সোনা কানে পরিছিস লো?

এমনি একদিন।

মাসী তাহাকে ডাকিল—বসন! শোন, একটি লোক তোকে ডাকছে লো, বলুছে সে তোকে চেনে।

বসন্ত সেদিন বলিল—আমার গা কেমন করছে মাসী। শরীর ভাল নাই।

—শরীরে আবার কি হ'ল তোর? কিছু হয় নাই, শোন ইদিকে। একটু মদ খেলেই চাঙ্গ হয়ে উঠবে শরীর। শোনা, ইদিকে আয়।

আহবান—আদেশ। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বসন্ত বাহির হইয়া আসিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, গায়ে মুগন্ধি মাখিয়া একটি রীতিমত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিল। মাসী বলিল—দেখি, তোর গা দেখি!... ওমা, গা যে দিব্যি—আমার গা তোর চেয়ে গরম। ওগো বাবা, মেয়ের আমার শরীর খারাপ, একটু মদ খাওয়াতে হবে। সহসা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কাছেই আছে।

রূপোপজীবিনী নারীর আজীবনের বহু ভোগের নেশা। স্বরুচিসম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া বসন্তের মনে অভ্যাসের নেশা জাগিয়া উঠিল। কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসিয়া বসন্ত তাহাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল।

মাসীও হাসিল। সে তো জানে, এ বিষ একবার ঢুকিলে—প্রেমের অমৃত সমুদ্রেও তাহাকে শোধন করা যায় না। বসন্তের শরীর ভাল হইয়া গিয়াছে।

লোকটা চলিয়া গেলে বসন্তেরও নেশা ছুটিয়া যায়। মদের নেশার প্রতিক্রিয়ার মতই একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়া ওঠে। নেশার ভান করিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিল। এমন ক্ষেত্রে সে কল্পনা করে, কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আজও করিল। কিন্তু যাওয়া সহজ কথা নয়, কোথায় যাইবে? ওই মাসী—ওই নির্মলা—ওই

ললিতা ছাড়া—কে কোথায় আপন জন আছে তাহার? এই দুনিয়া-জোড়া পথ ছাড়া ঘর কোথায় তাহদের?

দিন সাতেক পর। বসন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মাসীকে বলিল—মালী!
বসন্তর কণ্ঠস্বরে মাসী চমকিয়া উঠিল। এ যে দীর্ঘকাল পরে পুরানো বসন্তর কণ্ঠস্বর – কি, বসন?
কানের কাছে মুখ আনিয়া কিস ফিস্ করিয়া বসন্ত—সেই পুরানো বসন্ত বলিল—ওষুদ, মাসী। আমার ব্যামো হয়েছে।
—ব্যামো? কাসি?
—না না না। বসন্তর চোখে ছুরির ধার খেলিতেছিল—সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই প্রৌঢ়া নিজের ভুল বুঝিল,—সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া আশ্বাস দিয়া মাসী বলিল—তার জন্যে ভয় কি? আজই তৈরী করে দেব। তিন দিনে ভাল হয়ে যাবে, মাছটা খাস না।
ইহাদের জীবনের এই একটা অধ্যায়। এ অধ্যায় অনিবার্য, আসিবেই। মামুষের জীবনে কোন কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল—সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়। ইহাদের জীবনে কিন্তু এ ব্যাধি অনিবার্য। শুধু অনিবার্যই নয়, এই ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়াই সমস্ত জীবনটা কাটাইতে হয় ইহাদের। এই জর্জরতার বিষই মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে। ডাক্তারও দেখায় না, কবিরাজও না। নিজেরাই চিকিৎসা করে। ধরা-বাধা হাতুড়ে চিকিৎসা। চিকিৎসা অর্থে—ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয়; কিন্তু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয় ফেরে। ফলে ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধূলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সে-সব কথা ইহারা ভাবে না। এইটাই যে সে-সব

ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা বুঝে না। শুধু ব্যাধি হইলে তাহার। সাময়িক ভাবে আকুল হইয়া উঠে।

বসন্তও আকুল হইয়া মাসীর কাছে আসিয়া পড়িল। মাসী রোগের চিকিৎসা জানে। সংবাদটায় ইহাদের মধ্যে লজ্জার কিছুই নাই। শুধু ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য সাবধান হয়, রোগগ্রস্তার গামছা কাপড়ের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলিলেই হইল। তাহারই মধ্যে খানিকটা ঘৃণার বা অস্পৃশ্যতা-দোষের আভাষ ফুটিয়া উঠে।

গামছা-কাপড় সাবধান করিয়া নির্মলা ললিত আসিল।

বসন্ত কাহারও দিকে ফিরিয়! চাহিল না।

নির্মলা পাশে বসিয়া বলিল—চুল বাঁধা রাখতে নাই। খুলে দি আয়।

নিতাই, গত রাত্রের কয়েকটা উচ্ছিষ্ট পাত্র ছিল, লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বসন্ত নির্মলাকে বলিল—বারণ কর। সে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না।

নির্মল বলিল—দাদা-দাদী—

নিতাই হাসিয়া বলিল—কেনে ব্যস্ত হচ্ছ বসন? কিছু ভয় ক'রো না তুমি। আমার কিছু হবে না।

নির্মলা অবাক হইয়া গেল। তিন দিনের স্থলে নয়দিন কাটিয়া গেল। বসন্ত বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। সর্বাঙ্গ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে ভরিয়া গিয়াছে, দেহে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রে আলো জালিয়া শিয়রে বসিয়া নিতাই বাতাস করিতেছিল। এমন ক্ষেত্রে রুগ্‌ণ মেয়েগুলির দুর্দশার সীমা থাকে না। ভালবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।

রোগগ্রস্তা একা পড়িয়া থাকে। যেটুকু সেবা-যেটুকু যত্ন জোটে, সেটুকু করে ওই দলের মেয়েরাই। নিতাই কিন্তু বসন্তর শিয়রে বসিয়া আছে—প্রশান্ত হাসিমুখে।

সেদিন।

বাহিরে রাত্রি তখন নিঃশব্দ গতিতে প্রথম প্রহর পার হইয়া দ্বিতীয় প্রহরের সমীপবর্তী হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল একটি সুর। জাগিয়া বসিয়াই নিতাই মধ্যে মধ্যে ঢুলিতেছিল। স্বরের সাড়ায় সে জাগিয়া উঠিল৭ একটু না হাসিয়া সে পারিল না। খেয়ালী বেহালাদার বেহালা বাজাইতেছে। আজ নির্মলার ঘরে বীভৎস উৎসবের আসর বসিয়াছে। বেহালাদারের আজ খেয়াল জাগিবার কথাই বটে। সন্ধ্যা হইতেই সে আজ এই সুর শুনিবার প্রত্যাশাও করিয়াছিল। বড় মিঠা হাত। কিন্তু অদ্ভুত মুর। বেহাগের আমেজ আছে। শুনিলেই মনে হয়, গভীর গাঢ় অন্ধকার রাত্রে সব যেন হারাইয়া গেল।

–আঃ ছি! ছি! ছি!—বসন্ত জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল।

চকিত হইরা নিতাই বলিল—কি বসন? কি হচ্ছে?

—আঃ! বারণ কর গো! বাজাতে বারণ কর।

—ভাল লাগছে না?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্ত বলিল—নাঃ, নাঃ। আমার হাত-পা যেন হিম হয়ে আসছে।

ছড়ির টানে একটি দীর্ঘ করুণ সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে। রাত্রি যেন কাঁদিতেছে।

কবি – ১৯

পুরা একমাস লাগিল। একমাস পর বসন্ত রোগশয্যা হইতে কোনরূপে উঠিয়া বসিল। কিন্তু বসন্তকে আর সে বসন্ত বলিয়া চেনা যাইতেছিল না। ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তাহার বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে বসন্তের অনুপম দেহবর্ণের উজ্জ্বল্রতা, লাবণ্য সব কিছু নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়—সর্বাঙ্গে কে যেন কয়লার গুড়া মাথাইয়া দিয়াছে। মাথার সে চিকণ কালো দীর্ঘ চুলের রাশি হইয়া উঠিয়াছে কর্কশ পিঙ্গলাভ। শুধু বর্ণই নয়—তাহার দেহের গন্ধ রস সবই গিয়াছে। তাহার দেহে একটা উৎকট গন্ধ, রসনিটোল কোমল দেহখানা কঙ্কালসার। বসন্তের গরব-করণ রূপসম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু ডাগর দুইটি চোখ। শীর্ণ শুষ্ক মুখে চোখ দুইটা যেন আরও ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া থাকে। চোখ দুইটা জলজল করিয়া জ্বলিতেছিল—ভস্মরাশির মধ্যে দুই টুকরা জলন্ত কয়লার মত।

সেদিন মাসী বলিল—বসন, বেশ ভাল ক'রে 'ত্যালে হলুদে' মেখে চান কর আজ।

বসন্ত নিস্পলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে কোনো উত্তর দিল না, একটু নড়িল না, চোখের একটা পলক পর্যন্ত পড়িল না।

মাসী আবার বলিল—রোগের গন্ধ মরবে, অঙ্গের কালচিটে খসখসে বদছিরি যাবে, শরীরে আরাম পাবি।

বসন্ত তবু তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

মাসী এবার তাহার কাছে বসিয়া তাহকে টানিয়া লইল—গায়ের কাপড় খুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল; ললিতাকে ডাকিয়া বলিল—ললিতে, বাটিতে করে খানিক তেল

গরম করে দে তো মা! আর খানিক হলুদ। তারপর সে ডাকিল নিতাইকে—বাবা! বাবা কোথা গো?

নিতাই ঘরের মধ্যে বসন্তর রোগশয্যা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল। বিছানাপত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রোদে ফেলিয়া দিয়া বলিল—আমাকে বলছ মাসী?

হাসিয়া প্রৌঢ়া বলিল–বাবা মানুষের একটাই গো বাবা! সে আমার তুমি। ভাল বাবা তুমি, মেয়ে ডাকছে—বুঝতে লারছ?

হাসিয়া নিতাই বলিল—বল।

—বসনের চিরুনি আর তেলের শিশিট দাও তো বাবা, মাথায় জট বেঁধেছে—আঁচড়ে দি।

বসন্ত এতক্ষণে কথা বলিল—বিছানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—এসব কি হবে?

ঘরের মধ্যে তেলের শিশি ও চিরুনির সন্ধানে যাইতে যাইতে নিতাই বলিল—কাচতে হবে।

তীব্র তীক্ষ কণ্ঠে বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—না! বলিয়াই সে ফোপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে কান্না তাহার আর থামে না।

নিতাই আশ্চর্য মানুষ! সে হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল–মাসী যা বলছে তাই শোন বসন। এ সব এখন তুমি ভেবো না।

বসন্ত কেবল কাঁদিয়াই চলিল।

নিতাই আবার বলিল–আমারও তো মানুষের শরীর! আমার রোগ হ’লে, তুমি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়ে। আমি না হয় মহাজনের মত হিসেব ক’রে শোধ নেব। না কি বল মাসী?

সে হাসিতে হাসিতে বিছানাগুলা লইয়া চলিয়া গেল।

ললিত, নির্মলা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বসন আমাদের ভাগ্যিমানী,

রোগ-ক্লেদ ভরা বিছানা-কাপড়—সমস্ত ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল। ললিতা নির্মলা দেহোপজীবিনী। তাহদের জীবনে প্রেম শরতের মেঘ, আসে, চলিয়া যায়। যদি বা কোনটা কিছুদিন স্থায়ী হয়—তবে হেমন্তের শীতের বাতাসের মত দেহোপজীবিনীর দেহে দুর্দশার আভাস আসিবামাত্র—সেও চলিয়া যায়। নির্মলার এ ব্যাধি হইয়াছে তিনবার, ললিতার হইয়াছে দুইবার। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র তাহদের ভালবাসার জন পলাইয়াছে। নির্মলার একজন প্রেমিক আবার—রোগের সুযোগে—তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া পলাইয়াছিল। আজ নিতাইয়ের আচরণ দেখিয়া তাই তাহারা অবাক হইয়া গেল। শুধু নিজেদের নয়— তাহাদের সমব্যবসায়িনীদের জীবনেও এমন ঘটনা তাহারা দেখে নাই।

বিছানা-কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, বসন্ত তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইল। তেলহলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া বসন্ত খানিকটা শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে; মাথায় চুল আঁচড়াইয়া প্রৌঢ়া একটি এলোথোপা বাঁধিয়া দিয়াছে—কপালে একটি সিঁদুরের টিপও দিয়াছে।

রোগক্লিষ্ট হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়ছে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়ছে দেখিয়া নিতাই সত্যই খুশী হইল। বলিল -বাঃ, এই তো বেশ মানুষের মত লাগছে!

বসন্ত হাসিল। তারপর ফেলিল একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। নিতাইয়ের কথাগুলা যেন বসন্তর ওই হাসির ধারের মুখে কাটিয়া খান খান হইয়া ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল। বসন্তর হাসির মধ্যে যত বিদ্রুপ তত দুঃখ। তাহ দেখিয়া নিতাই বিচলিত না হইয় পারিল না।

কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল–আমি মিথ্যে বলি নাই বসন। তো রং ফিরেছে—দুর্বল হোক, চেহারার রোগা-রোগা ভাব গিয়েছে—বিশ্বাস না হয়, আয়নায় তুমি নিজে দেখ। সে না ভাবিয়া চিন্তিয়া আয়নাখান পাড়িয়া আনিয়া বসন্তর সম্মুখে ধরিয়া দিল।

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

বসন্তর বড় বড় চোখের কোণ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া, শুষ্ক কালো বারুদের মত—তাহার দেহে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। মুহূর্তে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া-বসন্ত তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সে যেন পাগল হইরা গিয়াছে। কিন্তু দুর্বল হাতের লক্ষ্য–আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইয়াছিল—তাই সে আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল। আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাশের খুঁটিতে লাগিয়া—তিনচার টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

নিতাই একটু হাসিল। সে কাচের টুকরা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেই মুহূর্তেই একটি কঠিন কণ্ঠস্বর রণ রণ করিয়া বাজিয়া উঠিল —বসন!

নিতাই মুখ তুলিয়া দেখিল, মাসী। গম্ভীর কঠোরস্বরে মাসী আবার বলিল—বসন!

বসন্ত তেমনি নীরবে অচঞ্চল; চোখের দৃষ্টি তাহার স্থির নিস্পলক।

—বলি, রোগ না হয় কার? তোর একার হয়েছে? জানিস—এই মানুষটা না থাকলে তোর হাঁড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি হ'ত?

বসন্ত তবু উত্তর দিল না। আর মাসীর এ মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিবার শক্তি বা সাহস হইবার তাহার কথাও নয়। এ মাসী আলাদা মাসী। নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণ দলনেত্রী। মেয়েরা হইতে পুরুষ—এমন কি তাহার নিজের ভালবাসার জন—ওই মহিষের মত বিশালকায় ভীষণদর্শন লোকটা পর্যন্ত প্রৌঢ়ার এই মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয়

পায়। নিতাইও এ স্বর, এ মূর্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল, কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে স্তব্ধ হইয়া মাসীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ মূর্তি সে আজ প্রথম দেখিতেছে।

মাসী আবার কঠোরতর স্বরে ডাকিল—বসন! কথাব জবাব দিস না যে বড়!

বসন্ত এবার দাঁড়াইল, নিস্পলক চোখে স্থির দৃষ্টি মাসীর দিকে ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল—দুইজনের মাঝখানে। মাসীর চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—রাত্রির অন্ধকারে বাঘিনীর চোখের মত। বসন্তর চোখে আগুন—তাহার চেতনা নাই—কিন্তু ভয়ও নাই—শুধু দাহিকাশক্তি লইয়া সে জ্বলিতেছে। নিতাই সবিনয়ে হাসিয়াও দৃঢ় স্বরে বলিল—বাইরে যাও মাসী। ছি! রোগা মানুষ—

—রোগ মানুষ! রোগ সংসারে আর কারও হয় না? ওর একার হয়েছে? ঝাঁটা মেরে—

—ছি মাসী, ছি!

—ছি কেনে—ছি কেনে শুনি?

—রোগ মানুষ। তা ছাড়া তোমার কাছে অপরাধ তো কিছু করে নাই।

—আমার দলের লোকের ওপর করেছে। এতে আমার দল থাকবে কেনে? তুমি আমার দলের লোক, কবিয়াল।

নিতাই শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে—একটু হাসিয়াই বলিল—তা বটে। তবে বসনের জন্যেই তোমার দলে আছি মাসী। নইলে— একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—যাও, তুমি বাইরে যাও।

প্রৌঢ়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। এ দলের প্রত্যেকটি লোক আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রৌঢ়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। দলনেত্রী এ কথাটা ভাল করিয়াই জানে। দলের সর্ববিষয়ে তাহার ব্যবস্থার অধিকার, প্রতিটি কপর্দক তাহার হাত দিয়া বিতরণের বিধি —তাহার আসন, তাহার সাজ-সরঞ্জামের আভিজাত্য, প্রত্যেক জনকে

তাহার অধীন অনুগত্য করিয়া তোলে। নিজের যৌবনে—তাহার দলনেত্রীর দলের সে নিজেও এমনই করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তাহার দলেও এতদিন পর্যন্ত সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ ক্ষেত্রে তাহার দুর্দান্ত রাগ হইবার কথা, সক্রোধে ওই ভীষণদর্শন লোকটাকে আহবান করাই উচিত। কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইটার একটাও তাহার মনে হইল না। মনে হইল—এ লোকটি তাহার আনুগত্য কোনদিনই স্বীকার করে নাই এবং আজও সে যে তাহাকে লঙ্ঘন করিল তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, অস্বাভাবিকও কিছু নাই। নিতাই কোনমতেই তাহার কেন অপমানই করে নাই।

তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি চিরজীবী হও। মাসী ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা-বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে। তা হ'লে শেষকালটার জন্যে আর ভাবনা থাকে না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—মা-মাসী তো সমান কথা গো! এখন ঘরে যাও, বউ-বেটার ঝগড়া মা-মাসীকে শুনতে নাই।

আর কোন কথা না বলিয়া সে অনুরোধ মানিয়া লইল, চলিয়া গেল।

নিতাই এবার বসন্তর দিকে ফিরিয়া বলিল—ছি! রোগ শরীরে কি এত রাগ করে? রাগে শরীর খারাপ হয় বসন!

অকস্মাৎ বসন্ত সেই মাটির উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সস্নেহে নিতাই বলিল–আজ সকাল থেকে এমন করে কাঁদছ কেন বসন?

বসন্তর কান্না বাড়িয়া গেল; সে কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—কাল কলকাতায় ওষুদের দোকানে চিঠি লিখেছি। সালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি। সালসা খেলেই শরীর সেরে উঠবে, রক্ত পরিষ্কার হবে—সব ভাল হয়ে যাবে।

শ্বাসরোধী কান্নার আবেগে বসন্ত কাসিতে আরম্ভ করিল। কাসিয়া খানিকটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিয়া অবসাদে নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে একটা আঙুল দিয়া কি যেন দেখাইয়া দিল।

—কি? এতক্ষণ পরে বসন্ত কথা বলিল—অদ্ভুত হাসিয়া বলিল–রক্ত।

—রক্ত?

—সেই কালরোগ। বসন্ত আবার হাসিল। এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটা বলিতে না পারিয়াই সে কাঁদিতেছিল। কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও তাহার শেষ হইয়ছে।

নিতাই স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তোলা শ্লেষ্মার মধ্যে টকটকে রাঙা আভাস সুস্পষ্ট। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হাসি মাখিয়া সে একদৃষ্ট্রে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাইও নিজের দুই হাতের বন্ধনের মধ্যে দুর্বল শিশুর মত তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল— ভয় কি? রোগ হ'লেই কি মরে বসন? শরীর সারলেই—ও রোগও ভাল হয়ে যাবে।

এবার সে এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া বসন্ত নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না না না।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়াই বলিল—আর বাঁচব না!

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আমি জানতাম কবিয়াল। যেদিন সেই গানু তোমার মনে এসেছে—সেই দিনই জেনেছি আমি।

—কোন গান বসন?

—জীবন এত ছোট কেনে—হায়!

ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতাইয়ের চোখেও এবার জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্ত গানটা আবার মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে
হায়! জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে?

তারপর?

তারপর আর হয় নাই। অসমাপ্ত হইয়াই আছে। নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কবে শেষ হইবে কে জানে।

বসন্তই আবার কথা বলিল—আমি জানতে পেরেছি। বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়, আগে কত ভাল লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কথা কি মিথ্যে হয়? তার ওপর ওই গান তোমার মনে এসেছে! কি করে এল?

বসন্তের মনের কথা হইয়া উঠিল দৈববাণীর মতই সত্য, মিথ্যা নয়।

দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে বসন্তের গায়ে স্পষ্ট জর ফুটিয়া উঠিল। সে নিতাইকে ডাকিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—দেখ কত গরম!

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—হ্যায় জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে কবিয়াল!

কথাটা হইতেছিল একটা ছোটখাটো শহরের, শহরের নামটাই বলি না কেনা, কাটোয়া। কাটোয়ার এক প্রান্তে জীর্ণ একটা মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল। নিতাই বলিল—ললিতাকে একবার ডাকি, তোমার কাছে বসুক। আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি।

—না। আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল—ন।

—এই আধ ঘণ্টা। আমি দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসব।

—ন গো—না। যদি কাসি ওঠে? যদি রক্ত দেখতে পায়? তবে এই পথের মধ্যেই ফেলে আজই এখুনই পালাবে সব। যেও না, তুমি যেয়ে না।

নিতাই অগত্যা বসিল। রক্ত উঠার কথা আজও সকলের কাছে লুকানো আছে।

জ্বরটা যেন আজ বেশী-বেশী বাড়িতেছে। অন্য দিন রাত্রি প্রহরখানেক হইতেই খানিকট ঘাম হইয়া জর ছাড়ে, বসন্ত অনেকটা মুস্থ হয়। আজ ঘামও হয় নাই—সে সুস্থও হইল না। মধ্যে মধ্যে জ্বরজর্জর অসুস্থ বিহবল ব্যগ্র দৃষ্টি মেলিয়া সে চারিপাশে খুঁজিয়া নিতাইকে দেখিতেছিল—আবার চোখ বন্ধ করিয়া এ-পাশ হইতে ও-পাশে ফিরিয়া শুইতেছিল। অস্থিরতা আজ অতিরিক্ত।

নিতাই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিল। তাই যতবার সে চোখ মেলিয়া তাহাকে খুঁজিল, ততবার সে সাড়া দিয়া বলিল-আমি আছি। এই যে আমি! .

রাত্রি তখন শেষ প্রচুর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভূত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপ নিঃশেষে ক্ষরিত হইয়া আসে, এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়া একটা রহস্যময় ঘন শীতলতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। সেই স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে, চেতনা যেন অভিভূত হইয় পড়ে। ধীরসঞ্চারিত নৈঃশব্দের মধ্য দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরের মধ্যে নিঃশব্দ সঞ্চারিত ধূমপুঞ্জের মত। মাটির বুকের মধ্যে, গাছের পাতায় থাকিয় যে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয় পড়ে রাত্রির এই শেষ প্রহরে। হতচেতন হইয়া এ সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয়। মাটির ভিতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হিম-স্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায়। জীব জীবনের চৈতন্য-লোকেও সে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করিয়া দেয়। আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর; সে লোকেও যেন হিম-তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে—ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা —অন্ধ রাত্রিদেবতার ললাটচক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন-করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতায় নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল। নিতাই শত চেষ্টা করিযাও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। আচ্ছন্নের মত দেওয়ালের গায়ে একসময় ঢলিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ তাহার চেতনা ফিরিল বসন্তের আকর্ষণে। বসন্ত কখন উঠিয়া বসিয়াছে। দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে ডাকিতেছে—ওগো! ওগো!

সে কি আর্তবিহ্বল তাহার কণ্ঠস্বর!

—কি বসন? কি? উঠে বসলে কেনে? শোও, শোও। বসন্তর হাত দুইটি হিমের মত ঠাণ্ডা; পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেই হিমানীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মত বসন্তের হাতের মধ্য দিয়া নিঃশব্দ সঞ্চারে তাহার সর্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তর সর্বাঙ্গে ঘাম!

—বারণ কর! বারণ কর!

—কি? —বেহালা! বেহালা বাজাতে বারণ কর গো!

—বেহালা? কই? নিতাই বেশ কান পাতিয়া শুনিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধ শেষ প্রহরেও—তাহাদের দুই জনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়—আর কোন ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না।

—আঃ, শুনতে পাচ্ছ না? ওই যে, ওই যে! কেবল বেহালা বাজছে, কেবল বেহালা বাজছে। চকিতের মত একটা কথা নিতাইয়ের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

বসন্তর দেহের স্পর্শই তাহাকে সে কথাটি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিল। মণিবন্ধে নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া নিতাই সকরুণ দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দের নাম কর বসন—

—কেনে? বসন্ত তাহার বিহ্বল চোখ দুইটা নিতাইয়ের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কেনে?

কেন, সে কথা নিতাই কিছুতেই বলিতে পারিল না। মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল—আমি মরছি?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।

—ন। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।

নিতাই অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন্ত করিল, সে নালিশের সব দায়দাবী, কি জানি কেনা, তাহারই মাথার উপর যেন চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিল।

বসন্ত এপাশে ফিরিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো।

তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া-যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মত। নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—বসন! বসন!

—না, আর ডেকে না। না। বলিতে বলিতেই সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত দুইটা প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

কবি – ২০

গঙ্গার তীরবর্তী শহর, গঙ্গার তীরবর্তী শ্মশানেই, নিতাই-ই বসন্তর সৎকার করিল। সাহায্য করিল দলের মেয়েরা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা। সচেতন হইয়া উঠিল। দোহার—ললিতার ভালবাসার মানুষ—সে মুখ ফুটিয়া বলিল—ওস্তাদ, যা করছে ওরাই করুক। করলে তো অনেক। আবার কেনে?

নিতাই হাসিল, প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিবার লক্ষণও দেখাইল না। তার্কিক দোহার লোকটি ছাড়িল না, বলিল—হাসির কথা নয় ওস্তাদ। পরকালে কি জবাব দেবে বল!

নিতাই হাসিয়া বলিল—কোন জবাব দেব না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব ভাই।

বেহালাদারটি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—যাক ভাই, ও কথা যাক। বলিয়াই সে বেহালায় ছড়ির টান দিল।

চিতার উপর শবদেহ চাপাইবার পূর্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! বসন আমার সোনার বসন। দুই ফোঁটা চোখের জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। পাশেই বালুচরের উপর বসিয়া ছিল নির্মলা এবং ললিতা। নিঃশব্দ কান্নায় তাহদের চোখ হইতে শুধু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল অনর্গল ধারায়।

নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল–দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও। সে আসিয়া বসন্তর আভরণ খুলিতে বসিল। নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনীর কি-ই বা আভরণ! কানে দুইটা ফুল, নুকে একটা নাকছবি, হাতে দুইগাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তর গলায় ছিল একছড়া হালক বিছাহার।

নিতাই হাসিল। বলিল—খুলে নিচ্ছ মাসী?

মাসী কেবল তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল—বুকের নিধি চলে যায় বাবা, মনে হয় দুনিয়া অন্ধকার, খাদ্য বিষ, আর কিছু ছোঁব না-কখনও কিছু খাব না। আবার এক বেলা যেতে না যেতে চোখ মেলে চাইতে হয়, উঠতে হয়, পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়, লোকের সঙ্গে চোখ জুড়তে হয়। বাঁচতেও হবে, খেতে পরতেও হবে—এগুলো চিতেয় দিয়ে কি ফল হবে বল? বক্তব্য শেষ করিয়া হাসিয়া সে হাতের গহনাগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—এগুলি আবার আমার পাওনা বাবা।

নিতাই আবার একটু হাসিল, হাসিয়া সে বসন্তর নিরাভরণ দেহখানি চিতায় চাপাইয়া দিল। প্রৌঢ়া বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—আমার আদেষ্ট দেখ বাবা। আমিই হলাম ওয়ারিশান। প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললিত, নির্মলা অদূরে সজল চোখে উদাস দৃষ্টিতে বসন্তর চিতার দিকে চাহিয়া ছিল। বসন্তর বিয়োগে বেদন তাহদের অকৃত্রিম, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে তাহারা ভাবিতেছিল নিজেদের কথা। তাহদেরও হয়তো এমনি করিয়া যাইতে হইবে, মাসী এমনি করিয়াই তাহাদের দেহ হইতে সোনার টুকরা কয়টা খুলিয়া লইবে। বহুভাগে যদি বুড়া হইয়া বাঁচে, তবে ওই মাসীর মতই তাহারাও হয়তো দলের কত্রী হইবে। তখন-কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কল্পনা তাহদের ততদূর গেল না, আশার চেয়ে নিরাশাই তাহদের জীবনে বড়। শুধু তাহাই নয়, নিরাশ পরিণাম কল্পনা করিতেই এই মুহূর্তটিতে বড় ভাল লাগিতেছে। তাহারাও এমনি করিয়া মরিবে, মাসী বাঁচিয়া থাকিবে।

* * *

সৎকার শেষ করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, মহিষের মত লোকটা বসন্তর ঘরে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। বসন্তর জিনিসপত্রগুলি ইহারই মধ্যে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া গিয়াছে।

আবারও নিতাই একটু হাসিয়া ঘরের একপাশে একটা মাদুর বিছাইয়া চিতাগ্নির উত্তাপজর্জর, পরিশ্রমক্লান্ত দেহখানা ছড়াইয়া দিল।

সে ভাবিতেছিল মরণের কথা।

মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃপ্ত অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লষ্টয়া যায়। ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্ম বিচার করেনা, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়ছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসন্তর সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায়? তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল। কারণ বসন্ত যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে যাইবে। সে হয়তো অনন্ত নরক।

ত হোক। সেদিন তো আবার তাহার সহিত দেখা হইবে। কিছুক্ষণ পর মনটা আবার হায় হায় করিয়া উঠিল, আজ কিছুতেই তাহার মন ভরিতেছে না। তাহার কোলের উপরেই যে বসন্ত লুটাইয়া পড়িয়া মরিল, সে যে নিজহাতে তাহার দেহখানাপুরাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে কিছুক্ষণ আগে। আর যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আর বসন্তকে কোখাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই একটা কথাই বার বার মনে ঘুরিতেছে।

বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত। ঝক্‌মকে ক্ষুরের মত মুখের হাসি, আগুনের শিখার মত তাপ, তেমনি রঙ তেমনি রূপ, বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতই বসনের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেল! গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটা প্রতিবাদও করিল না।

মরণ সত্যসত্যই অদ্ভূত। গহনার উপর বসন্তর কত মমতা। সেই গহনা প্রৌঢ়া খুলিয়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য বসন্তর কত যত্ন, এতটুকু ময়লা লাগিলে সে দশবার মুছিত, এতটুকু যন্ত্রণ তাহার সহ্য হইত না—সেই দেহখান আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, লোভ, মোহ এক মুহূর্তে মরণ সব ঘুচাইয়া দিল। মরণ অদ্ভুত! থাকিতে থাকিতে তাহার মনে সেই গানের কলিগুলা গুন গুন করিয়া জাগিয়া উঠিল।—

এই খেদ মোর মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ-কুলাল না এ জীবনে।
হ্যায়! জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে?

বসন বলিয়াছিল—কবিয়াল—তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুমি কেনে বাঁধলে কবিয়াল! গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়! হায়। বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ—যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায় না—মরণে কি তাই মেলে? সুর গুন গুন করিয়া উঠিল।

জীবনে যা মিটল না কে মিটবে কি হায় তাই মরণে?

মেটে? তাই মেটে? বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে—সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ ভুবনে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে—পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের ও জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয় ওঠে ওপারে—সে জগতে? ওঠে? ওঠে?

এ ভূবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হয়? জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

হঠাৎ একটা কলহ-কোলাহলে তাহার গানের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল। মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিল। বাহিরে দলের লোকেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্মল তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করিতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা শুনিয়া সে আরও মর্মাহত হইল। ঝগড়া বাঁধিয়াছে বসনের স্থান পূরণ লইইয়া ছি! ছিঃ! ছি!
বসন্ত আজই মরিয়াছে, দুপুরবেলা পর্যন্ত দেহটাও তাহার ছিল। এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে দল হইতে বসন্ত মুছিয়া গেল। তাহার স্থান কে লইবে সেই সমস্ত এখনই পূরণ নু করিলেই নয়! প্রৌঢ়া বসন্তর জিনিসপত্র লইয়া আপনার ঘরে পুরিয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ললিত, নির্মলা আজ নিজেরা খরচ দিয়া মদ কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে। ইহারই মধ্যে বেহালাদার, দোহার ও ঢুলীট আলোচনা করিতেছিল, কোন ঝুমুর দলে সে গানে-নাচে-রূপে-যৌবনে সেরা মেয়ে কে আছে! সর্ববাদিসন্মতভাবে

'প্রভাতী' নামী কে একজন তরুণীর নাম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; মেয়েটা নাকি বসন্ত অপেক্ষা আরও ভাল এই কারণে যে তাহার বয়স বসন্তের চেয়ে অনেক কম। দোহার বলিতেছে তাহাকেই আনা উচিত। তাহাতে বিশ ত্রিশ বা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত লাগে তাহা দিয়াও তাহাকে দলে আনা উচিত। না হইলে এমন যে দলটা এ দলটাও অচল হইয়া যাইবে।

ঢুলীটা এই কথায় বলিয়াছে—চিঁড়ে রসস্থ না হলে গলা দিয়ে নামে না। শুধু কবিয়ালের গান কেউ শুনবে না। ললিতা নির্মলা মুখপাত হ'লে চোখ বুজে গান শুনতে হবে।

ললিতা নির্মলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। একে রূপোপজীবিনী নারী তার উপর মদের নেশা। রূপের নিন্দা শুনিয়া গালিগালাজে স্থানটা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

নিতাইয়ের ভাল লাগিল না। সে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে চলিতে কখন একসময় আসিয়া দাঁড়াইল গঙ্গার ধারে, শ্মশানে। সেইখানে সে বসিল।

* * *

সামনে জনশূন্য শ্মশান। একটা চিতা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে। এখানে ওখানে ছাইয়ের গাদা। গঙ্গার ওপারে পূর্বদিকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। দগ্ধ দেহের গন্ধে এখানকার বাতাস ভারী। ইহারই মধ্যে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

এত কাছে হইতে এমন করিয়া একা বসিয়া দুচোখ ভরিয়া নিতাই জীবনের ওপারকে কখনও দেখে নাই। জীবনের ওপারে মৃত্যুপুরী, মরণ ওখানে বসিয়া আছে।

পাড়ায়—গ্রামে মানুষ মরিয়াছে, সে শুনিয়াছে। মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতই একটা ভয়—একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই এতকাল তাহার ছিল। এই প্রথম বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল। মনে হইতেছে বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিতে পারিত। কপালে হত রাখিয়া কতদিন সে চমকিয়া উঠিয়াছে। এমন ছ্যাঁক করিয়া একটা স্পর্শ লাগিত যে না চমকিয়া পারিত না। আর কাল রাত্রে তো মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকড়ি করিয়া গেল।

বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পায় নাই, তবে বাঁচিতে তাহার সাধ ছিল। অনেক গোপন সাধ তাহার ছিল। হঠাৎ মনে হইল—বসন্তের আত্মা যদি—। দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মা তো দেহের মমতায় অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে। গভীর নিশীথ রাত্রে বসন্ত যদি আসে চিতার পাশে তাহার অনেক সাধের অনেক রূপের দেহখানির সন্ধানে? বুকখান তাহার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সে একেবারে আসিয়া বসিল—শ্মশানের ভিতর বসন্তের চিতার পাশটিতে। রাত্রির তখন সবে প্রথম প্রহর। সব স্তব্ধ। সব অন্ধকার। শুধু বি ঝি পোকা ডাকিতেছে। শহরের আলো, কোলাহল অনেকটা দূরে। নিতাই চিতার পাশে বসিয়া মনে মনে বলিল—বসন এস! ...বসন এস!...বসন এস!

বসন্ত কিন্তু আসিল না।

সমস্ত রাত্রি শ্মশানে শিয়াল, শকুনা, কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের মধ্যে কাটাইয়া দিল, তাহার একে একে আসিল, কলহ করিল, খেলা করিল, চলিয়া গেল। গঙ্গার জলে কত জলচর সশব্দে ঘাই মারিল, কিন্তু বসন্তর দেখা মিলিল না। সারারাত্রি বালুচরের ধার ঘেষিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু কখনও মৃদু;

আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল; গঙ্গার ওপারে সড়কটায় কত গরুর গাড়ী গেল; গাড়ীর নীচে ঝুলানো আলো জুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন-চারিটার মত মনে হইল; সারারাত্রি জোনাকীগুলো জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল; গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মত। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্তের জন্য কোন কিছুর মধ্যে বসন্তর আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম পর্যন্ত হইল না, আকাশের তারাগুলা পূব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল; পূব আকাশের শুকতারা উঠিল নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গঙ্গার পূর্ব পাড়ের ঢালু চরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া, তার ওপরে সারি-সারি গ্রাম, গ্রামের গাছপালাগুলার মাথায় আকাশে ক্রমে ফিকে রঙ ধরিল, কল-কল কল-কল করিয়া পাখীগুলা একবার রোল তুলিয়। ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। না, বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। খোলা চোখের সামনে যে বসন্ত কোথাও ছিল না, নিতাই চোখ বুজিতেই সেই বসন্ত আশ্চর্য স্পষ্ট হইয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে —বসন্ত! বসন্ত!

চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল। ইহারই মধ্যে আকাশে অন্ধকারের ঘোর আরও কিছুটা কাটিয়াছে। নিতাইয়ের সম্মুখে গঙ্গা, শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা। কুকুরের পালগুলাও দেখা যাইতেছে। উদাস মনে আবার সে চোখ বুজিল। অদ্ভুত! এ কি! আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে। বসন্ত আসিয়ছে। চোখ বন্ধ করিলেই সে

দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্তর ছবি; ছবি নয় যেন সত্যকারের বসন্ত, সে হাসিতেছে, সে কথা বলিতেছে। পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি নয়, বসন্ত নুতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে, নূতন বেশভূষায় সাজিয়া নূতন রূপে দেখা দিতেছে।

নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল –

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—
কিসের জালা?
চিকন-কাল দিবস নিশি রাধায় যাচে।"

মনখানি তাহার পরিপূর্ণ মন হইরা উঠিল। এ যে কেমন করিয়া হইল তাহ সে জানে না, তবে হইল। বসন্ত তাহার হারায় নাই। পরিপূর্ণ মনেই সে গঙ্গার ঘাটে নামিয়া মুখ-হাত ধুইল, তারপর ফিরিল বাসার দিকে।

বাসায় তখন বাঁধাছাঁদার তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে!

দোহারটি রসিকতা করিয়া বলিল—আমি বলি, ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল।

নিতাই মৃদু হাসিয়া ছড়ার স্বরে তাহারই পুরানো একটা গানের দুইটি কলি আবৃত্তি করিয়া দিল—

“সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে—ভুবনে ভুবনে রহি কেমনে?
আমি যাব সেই পথে, যে পথ লাগে ভাল নয়নে।”

ললিতা ঠোঁটে পিচ কাটিয়া বলিল—বল কি বোনাই, অঙ্গে তবে তোমার ছাই কই?

নির্মলা কিন্তু আসিয়া সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব’স দাদা, আমি চা ক’রে দি।

বাজনদারটি আসিয়া মুদুস্বরে বলিল—কাল ছিলে কোথা বল তো? কার বাড়ীতে? সে কেমন হে? অর্থাৎ তাহার ধারণা নিতাই কাল রাত্রে বসন্তকে ভুলিবার জন্য শহরের কোন দেহব্যবসায়িনীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

বেহালদার ধমক দিল—থাম হে, থাম তুমি। যেমন তুমি নিজে, তেমনি দেখ সবাইকে। ব’স ওস্তাদ, ব’স। নিতাই হাসিয়া বসিল।

প্রৌঢ়া এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। একজন পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসন্তর কাপড়গুলি বেচিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাম-দস্তুর শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিল। নিতাইকে বলিল—ওগো বাবা, এই বেলাতেই উঠছি। গুছিয়ে তোমার জিনিসপত্তর বেঁধেছেঁদে নাও।

নির্মলা একটি বাটিতে তেলমাখা মুড়ি নামাইয়া দিয়া বলিল—চায়ের জল ফুটছে, ততক্ষণে মুড়ি কটি খেয়ে নাও। কাল তো সারারাত খাও নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—বোন নইলে ভায়ের দুঃখ কেউ বোঝে না।

—আর মাসী বেটীর কথা বুঝি ভুলেই গেলে বাবা? প্রৌঢ়া আসিয়া একটি মদের বোতল, গোটা দুয়েক গত রাত্রের সিদ্ধ ডিম, খানিকটা মাংস আনিয়া নামাইয়া দিল —কাল রাত থেকে আনিয়ে রেখেছি। খাও, শরীলের জুৎ হবে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—মা-মাসীকে কি কেউ ভোলে, না ভোলা যায়? চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—তুমি খাও, আমি আসছি। প্রৌঢ়া চলিয়া যাইতেই ঢুলীটা আরও কাছে আসিয়া বসিল। নিতাই হাসিয়া বলিল— নাও, নাও, ঢেলে লাও, আরম্ভ কর।

কৃতার্থ হইয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে চুপি চুপি বলিল—বসনের কাপড়চোপড় বিক্রী হয়ে গেল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না।

অভিযোগ করিয়া ঢুলীটা আবার বলিল—গয়না দু-এক পদ রেতে খুলে লাও নি কেনে, বল দেখি? এমুনি মুখ্যুমি করে, ছি!

নিতাই বোতল দেখাইয়া বেহালাদার ও দোহারকে বলিল—এস, লাও, তাহারাও এবার অপরিমেয় সহানুভূতির সঙ্গে কাছে আসিয়া ঘেষিয়া বলিল। কিছুক্ষণ পরেই বেহালাদার সচকিত হইয়া বলিল—ওই! বোতল শেষ হয়ে গেল! তুমি? তুমি তো কই—

নিতাই হাসিয়া বলিল—ত হোক, দরকার নাই।

—তুমি খাবে না?

—নাঃ।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নিতাই বলিল বেহালাদারকে—তোমার কাছে একটি জিনিস শিখবার সাধ ছিল। রাত্রে বেহালায় তুমি যে স্বরটি বাজাও ওই স্বরটি বেহালায় তুলতে শিখবো। গলায় পারি, বেহালায় শিখব।

বেহালাদার বলিল—নিশ্চয়। তোমাকে শেখাব না ওস্তাদ? দেখ দেখি! তিন দিনে শিখিয়ে দোব।

–নিতাই হাসিয়া বলিল—তিন দিন আর পাব কোথায় তোমাকে?

—কেনে? সবিস্ময়ে প্রশ্নটা করিল দোহার। বেহালাদার স্থির দৃষ্টিতে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে আঁচ করিয়াছে।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আজই আমি চলব।

—সে তো আমরাও। তুমি—

দোহারের মুখের উপর হাত দিয়া বেহালাদার বলিল—থাম তুমি থাম।

নিতাই কিন্তু দোহারের কথা ধরিয়াই জবাব দিল—হ্যাঁ যাব সবাই, তোমরা এক পথে, আমি আর এক পথে।

বেহালদার তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল, শুধু বলিল–ওস্তাদ!

নিতাই একটু চুপ করিয়া রহিল, কথার উত্তর দিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয় বেশ গল ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল;—মনে নুতন পদ আসিয়াছে।

“বসন্ত চলিয়া গেল হায়,
কালো কোকিল আজি কেমনে গান গায়
বল—কেমনে থাকে হেথায়!”

হঠাৎ বেহালাদার বেহালাটা টানিয়া লইয়া বলিল—শোন ওস্তাদ, শোনা, সেই সুর তোমাকে শোনাই, শোন। এসেছে।

সে ছড়ি টানিল—লম্বা টানা সুর। সেই সুর!

ইহারই মধ্যে আসিয়া হাজির হইল মাসী।

—বাবা। নিতাই হাত তুলিয়া ইসারায় জানাইল—এখন নয় একটু পরে। কিন্তু বেহালাদার খামিয়া গেল। সে মাসীর মুখ দেখিয়া থামিয়া গিয়াছে।

মাসী বলিল–কি শুনছি বাবা?

—কি মাসী?

—তুমি—? তুমি চলে যাবে? আমাদের সঙ্গে যাবে না?

—না মাসী। খেলার একপালা শেষ হল। এবার নতুন পালা।

—অন্য দলে—?

—না মাসী। এবার পথের পালা। এবার পথে পথে। প্রৌঢ়া অনেক বুঝাইল। অনেক প্রলোভন দেখাইল। বসন্তর গহনা কাপড়-চোপড়ের দামের অংশ পর্যন্ত দিতে চাহিল। আরও বলিল—বসনের চেয়ে ভাল নোক আমি দলে আনছি বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই সে থাকবে।

নিতাই বলিল—না মাসী, আর নয়।

নির্মলা কাঁদিল।

নিতাইও একবার চোখ মুছিয়া বলিল—না ভাই, তুমি কেঁদে না, তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাব।

বেহালাদার বলিল—তুমি বিবাগী হবে ওস্তাদ?

নিতাই ও প্রশ্নের জবাবে তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাই তো। বসন্তের সঙ্গে যে গাটছড়া ও গিঁট সে বাঁধিয়াছিল, সে গিঁট খুলিয়া গিয়াছে। বসন্ত আজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। এবার একটা নতুন ডাক যেন সে শুনিয়াছে। পথে পথে চলো মুসাকের। বেহালাদারের প্রশ্নে তাহার মনে অকস্মাৎ সুরটি বাজিয়া উঠিল।—বিবাগী?

বৈরাগ্যই তাহার ভাল লাগিল।

কবি – ২১ (শেষ)

ঝুমুরের দল ধরিল দেশের পথ।

নিতাই কোন পথে কোথায় যাইবে তাহা ঠিক করে নাই, তবে ওই দলটির সঙ্গে থাকিবে না তাহা ঠিক, সেই কারণে দলের বন্ধন কাটাইবার অন্য একটা পথ ধরিল। কাটোয়া হইতে ছোট লাইন ধরিয়া ইহারা চলিল মল্লারপুরের দিকে। নিতাই বড় লাইন ধরিয়া উত্তর মুখে চলিল। শেষ মুহূর্তে ঠিক করিয়া ফেলিল সে কাশী যাইবে।

নির্মলা অনেকখানি কাঁদিল। মেয়েটা তাহকে দাদা বলিত। দাদা বলিয়া নিতাইয়ের জন্য কাঁদিতে তাহার সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না।

শেষ মুহূর্তে ললিতাও কাঁদিল। বলিল—জামাই, সত্যিই ছাড়লে!

প্রৌঢ়া বর্তমানের আশা ছাড়িয়াও কিন্তু ভবিষ্যতের আশা ছাড়ে নাই। সে বলিল—চিরকাল তো মামুষের মন বিবাগী হয়ে থাকে না বাবা। মন একদিন ফিরবে, আবার চোখে রঙ ধরবে। ফিরেও আসবে। তখন যেন মাসীকে ভুলো না। আমার দলেই এসো।

বেহালাদার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

মহিষের মত লোকটাও কথা বলিল—চললে? তা— খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—সন্নাসী হওয়ার কষ্ট অনেক হে। ভিখ্ করে পেট ভরে না—তা নইলে—বেশ, এস তা হ’লে।

তাহারা যাইবে ছোট লাইনের ট্রেনে—যে লাইনের উপর নিতাইয়ের নিজের বাড়ী। ওই লাইনের ট্রেনেই নিতাই আসিয়াছিল—গ্রাম ছাড়িয়া। সেই ছোট গাড়ীতেই চড়িয়া মাসী বলিল—এস বাবা, এই গাড়ীতেই চড়। এই নাইনেই তো বাড়ী । মন খারাপ হয়েছে—বাড়ী ফিরে চল বাবা।

বাড়ী! নিতাই চমকিয়া উঠিল। বাড়ী! স্টেশন! সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ! সেই রেল লাইনের বাঁক! সেই স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল! সোনার বরণ ঝকঝকে ঘটি মাথায় ক্ষার-ধোওয়া মোট খাটো কাপড় পরা অতি কোমল কালো মেয়েটি! সেই তাহার ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল সেই কতকালের পুরানো গান—

"কালো যদি মন তবে কেশ পাকিলে কঁদি কেনে?

কালো চুলে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

নিতাইয়ের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। অদ্ভুত হাসি। কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা—কত পুরানো গান!

তবুও নিতাই বার বার ঘাড় নাড়িয়া নীরবেই জানাইল—না। না। না। না।

তাহার মনের মধ্যে সেই গানের কলি গুঞ্জন করিতেছিল—"চাঁদ তুমি আকাশে থাক।" মনে ঘুরিতেছিল—"তাই চলেছি দেশান্তরে—"—সে আবার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল— না। ঠাকুরঝি এতদিনে ভাল হইয়াছে, ঘরসংসার করিতেছে। সে গিয়া আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবে না। না। না সে যাইবে না। সে যাইবে না।

নিতাই নীরবেই বিদায় লইল। এই বিদায় তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। দলের প্রত্যেক জনটির মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল— বিদায়-ব্যথা-কাতর ম্লান মুখ। কাহারও সহিত কোনদিন তাহার ঝগড়া হয় নাই কিন্তু তাহারা যে এত ভাল—এ কথা আজিকার দিনের এই মুহূর্তটির আগে কোনদিন কোন একটিবারের জন্যও মনে হয় নাই। বরং সে সময় তাহদের দোষগুলাই অনেক বড় হইয়া তাহার চোখে পড়িয়াছে। মাসীকে দেখিয়া মনে হইত মুখে মিষ্টি কথা বলিলেও সমস্ত অন্তরটা বিষে ভরা, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিতে জানে না। পৃথিবীতে খাদ্য এবং অর্থ ছাড়া আর কিছুকে ভালবাসে না মাসী। আজ মনে হইল—না, না, মাসী—

মাসীরই মত, ময়েরই মত ভালবাসিত তাহাকে। তাহার চোখের ওই কয় ফোঁটা জল বসন্তের মরণকালের ভগবানের নামের মতই সত্য।

নির্মলা চিরদিন ভাল। মায়ের পেটের বোনের মতই ভাল।

ললিতার চোখা চোখা ঠাট্টাগুলি—শ্যালিকার মুখের ঠাট্টার মতই মিষ্ট ছিল।

বেহালাদারের কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। কানের কাছে বাজিয়া উঠিল সেই সুর।

সেই সুরটাই ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে ফিরিয়া বসিল গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করিয়া সে মনে মনে একখানি গঙ্গা স্তব রচনা করিবার চেষ্টা করিল । হইল না। ঘাটের উপরেই একটা গাছের তলায় আসিয়া সে বসিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিবে বাউল দরবেশের মত? না। এ কল্পনা তাহার ভাল লাগিল না। তবে? কি বা করিবে— কোথায়ই বা যাইবে? হঠাৎ তাহার মনে হইল—হায় হায় হায়, হায় রে পোড়া মন! এই কথা কি ভাবিতে হয়? ঠাকুর, ঠাকুরের কাছেই যাইবে সে! গোবিন্দ। বিশ্বনাথ! প্রভু, প্রভুর কাছে যাইবে সে! মায়ের কাছে যাইবে! মা অন্নপূর্ণা। রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী! সে সেই সব দেবতার দরবারে বসিয়া গান গাহিবে—মহিমা কীর্তন করিবে—ভগবানকে গান শুনাইবে—শ্লোতারা শুনিয়া চোখের জল ফেলিবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কিছু কিছু দিয়া যাইবে—তাহাতেই তাহার দিন গুজরান হইবে। তাহার ভাবনা কি? হায় রে পোড়া মন—এতক্ষণ তুমি এই কথাটাই ভাবিয়া পাইতেছিলে না? এখান হইতে কাশী, বাবা বিশ্বনাথ—মা অন্নপূর্ণা। কাশী হইতে অযোধ্যা, সীতারাম-সীতারাম! সীতারামের রাজ্য হইতে রাধাগোবিন্দ, রাধরাণী—রাধারাণীর রাজ্য বৃন্দাবন।

তারপর মথুরা—না, না, মথুরা সে যাইবে না। রাধারাণীকে কাঁদাইয়া রাজ্যলোভী শ্যাম রাজা হইয়াছে সেখানে, সে রাজ্যে নিতাই যাইবে না। মথুরা হইতে বরং কুরুক্ষেত্র–হরিদ্বার।

হরিদ্বারের পরেই হিমালয়—পাহাড় আর পাহাড়। ছেলেবেলায় পড়া ভূগোল মনে পড়িল—পৃথিবীর মধ্যে এত উচু পাহাড় আর নাই—হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর। হিমালয়ের মধ্যেই মানস-সরোবর। সেখান পর্যন্তও নাকি মানুষ যায়। নিতাই মানস-সরোবরে স্নান করিবে। তারপর জনশূন্য হিমালয়ের কোথাও একটা আশ্রয় বানাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। নিত্য নূতন গান রচনা করিবে—গাহিবে, পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া খুদিয়া লিথিয় রাখিবে। সে মরিয়া যাইবে—তাহার পর যাহার সে-পথ দিয়া যাইবে তাহারা সে গান পড়িবে আর মনে মনে নিতাই-কবিকে নমস্কার করিবে।

শেষ বৈশাখের দ্বিপ্রহর। আগুনের মত তপ্ত ঝড়োহাওয়া গঙ্গার বালি উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দুই পায়ের শস্যহীন চরভূমি ধূসরবর্ণ-যেন ধুধু করিতেছে। মানুষ নাই, জন নাই; কেবল দুই-চারিটি চিল আকাশে উড়িতেছে—তাহারাও যেন কোথায় কোন দূরদুরন্তরে চলিয়াছে। সব শূন্য—সব উদাস—সব স্তব্ধ—একটা অসীম বৈরাগ্য যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই সেই অগ্নিগর্ভ রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল। "চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠোরী—বহুদূর যানা হোগা।" কাশী! সে স্টেশনে ফিরিয়া বড় লাইনে কাশীর টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িল।

নিতাই আসিয়া উঠিল কাশীতে।

ব্রিজের উপর ট্রেনের জানাল দিয়া কাশীর দিকে চাহিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকা চাঁদের ফালির মত গঙ্গার সাদা জল ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—সমস্ত কোল জুড়িয়া মন্দির, মন্দির আর ঘাট, আরও কত বড় বড় বাড়ী। নিতাইয়ের মনে হইল মা-গঙ্গা যেন

চোখঝলসানো পাকা বাড়ীর কণ্ঠি গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছেন। ট্রেনের যাত্রীরা কলরব তুলিতেছে—জয় বাবা বিশ্বনাথ —অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়!

সেও তাহদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বর মিশাইয়া দিল। জয়ধ্বনির স্বরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া দিল। জয় বাবা বিশ্বনাথ! অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়!

স্টেশনে নামিয়া কিন্তু অকস্মাৎ একসময় তাহার মনের ছন্দ কাটিয়া গেল। সে যেন হুঁচোট খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সে বিব্রত এবং বিহ্বল হয়ে অনুভব করিল সে কোন বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে!

বাংলা দেশের শেষ হইতেই সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। ট্রেনে ক্রমশই ভিন্নভাষাভাষী ভিন্ন বেশভূষায় ভূষিত লোকের ভিড় বাড়িতেছিল। কাশীতে নামিয়াই সে ভিন্ন ধরণের মামুষের মেলার মধ্যে মিশিয়া গিয়া এক সময় প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল যে, এখানকার মানুষের জীবনের ছন্দের সঙ্গে তাহার জীবনের ছন্দ কোনখানে মিলিতেছে না। তাহার উপর কাশী-কাশী-কাশী—তাহার কল্পনার কাশী কোথায়? সে তো এই দোকানদানিভরা বিকিকিনির কোলাহলে মুখর এই নগরীটি নয়! কোথায় সেই বিশ্বনাথের কাশী?

বিহ্বলের মতই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এক পথ হইতে অন্য পথে চলিতেছিল। কতক্ষণ চলিয়াছিল তাহার ঠিক ছিল না। অবশেষে একখানা এক্কায় উঠিয়া সে এক্কাওয়ালাকে কোনমতে বুঝাইল যে সে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবে। এক্কাওয়ালাই তাহাকে একটা চৌরাস্তায় নামাইয়া দিয়া বলিল—এই দিকে যাও! সেই পথে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ তাহার মুখ চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পূজার থালা হাতে ধপধপে সাদা খান পরিয়া একটি মহিলা যাইতেছিলেন। সে আনন্দে অধীর হইয় তাহার

দিকে আগাইয়া গেল। তাহার মনে হইল—এ যে তাহাদের গ্রামের সেই রাঙা মা-ঠাকুরুণ। হ্যাঁ-তিনিই তো! তেমনি ঝলমলে সম্ভ্রম-ভরা ভঙ্গিতে কাপড় পরিয়াছেন, মাথায় তেমনি আধ-ঘোমটা, মাথার চুলগুলি তেমনি ছোট করিয়া ছাঁটা—অবিকল তিনি। হারাইয়া-যাওয়া ছেলে যেন মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে এমনিভাবেই নিতাই আশ্বস্ত এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁহার আগে গিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

না, রাঙা মা-ঠাক্‌রুণ নন, তবে ঠিক রাঙামায়ের মতই। ইনি যে তাহদের দেশের অন্য কোন গ্রামের আর কোন রাঙামা—তাহাতে নিতাইয়ের আর সন্দেহ রহিল না। এবং সত্যসত্যই সে হিসাবে তাহার ভুল হইল না –তিনি বাঙালী বিধবা এবং যাঁহারা গ্রামে মা-ঠাক্‌রুণ হইয়া দাঁড়ান তাহদেরই একজন বটেন। পতিপুত্রহীন বাঙালী বিধবা কাশীতে বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে তাকাইয়া আছেন। জীবনের বোঝা নামাইবেন সেইখানে। মন্দিরে পূজা সারিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নিতাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—মা-ঠাক্‌রুণ!

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—কে তুমি বাবা?

নিতাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে মা, আমি এখানে বড় 'বেপদে' পড়েছি।

'বেপদ' শব্দটি তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিল। শব্দটি শুনিয়া তিনি বুঝিলেন লোকটি পল্লীর মানুষ এবং একেবারে নূতন এখানে আসিয়াছে।

তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কি বিপদ বাবা?

—আমি এখানকার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না মা! তার ওপর গরীব নোক', আশ্রয় নাই; নতুন এসেছি।

হাসিয়া তিনি বলিলেন—বুঝেছি এস, আমার সঙ্গে এস। স্টেশন থেকে আসছ বুঝি?

—হ্যাঁ মা! পথে পথে নিতাই যেন বাঁচিয়া গেল।

তাহার এই নূতন মা–তাঁহাকে সে নূতন মাই বলিল; তিনি নিতাইকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। মানুষটি বড় ভাল।

নিতাই মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যবিধাতাকে বলিল—প্রভু, তোমার মত দয়াল আর হয় না। অধমের ওপর দয়ার তোমার শেষ নাই। নইলে এমন বিদেশে বিভূরে এসেও মা যশোদার মত মায়ের আশ্রয় পেলাম কি ক'রে?

এই নূতন মা তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। কোন এক আদিঅন্তহীন আঁকাবঁকা গলির ভিতর তার বাসা—একখানি ঘর, এক টুকরা বারান্দা। আর রান্না করিবার জন্য ছোট আর একটা বারান্দার একটা কোণ। নিতাই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমি বরং বাড়ীর বাইরে বসি। জাতে আমি বড় নীচু।

—কেন বাবা? এই বারান্দায় ব'স। হ'লেই বা নীচু জাত।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল। সত্যই মা যশোদা। বৃন্দাবনের মায়েরা—যশোমতীর দেশের মায়েরা কেমন মা তাহা সে জানে না, কিন্তু তাহার দেশের মায়ের ছাড়া যশোদার মত মা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। সে দেখিয়াছে এই দেশের কত লোক —হিন্দুস্থানী কথা যাহারা বলে—তাহারা তাহাদের দেশে যায়–অনায়াসে এক বৎসর, দুই বৎসর এক নাগাড়ে কাটাইয়া দেয়, কই মাকে দেখিবার জন্য তো তাহারা ছুটিয়া যায় না! মায়েরাও নিশ্চয় দেশে দিব্য থাকে! যে যশোদা গোপালকে এক বেলার জন্য গোষ্ঠে পাঠাইরা কাঁদিতে বসিতেন, সে যশোদার মত মা তাহারা কি করিয়া হইবে? তা ছাড়া এমন মিষ্ট কথা—আহা-হা-রে —মা গো মা! না—কি বাবা গোপাল! এমন ডাক—এমন সাড়া— আর কোথায় মেলে?

মা তাহাকে একে একে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি নাম, কোথা ঘর, কোথা পোস্টাপিস, কোন্ জেলা? অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেনা, বাড়ীতে কে কে আছে বাবা? মা, ভাই, বিয়ে করনি বাবা? নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরঝিকে, মনে পড়িয়া গেল বসন্তকে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

নূতন মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণ—কত ঘর কোন জাত আছে বাবা মাণিক? তোমাদের কোন স্টেশন? তোমাদের ওদিকে গেল বার ধান কেমন হয়েছিল বাবা? ধান ছাড়া আর কোন ফসল হয়? বর্ষা কেমন হয় বাবা? বাদলা হয় ঘন-ঘন?

মায়ের চোখ দুইটি স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল।

—বর্ষায় কাদা কেমন হয় বাবা? তোমাদের দেশের ভাবের গাছ বেশী, না তালের গাছ বেশী? ডাবের দর কি রকম? মাছ কেমন—কোন মাছ বেশী? তোমাদের দেশের মুড়ি কেমন হয় বাবা?

নিতাই একে একে জবাব দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এক একটি ছবি।

–তোমাদের গ্রামের কাছে নদী আছে বাবা? বড় দীঘি আছে গ্রামে? আঃ, কতদিন দীঘির জলে স্নান করি নাই! দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে? শালুক সব গ্রামেই আছে। নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে? কলমীশুশুনীর শাক হয় বাবা?

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ফুরাইয়া যায়। মা চুপ করিয়া থাকেন উদাস মনে। বোধ হয়, তাহারও মনে পড়ে দেশের কথা। আবার হঠাৎ মনে পড়ে কোন একটা নূতন কথা, সেইটার পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় আবার এক বাক প্রশ্ন।

—তোমাদের ওদিকে সজনের ডাঁটা হয়? 'নজনে' আছে? পানের বরজ আছে? কেয়া-র গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোড়ায়? গোখরো কেউটে সাপ খুব বেশী ওদিকে, না? নদীর ধারে শামুকভাঙা কেউটে থাকে? গাঙ-শালিক আছে। বউ কথা কও পাখী আছে? থাকবেই তো। 'চোখ গেল' অনেক আছে, না? 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী? অনেকে বলে গেরস্তের খোকা হোক, গায়ের রঙ হলুদ, মাথাটি কালো, ঠোঁটটি লাল টুকটুকে, আমরা বলি—'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী। বেনে বউও বলি—আছে?

হঠাৎ মায়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। দেখিতে দেখিতে ফোঁটা দুই জল যেন আপনা-আপনি চোখ কাটিয়া বাহির হইয়া টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নিতাই কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া চোখে জল আসিল দেখিয়া তাহার মনে হইল—বোধহয় তাহার কৃষ্ণও কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন—মা যশোদা গোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাটছিলেন। বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গড়লেন এক পাখী। সেই পাখীর মাথায় ঝরে পড়ল-তাঁর চোখের এক ফোট জল! সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো—আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত, সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল। পাখীটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন–পাখী, তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায়। পাখী ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল—'কৃষ্ণ কোথা রে?' 'কৃষ্ণ কোথা রে?' চিরকাল সে ডেকেই ফিরছে।

নিতাইয়ের চোখ দিয়াও জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

মা বলিলেন—আমার কৃষ্ণও চলে গেছে বাবা। ব্রহ্মাণ্ডেও আর কেউ নেই। তাই এসেছি বাবার চরণে। নইলে দেশ ছেড়ে— অর্ধপথেই থামিয়া মা চোখ মুছিলেন। আবার প্রশ্ন

করিলেন—তুমি কাশী এসেছ তীর্থ করতে? এই বয়সে তীর্থ? কিছু মনে ক'রো না বাবা—তোমাদের জাতের কেউ তো এমন ভাবে আসে না! তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হাত দুটি জোড় করিয়া নিতাই বলিল–পূর্বজন্মের কর্মফল—হয়তো আমার কর্মফের, নইলে— নিতাই কথাটা শেষ না করিয়াই চুপ করিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন–কি বলছিলে বাবা?

নিতাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কাছে লুকোব না মা। আমার বাবা, দাদা, ভাই, মামা, মেসো এরা সব চুরি-ডাকাতি করত। জেলও খাটত। সেই বংশে আমার জন্ম মা। আমি—বলিয়া সে থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার বলিল—বলিতে সে বোধহয় সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, সসঙ্কোচেই বলিল— দেশে কবিগান শুনেছেন মা? দুই কবিয়ালে মুখে মুখে গান বেঁধে পাল্লা দিয়ে গান করে?

—শুনেছি বইকি বাবা। কত শুনেছি। আমাদের গায়ে নবান্নের সময় বারোয়ারী অন্নপূর্ণা পূজো হত। কবিগান হ'ত পূজোয়। দুর্গাপূজোয় হ'ত যাত্রাগানা, কৃষ্ণযাত্রা–শখের যাত্র। নীলকণ্ঠের গান—"সাধে কি তোর গোপালে চাই গো? শোন যশোদে!" সে সব গান কি ভুলবার। মনসার ভাসান গান হ'ত মনসাপূজোয়। চব্বিশ প্রহরের সময় কীর্তন হ'ত! বাউল বৈরেগীরা খঞ্জনী একতারা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করত—"আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া " আহা-হা! বাবা সেই কীর্তন-গানে শুনেছিলাম—"অমিয় মথিয়া কেবা লাবনি তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ"–গোরাচাঁদের দেহ অমৃত ছেঁকে তৈরী হয়েছে। এ সব গান যে অমৃত-ছাঁকা জিনিস বাবা। কবিগান শুনেছি বইকি!

চুপ করিয়া গেল। ইহার পর আর নিজেকে কবিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হইল না।

বিধবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কবির দলে থাকতে বাবা? নিজে কবিগান করতে?

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলিল—হ্যাঁ মা, অধম একজন কবিয়াল। তবে মা বড় দরের কবিয়াল আমি নই। আমি ঝুসুর দলের সঙ্গে থেকে গান করতাম।

—তা হোক না বাবা! কবিয়াল তো বটে। তা তীর্থ করতে বেরিয়েছ বুঝি?

একটু চুপ করিয়ু থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ফিরব বলে বেরুই নাই মা। ইচ্ছে আছে ভগবানের দরবারে পথে পথে গান করব, তাতেই দিন কটা কেটে যাবে আমার।

বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তাতে তো তুমি মুখ পাবে না বাবা। তুমি কবিয়াল–গান গাইবে—লোককে আনন্দ দেবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মেডেল পাবে, কত লোক কত প্রশংসা করবে—তবে তো তোমার আনন্দ হবে, মুখ হবে! বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।–সুখ সংসারে মেলে না বাবা। যদি মেলে, যদি বিশ্বনাথ দেন তো তোমার আপন কাজের মধ্যেই পাবে।

অপরাহ্ণে সে মায়ের কাছ হইতে বিদায় হইল। ইহারই মধ্যে সে তাহার সকল কথাই বলিল। রাজার কথা, বিপ্রপদর কথা। এমন কি বসন্তের কথাও বলিল। বলিল না শুধু ঠাকুরঝির কথা। শুধু তাই নয়, তাহাকে সে গানও শুনাইল।

মায়ের বৃত্তান্তও সে সব জানিল। আপনার জন মায়ের কেউ নাই, একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া মা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দেশ হইতে জ্ঞাতিরা যাহারা তাহার শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াছে, তাহারা মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠায়, তাও অনিয়মিত। মা হাসিয়া বলিলেন–পেটের জন্যে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না বাবা, লজ্জা হয়। আহার কমিয়ে আধপেট অভ্যেস করলে এক মাসের খোরাকে দুমাস যায়। তার মধ্যে উপোস করতে পারলে —বিধবার উপেস তো অনেক।

নিতাই অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঃ—সে মায়ের এই আধপেটা অন্নের ভুগি লইয়াছে! মা তাহাকে হাসিমুখে দিয়াছেন। ও:! সে বলিল—আমি এইবার উঠি মা! থাকলে আবার আসব।

নিতাই প্রণাম করিল, দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বলিল—আপনি দু'পা পিছিয়ে যান মা। আমি ওই ঠাঁইটির ধুলো নেব।

মা বলিলেন—তুমি আমার পা ছুঁয়েই নাও বাবা। আমি তে চান করব এখুনি।

—না। নিতাই তাহার পা ছুঁইল না।

মা বলিলেন—অনেক সত্র আছে; জায়গা মিলবে। আমার ঘর এই তো দেখছ—তা, ছাড়া এ বাড়ীতে আর দশজন থাকে। সবাই মেয়েছেলে এখানে—

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেবতার দেখা খানিকক্ষণের জন্যই বটে মা। চিরকালের পুণ্যি তো আমার নয় মা অন্নপূর্ণা আপনি আমার সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

মা বলিলেন—তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে। এ তো বাংলা গানের দেশ নয় বাবা। অবিশ্যি গঙ্গার ঘাটে—ঘাট তো এথানে অনেক আর বাঙালীও অনেক—সেখানে বসে গান করলে অনেক শুনবার লোক পাবে—কিছু কিছু হয়তে পাবেও। কিন্তু সংসারে পেট চলাই তো সব নয় বাবা। একটু বিষন্ন হাসির সঙ্গে কথাটি শেষ করিলেন মা।

এই কথাটার নিতাই একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এই লইয়া মা তাহাকে দুইবার কথাটা বলিলেন। সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া মায়ের কথার সত্যতা কিন্তু সে অনুভব করিল। ঘটনাট ঘটিল এইরূপে। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দিরশীর্ষের ধ্বজ ও কলসের

দিকে সে তাকাইয়া ছিল। সোনার পাত দিয়া মোড়া মন্দির। আকাশে ছিল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার ছটায় ঝলমল করিতেছিল।

চারিদিকে আরতি ও শৃঙ্গার-বেশ দর্শনার্থীর ভিড়। হাজার কণ্ঠে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি, সেই ধ্বনির সঙ্গে সে নিজের কণ্ঠও মিশাইয়া দিল—জয় বিশ্বনাথ!

তারপর সে মনে মনে গান রচনা আরম্ভ করিল—

“ভিখারী হয়েছে রাজা মন রে আমার দেখ রে নয়ন মেলে
সাতমহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে।”

গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল—আহা! প্রাণ ঢালিয়া সে গাহিতেছিল।

গান শেষ হইলে—অল্প কয়েকজন লোক, যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল—তাহদের একজন তাহাকে কিছু বলিল—তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল—কি বললেন প্রভু? আমি বুঝতে পারতা নাই।

একজন হাসিয়া বাংলায় বলিল—তুমি বুঝি সবে এসেছ দেশ থেকে?

–আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বলছেন হিন্দী ভজন গাইতে। তোমার এমন মিষ্টি গল, তোমার কাছে হিন্দী ভজন শুনতে চাইছেন।

—হিন্দী ভজন? নিতাই জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল-আজ্ঞে প্রভু, আমি তো হিন্দী ভজন জানি না।

বাঙ্গালীটি হিন্দী-ভাষী প্রশ্নকারী লোকটিকে যাহা বলিল, আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল; বোধ হয় বলিল—হিন্দী ভজন ও জানে না।

জনতার অধিকাংশই এবার চলিয়া গেল। যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়া নিতাইয়ের মনে হইল।

* * *

মন্দির হইতে সরাসরি আসিয়া সে গঙ্গার ঘাটে হাজির হইল।

চোখ তাহার জুড়াইয়া গেল! আহ, এ যে দিন-রাত্রি মেলা লাগিয়াই আছে। আর এ কি বিচিত্র মেলা! মা গঙ্গাকে সামনে রাখিয়া এ যেন ভবের খেলার হাট বসিয়া গিয়াছে! একদিকে মণিকর্ণিকা অন্যদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে শ্মশানচুল্লী জ্বলিতেছে অবিরাম; ধ্বনি উঠিতেছে রাম-নাম সত্য হ্যায়। লোকে বলে এখানে যাহারা ভস্ম হইল তাহারা শিবলোকে চলিয়া গেল। শিবরাম! শিবরাম! শিবশম্ভূ! কি তাহার মনে হইল, দশাশ্বমেধ হইতে পথের জনকে শুধাইয়া শুধাইয়া আসিয়া উঠিল মণিকর্ণিকার ঘাটে। মণিকর্ণিকার ঘটে আসিয়া হঠাৎ সে পুটুলিটা খুলিয়া বাহির করিল একটা পিতলের আংটি। অংটিটা বসনের। বসনের এই একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন তাহার কাছে আছে। সেইটিকে এই রাজা মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে। এই পুণ্যে বসনের সকল পাপ মুছিয়া যাক।

বসন তুমি স্বর্গে যাও।

কিন্তু ফেলিতে গিয়াও সে ফেলিতে পারিল না। হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে প্রায় ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। বসনের আর কিছু নাই। শুধু এইটুকু! না—থাক এটুকু। থাক। তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত থাক। ওঃ! বসন দিন-দিন হারাইয়া যাইতেছে। কাশী আসিয়া অবধি বসনকে তাহার বোধ করি মনেই পড়ে নাই। স্বপ্নও

দেখে নাই। কাটোয়ার ঘাটে বসিয়া সে চোখ বুজিলেই বসনকে দেখিয়াছিল। গান বাঁধিয়াছিল—

“মরণ তোমার হার হ’ল যে মনের কাছে!
ভাবলে যারে—কেড়ে নিলে—সে যে আমার মনেই আছে, মনেই আছে!”

কিন্তু কই? ওঃ! মনের কদমতলাও শুকাইতে শুরু করিয়াছে। বুসনের মুখটা পর্যন্ত ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সেই গানটি আবার গুনগুন করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে।
ভালবেসে মিটাল নাসাধ কুলাল না এ জীবনে।
হায়-জীবন এত ছোট কেনে—?
এ ভুবনে?

আংটিটা সে হাতের কড়ে আঙুলে পরিয়া ফিরিয়া আসিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মনটা তাহার জুড়াইয়া আসিল। বড় ভাল স্থান এই দশাশ্বমেধ ঘাট। এত বড় তীর্থ আর হয় না। কত দেশের কত মানুষ। কত পাঠ। কত গান। কত দান। কত ভিক্ষা কত কামনা। কত দুঃখ। এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘাটটা কত প্রশস্ত! মনে হইল—এই ভাল। বাকী দিনগুলা এই ঘাটে ঘাটে বাসা বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

পরদিন অপরাহ্নে সামনে গামছা পাতিয়া ঘাটের এক পাশে বসিয়া সে গান ধরিয়া দিল—

এই খেদ মোর মনে।

কণ্ঠস্বর তাহার অতি মিষ্ট। লোক জমিল। পয়সাও কিছু পড়িল। কিন্তু গান শেষে একজন বলিল—কাশীতে এসে এ খেদ কেন হে ছোকরা?

একজন মহিলা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, ভাল গান গাও। মহাজনের পদ গাও। রামপ্রসাদের গান—কমলাকান্তের গান—এই সব গান।

সে এবার ধরিল—

"আমার কাশী যেতে মন কই সরে?
সর্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!"

গান শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন তাহার বিকল হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্যরটা এক গভীর বেদনার উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশেপাশে ফিরিতেছেন। মায়ের পিছু পিছু যেন বসন ফিরিতেছে; ঠাকুরঝি ফিরিতেছে; রাজন ফিরিতেছে। বিপ্রপদ ফিরিতেছে। মাসী বেহালাদার—ভিড় করিয়া ফিরিতেছে। কাশীর চেয়ে তাহার গ্রাম ভাল। কাশীতে জীবনের জন্য খেদ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু জীবনের জন্য খেদ না করিয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া? নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। এখানে এখন প্রচণ্ড গরম। ঘাটে ও ঘাটের উপর পথে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, আলাপ-আলোচনা চলিতেছে—কিন্তু সব কথাই যেন নিতাইয়ের নিকট হইতে বহুদূরের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, স্বরধ্বনির রেশই কানে

আসিতেছে, কিন্তু শব্দের অর্থের কথা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। কাছে থাকিয়াও মানুষগুলিও যেন অনেকদূরের মানুষ।

ভাল লাগিতেছে না। এ তাহার ভাল লাগিতেছে না। হোক কাশী; বিশ্বনাথের রাজত্ব; স্বর্গের সিংহ-দরজা, তবু তাহার ভাল লাগিতেছে না। ভিক্ষা তাহার ভাল লাগিতেছে না। মহাজনের পদ তাহার ভাল জানা নাই। আর নিজের গান ছাড়িয়া ওসব গান যত ভাল হোক গাহিয়া কাল কাটাইবার কল্পনাও করিতে পারে না সে। নিজের যেন ওরকম পদ ঠিক আসেও না। তাহার উপর, সে ভিক্ষা বৃত্তিতেও ঠিক আনন্দ পাইতেছে না। কোথায় আনন্দ। সে অন্তত পাইতেছে না। কবিগানের আসর। ঝলমলে আলো। হাজারে লোক। ভাল লাগিতেছে না তাহার।

মনে পড়িল মায়ের কথা কয়টি। কবিয়াল তুমি, দেশে ফিরে যাও। স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে—তাহার খেয়াল ছিল না—অকস্মাৎ সে অনুভব করিল জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সচেতন হইয়া—চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—লোকজন নাই; বোধ হয় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর দুই-চারিজন লোক ঘুমে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সেও ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল। এই গভীর রাত্রে অচেনা শহরে পথ চিনিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। আর কোথায়ই বা যাইবে? চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল ঘাটের নীচে গঙ্গাস্রোতের নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সেই শবাই সে শুনিতে লাগিল। অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়িত অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভূত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল —গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল—গঙ্গাও যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। কাটোয়ায়, নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে; কাটোয়ায়, যে-দিন বসন্তর দেহ পোড়াইয়াছিল, সে দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল। এখানকার সবই কি দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়?

আবার তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। সমস্ত দিনের মধ্যে পাখীর ডাক সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু ‘বউ কথা কও’ বলিয়া তো তাহদের কেউ ডাকে নাই; ‘চোখ গেল’ বলিয়া তো কোন পাখী ডাকে নাই—’কৃষ্ণ কোথা রে’ বলিয়াও তো কোন পাখী কাঁদিয়া ফেরে নাই ” কাকের স্বর পর্যন্ত কেমন ভিন্ন রকম! মা তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সঠিক।

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—বিশ্বনাথ? বিশ্বনাথই যে এই রাজ্যের রাজা; তবে তিনিও কি—এই দেশেরই ভাষা বলেন? তাহার এই ভক্তদের মতই তবে কি তিনি তাহার কথা— তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না? হিন্দী ভজন? হিন্দী ভজনেই কি তিনি বেশী খুশী হন? ‘মা অন্নপূর্ণা –তিনিও কি হিন্দী বলেন? ক্ষুধার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন— তবে কি ওই হিন্দীতে কথা বলিবেন? তবে? তবে? তবে সে কাহাকে গান শুনাইবে? আবার তাহার মনে পড়িল—তাহাদের গ্রামের ‘মা চণ্ডী’কে, সঙ্গে সঙ্গে ‘বুড়াশিব’কে। পাগলিনী ক্ষ্যাপা মা। ভাঙড় ভোলা!

“ওমা দিগম্বরী নাচ গো।”

সঙ্গে সঙ্গে বেহারার কাঁধে চড়িয়া ক্ষ্যাপী মা নাচে।

“হাড়ের মালা গলায় ভোলা নাচে থিয়া থিয়া।”

ভোলানাথ নাচে, তাহার সঙ্গে গাজনের ভক্তেরা নাচে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক আশেপাশে যাহার দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারাও মনে মনে নাচে। আবার সর্বনাশী

এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে সবাই। সবাইকে মনে পড়িল।

প্রথমেই মনে পড়িল ঝুমুর দলটিকে—নির্মলা বোনকে মনে পড়িল—ললিতাকে মনে হইল, মাসী আসিয়া 'বাবা' বলিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল। বেহালাদার, দোহার, বাজনদার, রাজন, বণিক মাতুল, বিপ্রপদ ঠাকুর, সকলে দূরে যেন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরঝিকে মনে পড়িল, কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ওই যে! —গ্রামের ধারের নদী ও নদীর ধারে চরভূমিতে তরির চাষ, বিস্তীর্ণ মাঠ, বৈশাখে মাঠের ধূলা, কালবৈশাখীর ঝড়, কালো মেঘ, ঘনঘোর অন্ধকার, সেই চোখ ধাঁধানে বিদ্যুৎ—সেই কড়্ কড়্ শব্দে মেঘের ডাক —ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি—সব মনে হইল। পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজার উৎসব। ঢাক শিঙা কাঁসির বাজনার সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্তদলের নাচ। গভীর রাত্রে বাগান হইতে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ; কত কথা মনে পড়িল;–বাবুদের পুরানো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মত গোখরার বাস; গোখুরাগুলা ডালে ডালে বেড়ায়, দোল খায়; কিন্তু ভক্তের যখন 'জয় ধর্মরঞ্জো' বলিয়া রোল দিয়া গাছে চড়ে, তখন সেগুলা সন্তর্পণে কোথায় গিয়া লুকাইয় পড়ে। বাগানের সেই পুরানো বটগাছতলায় অরণ্যষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল। আল-পথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড়চোপড় পর সারিবন্দী মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আল-পথের দু'ধারে লকলকে ঘন-সবুজ বীজধানের ক্ষেত; মাঝখান দিয়া পথ। আষাঢ় আসিতেছে। আকাশে হয়তো ইহারই মধ্যে মেঘ দেখা দিয়াছে, শামলা রঙের জলভরা মেঘ। ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের 'বার-মেসে' গানের কথা মনে হইল।

বৈশাখে সুর্যের ছটা—

যত সূর্য-ছটা, কাটফাটা, তত ঘটী কালবৈশাখী মেঘে—
লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্ত চাষ-ক্ষেতের লেগে।,
পুণ্য ধরম মাসে–
পুণ্য—ধরম মাসে—ধরম আসে- পূর্ণিমাতে (সবে) পূজে ধর্মরাজায়—
আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়।
তারপরে জ্যৈষ্ঠ আসে—
জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষতলে, মেয়ের দলে অরণ্যষষ্ঠী পূজে।
জামাই আসে, কন্যা হাসে—সাজেন নানা সাজে।
দশহরায় চতুভূজা—
দশহরায় চতুভূজ গঙ্গা পূজা, এবার সোজা মাঠ ভাসিবে বস্তায়—'
আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি— চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

এমনি করিয়া আষাঢ়ের রথযাত্রা–বর্ষার বাদল–অম্বুবাচীর লড়াই, শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধানভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজীর আখড়ায় ঝুলন-উৎসব দেখার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্যন্ত মনে করিয়া করিয়া সে এক নূতন বারমেসে গান মনের আবেগে রচনা করিয়া ফেলিল—

বছর শেষে-চৈত্র মাসে—
বছর শেষে চৈত্র মাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পূজোর টাটে।
ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটছে শুধু মাঠে—
তেল নাহি হ্যায় শিবের মাথায়, ভরল জটায়–অঙ্গেতে ছাই গাজনে ভূত নাচায়।
আমার পরাণ কাঁদে— হায় রে বিধি—পক্ষ মেলে উড়ে যেতে চায় ॥

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

অধীর হইয়া সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বারবার এখানকার নূতন-মাকে মনে মনে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুমি আমাকে ছলনা করেছ মা! সেখানকার মা তুমি, আমাকে ফেরাবার জন্য আগে থেকে এখানে এসে বসে আছ? তোমার আজ্ঞা আমি মাথায় নিলাম। শিরোধার্য করলাম।

* * *

মাসখানেক কোনরকমে কাশীতে কাটাইয়া নিতাই আবার একদিন ট্রেনে চড়িয়া বসিল। কোন রকমেই সে ঐখানে থাকিতে পারিল না।

এই এক মাস সে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। তাহার সঙ্গে উৎকণ্ঠার, উদ্বেগের তাহার অবসান হইয়াছে। ঘুম যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোগলসরাই জংশনে কোনরূপে উঠিয়া ট্রেন পালটাইয়া নূতন গাড়ীতে উঠিয়া সে বাঁচিয়া গেল। ছাদের সঙ্গে ঝুলানো বেঞ্চগুলার একটা খালি ছিল, সেই বেঞ্চে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল। আঃ-নিশ্চিন্ত! সোনার দেশে আপন মায়ের কোলে ফিরিয়া চলিয়াছে সে।

পরদিন সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন মনে হইল অতি পরিচিত জন কেহ তাহাকে ডাকিতেছে। পরিচিত কেহ ভারি মিষ্টমুরে যেন তাহাকে ডাকিল—

–কে, কে? নিতাই ধড়, মড়, করিয়া উঠিয়া বসিল।

না, চেনা কেহ নয়, তাহাকে নয়। নীচের বেঞ্চে একজন লোক গোটা বেঞ্চটা জুড়িয়া শুইয়া আছে, তাহাকেই কতকগুলি নবাগত যাত্রী ডাকিতেছে—ওঠ—ওঠ।

নিতাই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আঃ, গাড়ীটা চেনামুখে যেন ভরিয়া গিয়াছে। সব চেনা, সব চেনা! নিতাই তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া—সবিনয়ে আগন্তুক যাত্রীদলের একজনকে বলিল—মালগুলো ওপরে তুলে দি?

—দাও তো দাদা, দাও তো।

—বেঁচে থাক বাবা; বড় ভাল ছেলে তুমি। এক বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্বাদ করিল।

মালগুলা তুলিয়া দিয়া নিতাই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। ইন্টিশানের বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সব চেনা—সব চেনা! আঃ-তবে তো দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! জানালার বাহিরে বাংলা দেশ। সব চেনা। রাণীগঞ্জ পার হইল। এইবার বর্ধমান। বাহিরে আকাশে ঘন মেঘ করিয়াছে।

বর্ধমানে গাড়ী বদল করিয়া—ঘণ্টা দুয়েক মাত্র, তাহার পরই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে। মা চণ্ডী, বুড়ে শিব!

মা চণ্ডী বুড়োশিবের দরবারে বসিয়াই সে ভগবানকে গান শুনাইবে। তীর্থে তীর্থে মেলায় মেলায়—তারকেশ্বরে—কালীঘাটে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবে। দেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেশের লোককে গান শুনাইয়া ফিরিবে। সে নিশ্চয় করিয়া জানে যে তাহাদের গান শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে। সে এবার নিজেই কবির দল করিবে, এখন তাহার নাম হইয়াছে, বায়নার অভাব হইবে না। কবিয়াল নিতাইচরণের নামে দেশের লোকও ভাঙিয়া আসিবে। মেলা-খেলায় গালাগাল খেউড় নইলে চলে না। তাহার মধ্যেও কৌতুক আছে, তবু সে ভালবাসার গানকেই বড় করিবে। বসন্তকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ওই একই খেদ। জীবন এত ছোট কেনে? ভালবাসিয়া সাধ কেন মেটে না, ছোট এতটুকু জীবনের পরিসরে ভালবাসিয়া কেন কুলায় না? ভালবাসার গান। খেদের গান। এই খেদ মোর মনে –সেই খেদের গান –বসন্তের নাম করিয়া গান ।

কোকিল কি বসন্তকে ভুলিতে পারে?

এক্সপ্রেস ট্রেনটা থামিয়া গেল। একটা বড় স্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ধমান! বর্ধমান!

* * * *

বর্ধমান হইতে লুপ লাইনের ট্রেন। নিতাই আবার সেই ট্রেনে চড়িয়া বসিল। মনে মনে তখন তাহার গান রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে পৌঁছিয়াই সে সর্বাগ্রে মা চণ্ডীর দরবারে যাইবে প্রণাম করিতে। সেই প্রণাম করিবার জন্য সে গান রচনা শুরু করিয়াছে। এই গান গাহিয়াই সে মাকে প্রণাম করিবে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী নয়, সে নিজের গান গাহিয়াই মলকে প্রণাম করিবে।

‘সাড়া দে মা—দে মা সাড়া,
ঘরপালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভূঁই পাড়া।
তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যে মন ভরে না,
নাচ-দুয়ারে পা সরে না, চোখে বহে জলের ধারা ‘

আকাশ জুড়িয়া ঘন কালো মেঘ। হু-হু করিয়া ভিজা জলো বাতাস বহিতেছে। আঃ, দেহ জুড়াইয়া যাইতেছে। মাটির বুক আর দেখা যায় না; লকলকে কাঁচা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ও-ইহারই মধ্যে এদিকটায় বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। চষা ক্ষেতগুলির কালে মাটি জলে ভিজিয়া আদরিণী মেয়ের মত তুলিয়া ধরিতে যেন গলিয়া পড়িতে চাহিতেছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির উপর একটা ভিজা কাক পাখা দুটা অল্প বিছাইয়া দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মনের আনন্দে ভিজিতেছে। কচি নতুন অশ্বত্থ-বট-শিরীষের পাতাগুলি

ভিজা বাতাসে কাঁপিতেছে। লাইনের দুধারের ঝোপগুলিতে থোপা থোপা ভাঁট ফুল ফুটিয়াছে। আহা-হ্! ওই দূরে নালার ধারে একটা কেয়া-ঝোপ বাতাসে দুলিতেছে। কেয়া-ঝোপটার বাহার খুলিয়াছে সব চেয়ে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার বসন্তকে মনে পড়িয়া গেল,

"করিল কে ভুল—হায় রে,
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত কাটার ধারে ঘেরা কেয়া-ফুল!"

ঝম্-ঝম্ শব্দে ট্রেন চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে সন্ধ্যাবেলার কাজলদীঘির জলের রঙের মত রঙ; বৃষ্টি জোর হইতেছে, অমনি চারিদিক ঝাপসা। ওঃ, এদিকটায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠ জলে থৈ থৈ করিতেছে। ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাক ট্রেনের শব্দকে ছাপাইয়াও কানে আসিতেছে। এদিকে কাড়ান লাগিয়া গেল।

ঘং-ঘং গম্গম্ শব্দে ট্রেনখানা ধ্রুপদ ধামারে গান ধরিয়া দিল। নদীর পুল! গেরুয়া রঙের জলে সাদা সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত লাল জল থৈ থৈ করিতেছে। জল ঘুরপাক খাইতেছে, আবার তীরের মত সোজা ছুটিয়া চলিয়াছে। দুপাশে কাশের ঝাড়, ঘন সবুজ। অজয়! অজয় নদী! দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। দেশ, তাহার গাঁ! তাহার মা!

'তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যে মন ভরে না
চোখের পাতায় ঘুম ধরে না, বয়ে যায় মা জলের ধারা।'

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এইবার বোলপুর-তারপর কোপাই, তারপর, তারপর জংশন; ছোট লাইন। ঘটো-ঘটো ঘটো-ঘটো ঘং-ঘং ঘং-ঘং। সর্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীর চলন; হায়-হায়-হায়-হায়! সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের বুকের ভিতর নাচিতেছে নিমাইয়ের মন। ছেলেমানুষের মত নাচিতেছে। চোখ ভাসাইরা জল আসিতেছে অজয়ের বানের মত। মাগো—মা, আমার মা। আমার গাঁ। ওই যে—সেই 'নিমচের জোল' 'উদাসীর মাঠ' – ওই সে কাশীর পুকুর; –ওই যে সেই কালী-বাগান—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহার কবিজীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল!

গাড়ীটা ঈষৎ বাঁকিল—ইস্টিশনে ঢুকিতেছে। ওই যে, ওই যে —গাড়ী থামিল।

ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

নিতাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা। নিতাই এমনটি প্রত্যাশ করে নাই। এত স্নেহ, এত সমাদর তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে? রাজার মুখে পর্যন্ত কথা নাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল, কয়েকজন ভদ্রলোক পর্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটি। ফুলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘন সবুজ চিরোল চিরোল পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তবু দুই-চারিটি ফুল যেন নিতাইয়ের জন্যই ধরিয়া আছে। নিতাইয়ের চোখে জলের ধারা। নিতাই কাঁদিতেছে; কাঁদিতেছে বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া। বিপ্রপদ ঠাকুর মরিয়া গিয়াছে।

বিপ্রপদর জন্য নিতাইয়ের কান্নায় সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৌতুকের কথা। কিন্তু নিতাইয়ের ওই নীরব বিগলিত অশ্রধারা এমন একটি অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার কান্নাকে উপহাস করিবার উপায় ছিল না। নিতাইয়ের কবিয়ালির খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে, তাহার জন্য সকলে তাহাকে

শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে; কিন্তু এ তাহা নয়, তাহারও অতিরিক্ত কিছু। তাহার চোখের ওই দর-বিগলিত ধারার সেই মহিমাতেই নিতাই মহিমান্বিত হইয়া সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিপ্রপদকে হারাইয়াই সে শুধু কাঁদে নাই, তাহাদের সকলকে ফিরিয়া পাইয়াও কাঁদিতেছে।

কতক্ষণ পর।

নিতাই আসিয়া বসিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। রাজাকে ডাকিয়া পাশে বসাইল। লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রাজন! ভাই!

—ওস্তাদ! ভেইয়া!

—ঠাকুরঝি?

—ওস্তাদ!

–রাজন!

–ঠাকুরঝি তো নাই ভাইয়া!

—নাই?

–নাই! উতো মর গেয়ি। রাজার মত শক্ত মানুষের ঠোঁট দুইটিও কাঁপিতে লাগিল। বলিল—ঠাকুরঝি ক্ষেপে গিয়েছিল ওস্তাদ। তোমার যাবার পরে—

রাজার চোখ হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরঝি নাই। ঠাকুরঝি মরিয়াছে! পাগল হইয়া ঠাকুরঝি মরিয়াছে! এই কয়টা কথাই নিতাইয়ের কাছে অনেক কথার তুফান হইয়া উঠিল, বুকের মধ্যে ঝড় বহিল,চোখ ফাটিয়া জল আসিল। মনে পড়িল— জীবন এত ছোট কেনে? তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা বলিল—ওস্তাদ, ভাইয়া, রোতা হ্যায়? কাঁদছ? ঠাকুরঝির জন্যে? ‘

চোখ মুছিয়া, বিচিত্র হাসি হাসিয়া ফেলিয়া নিতাই বলিল—গান শোন রাজন, গান শোন। গুন গুন করিয়া ভাজিয়া লইয়াই সে গলা ছাড়িয়া গাহিল—

‘এই খেদ আমার মনে—
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়-জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?’

রাজা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হায় হায় হায় রে! বল ওস্তাদ, জীবন এত ছোট কেনে? হায় হায় হায়।

নিতাই বলিল—তাই যদি জানব রাজন! —আবার তাহার চোখ হইতে জল ঝরিতে শুরু হইল। আবার কাঁদিল। নিতাইয়ের চোখ হইতে আবার অনর্গল ধারায় জল পড়িতে আরম্ভ হইল।

কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিস্মৃত মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল হিল-হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন! সে আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানে বসন আসিয়া প্রথম দিন শুইয়া বলিয়াছিল—কই হে! ওস্তাদ না—ফোস্তাদ! চকিতের মত মনেও হইল— বসনও যেন শুইয়া আছে! আঃ! ঠাকুরঝি, বসন—দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।

নিতাই উঠিল, বলিল—চল।

—কাঁহা ভাইয়া?

—চণ্ডীতলায়। চল, মাকে প্রণাম করে আসি।

রাজার মুখের দিকে চাহিয়। সে বলিল—গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করব মাকে। তাহার সর্বাঙ্গ যেন এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধইবে—মাগো—জীবন এত ছোট কেনে?